হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ।

OR

THE EVIDENCE OF THE HINDU RELIGION.

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু-প্রণীত।

কলিকাতা;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

CALCUTTA.

PRINTED BY K. B. DAS AT THE "VICTORIA PRESS"
2, GOABAGAN STREET.

নিবেদন।

আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী সুন্দর রীতি এই ছিল যে, সেই শাস্ত্রীয় প্রায় প্রতি গ্রন্থের প্রারম্ভে পাঠকগণের বুদ্ধিকে স্থির রাখিবার জন্য গ্রন্থের অধিকার সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইত। প্রমাণ-প্রতি-পাদক এ গ্রন্থের অধিকারী কে? হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—নিম্নাধিকারী, মধ্য-অধিকারী এবং উচ্চাধিকারী। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নিম্নাধিকারী জনগণের যেরূপ দৃঢ় আস্থা, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে ধর্ম্মের প্রমাণ আবশ্যক হয় না। উচ্চাধিকারী জ্ঞানিগণের নিকট হিন্দুধর্ম্ম স্বতঃ-প্রমাণ বলিয়া তাঁহারাও প্রমাণ চাহেন না। কিরূপ স্বতঃ-প্রমাণ, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রমাণ চাহেন, কেবল মধ্য-অধি-কারী জনগণ—তাঁহাদেরও সকলে নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেবল সংশয়ী জনগণ। ইংরাজী বিদ্যার বহুল আলোচনা হওয়াতে হিন্দু-সমাজে এক্ষণে এই সংশয়ী জনগণের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। এই সংশয়ী জনগণকে হিন্দুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করা তবে এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম্মও অধিকারানুসারে বিভক্ত হওয়াতে তাহার কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। মুনি-ঋষিগণের ধর্ম্ম হইতে সামান্য জনগণের ধর্ম্মাচারপদ্ধতি পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের দেহ। সুতরাং যাঁহারা হিন্দুসমাজস্থ সামান্য জনগণের ধর্ম্মপ্রণালী দেখিয়া বিবেচনা করেন, এই বুঝি হিন্দুধর্ম্ম, তাহারা একদেশদর্শী। সেই সামান্য জনগণ-আচরিত ধর্ম্মপ্রণালী হইতে এই ধর্ম্ম যে ক্রমে ক্রমে কত উচ্চ উচ্চ স্তরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বিচার করিলে এ ধর্ম্মের

সর্ব্বনিম্ন স্তর অতি সামান্য অংশ বলিয়াই প্রতীত হইবে। যদিও সেই স্তরের লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক, তথাপি তাহা মূলদেশ মাত্র। যেমন পর্ব্বতের মূলদেশ অতি বিশাল ও প্রকাণ্ড, তদ্রূপ। উচ্চ উচ্চ দেশের লোকসংখ্যা ক্রমশই কমিয়া গিয়াছে। কমিয়া যাইলেও তাঁহারা সবাই হিন্দুধর্ম্মভুক্ত। বরং উচ্চদেশের ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্মের পবিত্রতা ও প্রকৃত মূর্ত্তি আরও বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন। পর্ব্বতের উচ্চ উচ্চ দেশে উঠিলে যেমন নব নব দেশ দৃষ্টিগোচর হয়, এ ধর্ম্মেও তেমনি উচ্চ উচ্চ দেশে নব নব অধ্যাত্মতত্ত্বাবলির সুন্দর দেশ প্রত্যক্ষীভূত হয়, শেষে চূড়াদেশের অনন্ত আকাশে কেবল—একমেবাদ্বিতীয়ং। নিম্নাধিকারী হিন্দু জনসমাজে হিন্দুধর্ম্মের যে মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায়, তাহা সকলেরই পরিচিত বলিয়া সে মূর্ত্তি বিশেষ করিয়া দেখাইতে আমি চেষ্টা করি নাই। হিন্দুধর্ম্মের এক এক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাঙ্গও তত প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ, তাহাই শুধু হিন্দুধর্ম্ম নহে। গঙ্গা যেমন স্বর্গ হইতে নামিয়া শতমুখে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম তেমনি নিবৃত্তি-প্রমুখ স্বর্গদেশ হইতে নামিয়া প্রবৃত্তিমুখে শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জনসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় সমস্তকে হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব বলিয়া দেখাইলে অন্ধের হস্তী-নির্ণয়বৎ হইয়া পড়ে। শুদ্ধ পাদদেশ, বা কর্ণদেশ স্পর্শ করিয়া হস্তীকে স্তম্ভবৎ বা কুলাবৎ বলা যেমন, হিন্দুধর্ম্মের এক এক দেশ দর্শন করিয়া তাহাই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া স্থির করাও তেমনি। কিন্তু সেই পাদ বা কর্ণদেশ হস্তীর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিলে যেমন সেই সেই অঙ্গদেশকে ঠিক দেখান হয়, তেমনি এ গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মাঙ্গসমুদায় প্রদর্শিত হইয়াছে। নহিলে, হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব-জ্ঞান হইবে

কি প্রকারে? সুতরাং যে অঙ্গ যে প্রকার, তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মের ও এই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয়।"

শম্ভু বলিয়াছেন :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

"কেবল শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় পূর্ব্বক ধর্ম্মনিরূপণ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।"

এই বাক্যের অনুসারী হইয়া আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ পরিচয় দিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম, সুতরাং সেই অনুষ্ঠানের ফলাফল কিরূপ হইতে পারে, অনুষ্ঠানকারিগণের সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। তাই সেই সাক্ষ্য দিবার স্থলে বেদবাক্য, ঋষিবাক্য এবং শাস্ত্রবাক্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই সাক্ষ্যকে যুক্তিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাও যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রমাণের উপর হিন্দুধর্ম্মের যে মতামত স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদেরও যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছি। তজ্জন্য অগ্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি, হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ মোটামুটি খ্যাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত কথার প্রমাণস্বরূপ পরে, কি যুক্তি, কি ঋষিবাক্য, যে স্থলে যে প্রমাণ উপযোগী, সে স্থলে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি। গ্রন্থের একদেশ-পাঠে যে সংশয় উঠিবে, অন্যদেশে হয় ত তাহার নিরাকরণ হইবে। সুতরাং অংশমাত্র পাঠ করিয়া এ গ্রন্থের প্রকৃত বিচার করা অসম্ভব; তজ্জন্য সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করা চাই। প্রমাণ-সমূহ অধিকাংশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, ভগবদ্গীতা এক্ষণে বহু লোকে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই গীতাপাঠার্থিজনগণের পক্ষে এই জন্য এ গ্রন্থ

বিশেষ উপকারে আসিবে। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণার্থই গীতার প্রামাণ্য আলোচিত হইয়াছে। নহিলে গীতার প্রামাণ্য আবশ্যক নহে; যেহেতু, তাহা নিজ গৌরবে, কি হিন্দু কি অহিন্দু, সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি-জনগণের নিকট সমান আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সাধন-ধর্ম্ম এবং সমাজধর্ম্ম-ভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। সমাজধর্ম্মের প্রকৃতি-বিচার, মূলনীতিতত্ত্ব ও প্রমাণ-পরিচয় "সমাজতত্ত্বে" আলোচিত হইয়াছে। সেই সমাজধর্ম্ম যে সাধনধর্ম্মের সাধক ও পৃষ্ঠ-পোষক, তাহারই প্রকৃতি-বিচার ও প্রমাণ-প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "সমাজতত্ত্বে"র মূল প্রয়োজন যে ধর্ম্মনীতি, এই পুস্তকে সেই ধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে। "সাহিত্য-চিন্তা" "কাব্য-চিন্তা" এবং "দেব-সুন্দরী"তেও স্থানে স্থানে এই সাধন-ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সেই গ্রন্থ-পাঠের পর কথা উঠে যে, সেই সেই গ্রন্থে যে ধর্ম্মনীতির পরিচয় আছে, সেই ধর্ম্মের প্রমাণ কি? হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় প্রতীত হয় যে, আমাদের শাস্ত্রীয় মতামত সমস্তই নানা বাদানুবাদ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। যখন যে মত উঠিয়াছে, তখনই পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিয়াছেন—সে কথার প্রমাণ? সুতরাং, হিন্দু দার্শনিকেরা প্রমাণ ভিন্ন এবং পূর্ব্ব-পক্ষখণ্ডন না করিয়া কোন কথার মীমাংসা করেন নাই। ধর্ম্মের এমত তন্ন তন্ন বিচার আর কোন জনসমাজের ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না। কি লৌকিক, কি অলৌকিক, সর্ব্ববিধ তত্ত্বেরই বিশেষ প্রকার ও উপযুক্ত প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই রীতি অনুসারে আমিও আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত উক্ত গ্রন্থাবলির ধর্ম্মাঙ্গের প্রমাণ-প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছি। সুতরাং, এই গ্রন্থকে উক্ত গ্রন্থাবলীর এক প্রকার পরিশিষ্ট-ভাগ বলিতে হইবে। এই গ্রন্থের কোন

কোন অংশ "নব্যভারতে" যে আকারে আলোচিত হইয়াছে, তাহার অল্পমাত্রই ইহাতে দৃষ্ট হইবে। সমুদায়ই নূতন আকারে বিরচিত হইয়া নূতন নূতন নানা প্রসঙ্গের অঙ্গরূপে সজ্জিত হওয়াতে সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে এক নূতন সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম যে বেদমূলক, সেই বেদের প্রমাণ-পরিচয়ে হিন্দুদর্শন-শাস্ত্র পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থে তাহার আভাসমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। উহার বিস্তারিত বিচার বাঙ্গালা-ভাষায় আনা বড়ই কঠিন। তবে, আমার চেয়ে যাঁহারা অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে বোধ হয়, বাঙ্গালায় তাহার অবতারণা করিতে পারেন। আমি যে আভাসমাত্র দিয়াছি, তাহাতে যাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা মূল দর্শনশাস্ত্র দেখিবেন। ধর্ম্মের প্রমাণালোচনা প্রথমে আর্য্যেরাই সম্যগ্‌রূপে করিয়া গিয়াছেন। এমত কি, তাঁহারা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপর স্থাপিত করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। ধর্ম্মের যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে পারে, তাহা কেবল আর্য্যেরাই দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের মত উৎকৃষ্ট প্রমাণ অন্য কোন ধর্ম্মপ্রণালীর নাই। সেই প্রমাণ-পরিচয়ের কিয়দংশ মাত্র এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গের আমি সূত্রপাত-মাত্র করিলাম। এই সামান্য উপক্রমণিকার পর সুধীগণ যে আরও বিস্তারিত বিচারে প্রবৃ[illegible], এমত আশা অবশ্যই আছে। সুতরাং, ইহাকে প্রথম উ[illegible] গ্রহণ করিয়া পাঠকগণ ইহার ত্রুটি সমুদায় উপেক্ষা করেন, এইমাত্র আমার বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা, হোগলকুঁড়িয়া।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল।

গ্রন্থকার।

ভ্রম-সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	ছত্র
কথঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ	১০	১১
আবশ্যক	আবশ্যকতা	৬৭	৪
নাদই	নাদমধ্যাই	৮১	১৪।১৮
নাদ	নাদমধ্য	৮১	২১
ত	ও	১৩২	৬
জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান	১৩৮	১১
৩ পা, ১৬	১ পা, ৪	১৯৩	২৪
Tatality	Totality	২১৮	১৬
অনুমানে বিজ্ঞান	বিজ্ঞানে অনুমান	২২৯।৩১	পাতনামা
		২৩৩।৩৫	[illegible]
		২৩৭।৩৯	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অনুভূতি	অনুভূত	২৪৪	২৩
যোগরূঢ়	যোগারূঢ়	২৪৬	১
বৈজ্ঞাকিন	বৈজ্ঞানিক	২৫১	৮
[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩
[illegible]	[illegible]	[illegible]	২১

হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্নতা।

হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ-বিচার করিবার পূর্ব্বে সেই ধর্ম্ম কি প্রকার, তাহার বিচার করা আবশ্যক। এজন্য, অগ্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি-বিচার সংক্ষেপে গ্রহণ করা যাইতেছে।

লোকসমাজে যত প্রকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রণালী অধুনাতন প্রচলিত দেখা যায়, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মত প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী আর নাই। শুধু প্রাচীন নহে, এই ধর্ম্মের আদি কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুধর্ম্ম যে বেদমূলক, সেই বেদের আদি কোথায়, তাহা নির্ণীত নাই; তাহা শ্রুতি-পরম্পরায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এজন্য, বেদের অন্যতর নাম শ্রুতি। হিন্দু-ধর্ম্ম মতে এই শ্রুতি-পরম্পরাগত বেদ প্রতি সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়ে বিলীন হয়। সুতরাং প্রতি কল্পান্তে যখন বেদের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তখন এই বিশ্বসংসার যেমন অনাদি ও নিত্যরূপে

চিরকালই সৃষ্ট হইতেছে, বেদও তদ্রূপ। বেদ যদি সনাতন ও নিত্য হয়, সেই বেদমূলক ধর্ম্মও তদ্রূপ সনাতন ও নিত্য। এজন্য, হিন্দুধর্ম্মের অন্যতর নাম সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিলে, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয়, শিক, পার্সী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রণালীকে আধুনিক বলিতে হয়। যাহা আধুনিক, তাহা উৎপন্ন ধর্ম্ম। এই সমস্ত উৎপন্ন ও আধুনিক ধর্ম্মপ্রণালীর সহিত হিন্দুধর্ম্ম এইরূপে বিভিন্ন হইয়াছে।

শুধু প্রাচীনত্ব ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রভিন্নতা নহে, সেই সমস্ত উৎপন্ন ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে। এই প্রকৃতিগত বিভিন্নতা ত্রিবিধ।

১। এই উৎপন্ন ধর্ম্ম-সমস্তই সামাজিক ধর্ম্মপ্রণালী। কোন ধর্ম্মপ্রণালী সামাজিক হইতে গেলে, তাহাতে এক প্রকার, না হয় অন্য প্রকার ধর্ম্ম-সাধনা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। কারণ, কোন সাধনা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, সমাজের সহিত ধর্ম্ম মিশে না। সমাজের সহিত ধর্ম্ম না মিশিলে, তাহার জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয় না এবং তাহা স্থায়িভাবে, অন্ততঃ বহুকালের জন্য, প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সমস্ত উৎপন্ন ধর্ম্মের সাধনা-প্রণালী মানবাত্মাকে এক এক নির্দ্দিষ্ট দেশে অথবা অবস্থায় উপনীত করিবার পন্থা। নির্ব্বাণ বল, স্বর্গ বা Paradise বল সকলই মানবাত্মার এক এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থা। এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট অবস্থা যে হিন্দুধর্ম্মে নাই এমত নহে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তদধিক আছে। হিন্দুধর্ম্ম আত্মাকে আরও উচ্চে লইয়া যাইতে চাহে। উচ্চে লইয়া গিয়া তাহাকে সর্ব্বাবস্থার অতীত এবং সর্ব্বাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে চাহে। এজন্য, এ ধর্ম্মে আত্মার শেষগতির

নাম মুক্তি বা মোক্ষপদ হইয়াছে। এই মোক্ষপদ লাভ করিলে আত্মার অনন্ত-স্বরূপ লব্ধ হয়। তখন অনন্ত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব ঘটে। যতদিন এই একত্ব না ঘটে, ততদিন জীবাত্মা জীবের সহিত নানা ক্লেশ-কর্ম্মে অভিভূত থাকে। সেই অভিভূত অবস্থা হইতে মুক্ত করাই মোক্ষপদ। এই মোক্ষপদ লাভ করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত সাধনা-প্রণালীর সৃষ্টি। এই মোক্ষপদ ধরিয়াই হিন্দুধর্ম্মের সহিত সমস্ত উৎপন্ন ধর্ম্মের বিভিন্নতা।

২। এই বিভিন্নতার দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুধর্ম্মের অধিকার-ভেদ-স্বীকার। আধুনিক ও উৎপন্ন ধর্ম্ম সমূহে অধিকার-ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, সে সমস্ত ধর্ম্ম মানবাত্মার নিমিত্ত এক এক নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য দিয়াছে; সেই লক্ষ্যের প্রতি সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে নিয়োজিত করিতে চাহে। হিন্দুধর্ম্ম যখন মানবাত্মাকে তাহার অনন্ত-স্বরূপে আনিতে চাহে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাহার গতি অনন্ত-পথে। এই অনন্ত পথ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমশই উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। এই অনন্তগতি-পথে লোক-সমাজের সকলেই আছে, কিন্তু সকলেই সমান অধিকারী নহে। একজন জ্ঞানীর সহিত অজ্ঞানীর আকাশ-পাতাল প্রভেদ; তেমনি একজন বুদ্ধিমানের সহিত একজন নির্ব্বোধেরও বিস্তর প্রভেদ। অথচ ধর্ম্ম সকলকেই উঠাইতে চাহে; উঠাইয়া এই অনন্তপথের এক এক স্থানে আনিতে চাহে। হিন্দুধর্ম্ম এই বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ধর্ম্মসাধনার প্রকরণ বিভিন্ন করিয়া দিয়া আপনাকে সর্ব্বলোকোপযোগী করিয়া দিয়াছে। এই অধিকার-অনুসারে হিন্দুধর্ম্মে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য

প্রভৃতি নানা সাম্প্রদায়িক সাধনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধনা-প্রণালীর ধর্ম্মাচার ও প্রকরণ বিভিন্ন হইলেও সকল ধর্ম্মপ্রণালী হিন্দুধর্ম্মীয় মুক্তিসাধক গতিপথে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাদি যেমন নিজ নিজ সম্প্রদায়স্থ জনগণকে স্বর্গাদি প্রভৃতি এক এক লক্ষ্যস্থানে আনিতে চাহে, হিন্দুধর্ম্মের শাক্তাদি সাম্প্রদায়িক সাধন-প্রণালীও তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মীয় মুক্তিপথের এক এক দেশে উপনীত করিতে চাহে। কিন্তু তাহাই চরম-গতি নহে।

৩। উৎপন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর সহিত সনাতন ধর্ম্মের আর এক বিভিন্নতার কারণ আছে। উৎপন্ন ধর্ম্ম-সমস্তের সাধনা-প্রণালী ও নিয়মাদি এক এক ধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে; সেই সেই ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপীটক প্রভৃতি। হিন্দুধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা এত অধিক যে, তাহা কোন এক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন শাস্ত্রাদেশ পালনীয় হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির শাসনে শাসিত হইয়াছে। শাস্ত্র-সকল বিভিন্ন হইলেও কেহ শ্রুতি বা বেদ-বিরোধী নহে। যাহা বেদমূলক শাস্ত্রানুসারী, তাহাই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রসিদ্ধ সাধনা-প্রণালী; তাহাই বেদোক্ত মোক্ষধামে লইয়া যাইতে পারে। অধিকার-ভেদে বেদের শাখা-প্রশাখাও বিস্তর; বিস্তর হইলেও সকলই একই মোক্ষমুখ হইয়া আছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ এই বেদ। বৌদ্ধাদি উৎপন্ন ধর্ম্ম-সমস্ত বেদের শাসনে শাসিত হইতে চাহে না। তজ্জন্যই হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহাদের প্রভিন্নতা।

পরলোক।

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম্ম। প্রতি সামাজিক ধর্ম্ম-

প্রণালী সেই পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। সুতরাং প্রতি সামাজিক ধর্ম্মপ্রণালী সেই পরমেশ্বর, পরলোক এবং মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অতএব, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কোন বিশেষ ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রমাণ-বিচার প্রসঙ্গে ধর্ম্মের ঐ তিন মূলতত্ত্বের প্রমাণ-বিচার আসিতে পারে না। ঐ সকল মূলতত্ত্বের প্রমাণ-প্রসঙ্গ এক স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি এ রূপ যে, সেই ধর্ম্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে ধর্ম্মের ঐ মূলতত্ত্বত্রয়ও সপ্রমাণ হইয়া যায়। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ-পদ্ধতি বিচার করিতে গিয়া স্বতন্ত্র আকারে ধর্ম্মের প্রমাণে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই।

পরলোক ও ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষয়। সুতরাং তাহা সামান্য লোকের স্থূল জ্ঞান-গোচর নহে। যাহা সামান্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে প্রতীত নহে, তাহার জন্য সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি চাই। এমত অনেক বিষয় আছে, যাহা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন জ্ঞানগোচর হয় না। রামধনু স্থূলজ্ঞানে ধনুমাত্র, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সূর্য্যকিরণের বিশ্লেষণ। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি স্থূলজ্ঞানে নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে প্রতীত। বাহ্য-জগতের নিমিত্ত যেমন বাহ্য-বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-জগতের নিমিত্ত তেমনি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। সুতরাং এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত না হইলে তদ্বিষয়-জ্ঞান হইবার যো নাই। সেই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে ধর্ম্মের ঐ ত্রিবিধ মূল-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ হয়। কিরূপে প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই প্রমাণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, যাহা কেবল বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে প্রতীত, তাহা স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিতে চাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

হিন্দুধর্ম্মে পরলোক-বিষয়ক জ্ঞান এক বিশেষ প্রকার; বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি-অনুযায়ী বলিয়া বিশেষ প্রকার। বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতে অনুমানের সিদ্ধতা হয়। হিন্দুধর্ম্মে পরলোকের প্রমাণ মৃত্যুর পর নহে, কিন্তু জন্মের পর; কারণ, সেই ধর্ম্মের মতানুসারে জন্মমৃত্যু একসূত্রে আবদ্ধ। যাহা মৃত্যুর পর, তাহা পরজন্মের পূর্ব্ব; এইরূপে জীবের সংসার চলিতেছে। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জাতিস্মরগণের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মান্তরীয় প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান এই যে, যাহা ইহজন্ম বলিয়া প্রতীত, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পরলোক। পূর্ব্বজন্মের প্রারব্ধ লইয়া জন্মগ্রহণ করাতে প্রতি লোকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ঘটে। কিরূপে ঘটে?

পৃথিবীতে যত মনুষ্য জন্মিতেছে, তাহাদের মানসিক প্রকৃতি কি একরূপ? মানসিক দেহের যদি পূর্ব্বাবস্থা না থাকিত, তবে ত সকলেই একপ্রকার প্রকৃতিক হইবার কথা। কিন্তু তাহা ত প্রকৃত-প্রস্তাবে দৃষ্ট হয় না। প্রতি ব্যক্তির প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। যদি বল, এই স্বাতন্ত্র্য পিতামাতার স্বতন্ত্র বীজ হইতে ত উৎপন্ন হইতে পারে। সে কথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু, সহোদরেরা কেহই সমান নহে। এমত কি, যমকেরাও ঠিক এক নহে; সদৃশ হইতে পারে কিন্তু ঠিক এক নহে। এক হইলে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইত না। পিতামাতার কাছে তাহারা একইরূপে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হইয়াও ঠিক এক হয় না; প্রত্যেকেরই পার্থক্য থাকে। সেই পার্থক্য-হেতু তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। এই বিভিন্ন প্রকৃতিক ব্যক্তিত্ব কিসের ফল? তাহা কি প্রতি ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রালব্ধ-জনিত নহে? এই অনুমান যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে কি ইহজন্মের পূর্ব্বে সেই সেই ব্যক্তির পূর্ব্বজন্ম ছিল না? এবং সেই পূর্ব্বজন্ম হেতু প্রতি ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রালব্ধ

সঞ্চিত হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তবে কি সেই প্রারব্ধ লইয়া প্রতি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই? যাহা পূর্ব্বজন্মের প্রারব্ধ, তাহা ইহজন্মের প্রারব্ধ; এই নিয়তি-সূত্রে লোকের জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া আসিতেছে।

এই প্রারব্ধ ফলিত-জ্যোতিষের গণনা-দ্বারাও অনুমান-সিদ্ধ হয়। গণকেরা যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দেয়, দেখা যায়, তাহার অনেকাংশ ঠিক ফলিয়া যায়। দু-একটা ফল, গণনার ভ্রমক্রমে না ফলিতে পারে, কিন্তু অনেক ফলই প্রকৃত জীবন-ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক ফলিয়া যায়। এই কর্ম্মফল-ভোগ তিথি-নক্ষত্রের ফলানুসারে স্থূল-শরীর সম্বন্ধে যেমন ঠিক ফলে, তেমনি মানসিক সুখ দুঃখ, বুদ্ধি-বিবেচনা দয়াধর্ম্ম, উদারতা, অনুদারতা প্রভৃতি মানসিক প্রকৃতির নানা অবস্থাভেদ যে মানসিক বৈজিক বিভিন্নতা হইতে সমুৎপন্ন, তৎসম্বন্ধেও ফলিত-জ্যোতিষের গণনা বিফল হয় না। অতএব, যে কর্ম্মফলবাদ বিজ্ঞান-সম্মত, সেই কর্ম্মফলবাদ-অনুসারে হিন্দুধর্ম্মে পরলোকতত্ত্ব অনুমানিত হয়।

জীবের এই কর্ম্মফল-ভোগ যে করায়, সেই কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর, এবং যে কর্ম্মফলভোগী, সেই জীব। ঈশ্বর কিরূপে জীবের জন্মমৃত্যু অবধারিত করিয়া দেন, তাহা "সমাজ-তত্ত্ব"-গ্রন্থের "বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর-পরিণাম"-নামক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই সমস্ত কারণে, যে হিন্দুজাতির জন্ম-জন্মান্তর-বাদে দৃঢ় বিশ্বাস, সেই হিন্দুজাতীয় আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট ধর্ম্মের ঐ ত্রিবিধ মূলতত্ত্ব স্বরূপ—পরলোক, ঈশ্বর এবং জীবাত্মায় বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। যে হিন্দু পূর্ব্বজন্ম মানে, সেই মানবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব কাজে কাজেই স্বীকার করিয়া যায়। কোন্ হিন্দুই বা পূর্ব্বজন্ম না মানে?

পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাসীর সংখ্যা অতি নগণ্য, এজন্য ধর্ত্তব্য নহে। সেই বিশ্বাসে হিন্দুর জন্ম, কর্ম্ম, আহার, ব্যবহার,—সমস্তই; সেই বিশ্বাসে হিন্দু আশৈশব শিক্ষিত ও লালিত-পালিত হইয়া আইসে এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সেই বিশ্বাসকে ভূয়োদর্শন-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দু সহোদর ও সহোদরা ভাবিতেছে, আমার অবস্থা এমত কেন, আর আমার ভাই, ভগ্নীর অবস্থাই বা এত বিভিন্ন কেন? ভাই ভাবিতেছে, আমিই বা চিররুগ্ন কেন? আর আমার সহোদরই বা অসুর-অবতার কেন? আমি এত মোটা-বুদ্ধি, আর আমার ভাই এত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি কেন? আমার পিতৃ-স্বভাব পিসীর স্বভাব হইতে এতই বিভিন্ন কেন? দুজনেই ত এক গর্ভ ও ঔরস-জাত? তবে একজন এত দয়াশীলা, অন্য জন এত কৃপণস্বভাব কেন? ভগ্নী ভাবিতেছে, আমিই বা দুশ্চারিণী হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিতেছি কেন, আর আমার ভগ্নীই বা সতীলক্ষ্মী হইয়া দেবীরূপে সকলের পূজনীয়া হইয়া সুখ-সম্ভোগ করিতেছেন কেন? সকলই পূর্ব্বজন্মের ফলাফল-নিমিত্ত। যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, যত বহুদর্শন জন্মিতে থাকে, পূর্ব্বজন্মের ফলাফলের প্রতি হিন্দু নর-নারী সাধারণ জনগণের বিশ্বাস ততই বদ্ধমূল হইতে থাকে। হিন্দু ভাবে আমি ইহজন্মে নিজ পৌরুষজাত কর্ম্মফলস্বরূপ যেরূপ প্রালব্ধ সঞ্চয় করিয়া যাইব, পরজন্মে আমার তাহাই প্রারব্ধ হইবে, সেই গোড়া ধরিয়া আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইব। এইরূপ প্রারব্ধ-অনুসারে ঈশ্বর আমাকে ইহজন্মে কর্ম্মফল ভোগ করাইতেছেন। সুতরাং এই পূর্ব্বজন্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস-হেতু কি পরলোক, কি আত্মা, কি ঈশ্বর, হিন্দুর নিকট এ সমস্ত বিষয় স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু ধর্ম্মের এ বড় সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

সর্ব্বদেশীয় সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা এই যে, এ জগতের কোন পদার্থের একেবারে ধ্বংস নাই। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই মীমাংসা। যদি স্থূলদেহের ধ্বংস না হয়, তবে কামনাময় সূক্ষ্ম মানস-শরীরের ধ্বংস হইবে কেন? স্থূলদেহের-পদার্থ সকল মৃত্যুর পর সম-জাতীয় পদার্থে মিলিত হয় মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে যখন স্থূলদেহের বিনাশ হইতে থাকে, তখন সূক্ষ্মদেহও সেই স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমজাতীয় জীবে সমাকৃষ্ট এবং নবজীবনে সমুদ্ভূত হয়। যে, যে-জাতীয় পদার্থ সে, সেই-জাতীয় পদার্থে মিলিত হয়—এই মাত্র ভগবানের "সঙ্কর্ষণ"-শক্তির নিয়ম। দেহাতিরিক্ত আত্মার সত্তা কেন অনুমিত হয়, তাহা আচার্য্য শঙ্কর নানা অনুমান-সিদ্ধ যুক্তি-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। *

পরমেশ্বর।

এ বিশ্বসংসারে কোন পদার্থের একেবারে ধ্বংস নাই কেন? পদার্থের অবস্থান্তর আছে কিন্তু আত্যন্তিক ধ্বংস নাই। হিন্দুধর্ম্মের মীমাংসা এই যে, এ বিশ্বসংসারে সকলই নিত্য ব্রহ্মের রূপ। সেই নির্গুণ পরব্রহ্মই সগুণ বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া পরমাত্মারূপে সর্ব্বপদার্থে এবং সর্ব্বজীবে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। সুতরাং মানবের জীবাত্মাও তিনি। জীবাত্মা সংসারী হইয়া অনিত্যসুখে লিপ্ত থাকিয়া জীবকে ঘোর দুঃখভোগ করায়।

---

* বেদান্তদর্শন, ৩ অধ্যায়, ৩ পাদ ৫৪ সূত্রের শারীরক ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কামনাময় সূক্ষ্মদেহ মৃত্যুর পর কেমন সমজাতীয় জীবে সমাকৃষ্ট হয়, তাহা "সমাজ-তত্ত্বে" বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

জীবাত্মার এই অবস্থাকে তাহার বদ্ধাবস্থা কহে। এই অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়াই হিন্দুধর্ম্মমতে জীবের মুক্তি। কেন জীব এ রূপ দুঃখের বশবর্ত্তী হয়, কেন তাহার এ রূপ শোচনীয় অবস্থান্তর ঘটে, এ কথার মীমাংসা যাহা, নির্গুণ ব্রহ্ম কেন সগুণ ব্রহ্মাণ্ডরূপে বর্ত্তমান ও ব্রহ্মাণ্ড-লীলায় ব্যাপ্ত, এ কথারও মীমাংসা তাহা। ব্রহ্মই যদি সব, ব্রহ্ম ব্যতীত যদি কোন পদার্থের এবং প্রাণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হইতে পারে না, তবে তিনি নিজে কেন রোগ, রোগী ও বৈদ্য; ভোক্তা, ভোগ ও যোগী হইয়া এই বিশ্বলীলা করিতেছেন, আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে এ সমস্ত কথার অবতারণা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা পর-পরপ্রস্তাবেও এ কথার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু এ কথা স্থির যে, জীবের বদ্ধাবস্থা আছে; কারণ, তাহার মুক্তাবস্থা আছে। তাহার যে মুক্তাবস্থা আছে, সিদ্ধগণের অসংখ্য দৃষ্টান্তে তাহা সপ্রমাণ হয়। এই মুক্তাবস্থায় জীব সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সদানন্দময় হয়। বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইলেই জীব নিজ স্বরূপ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই স্বরূপ-অবস্থাই তাহার আনন্দময় নিত্য ব্রহ্মপদ। এই নিত্য ব্রহ্মপদে উপনীত হইলেই জীবব্রহ্ম এক হইয়া যায়। এক হইয়া গেলেই নিত্যানন্দ লব্ধ হয়। কারণ, ব্রহ্ম নিত্যানন্দধাম। অতএব, জীবকে তাহার পাপ পুণ্যময় এবং সুখদুঃখময় বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যসুখে সুখী করার নাম হিন্দুধর্ম্মের মুক্তি। হিন্দু ধর্ম্মা-নুসারে জীবের এই মুক্তাবস্থা ক্রমশঃ সংঘটিত হয়। প্রথমে, পশুত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মনুষ্যত্বে যাওয়া, তৎপরে মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করা এবং সর্ব্বশেষে

দেবত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপদ। হিন্দুধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রণালী-সমস্ত কেবল দেবত্ব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

সাধনা।

মানব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে ভূষিত। মানব একাধারে পশু ও দেবতা। মানবে যে ব্রহ্ম আবরিত রহিয়াছেন, তাঁহারই নিদর্শন ও প্রমাণস্বরূপ তাঁহার দেবাংশ। ঘোর তমোগুণান্বিত মনুষ্য পশুতুল্য নরাধম; আবার পরম সাত্ত্বিক পুণ্যবান্ ব্যক্তিই দেবতুল্য মহাদেব। এই দেবত্বের স্ফুরণানুসারে মানবের মুক্তি-সাধনা। এই দেবত্বের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিতেই মানুষ ঈশ্বরের অবতার। যে পরিমাণে তাঁহার দেবত্ব, সেই পরিমাণে তাঁহার ঈশ্বরত্ব। তবেই সাত্ত্বিকগুণের স্ফূর্ত্তিসাধন করিয়া দেবত্বলাভ করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। মনুষ্য-জন্মের সার্থকতাই মনুষ্যত্ব। মানুষকে দেবত্ব দেওয়া এবং ব্রহ্মপদের অধিকারী করিয়া আনাই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মানুষ যে প্রকৃতপক্ষে একদিন ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হিন্দুধর্ম্মই দেখাইয়াছে। কি রূপে হিন্দুধর্ম্ম মনুষ্যের এই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে? যে রূপে সিদ্ধ করে, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের সাধনা বা উপাসনা-প্রণালী।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্ম লোকের জ্ঞান ও রুচি অনুসারে সাধনা-প্রণালীর সংঘটন করিয়াছে। তাহাতে বিবিধ সাম্প্রদায়িক উপাসনাপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্ম দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী অধিকার-ভেদ স্বীকার করিয়াছে। দেশ, কাল ও পাত্র-বিচার করিতেই হইবে। কারণ, দেশের প্রকৃতি-অনুসারে ধর্ম্মাচার-পদ্ধতি নিয়োজিত করা চাই।

সত্যযুগে দীর্ঘায়ু লোকের যে সাধনা-প্রণালী পরিষেব্য, তাহা কি কলিতে অল্পায়ু লোকের জন্য সম্ভবে? তাই, ধর্ম্মশাস্ত্রে কলিযুগের উপযোগী সাধনাপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাত্র-বিচার করাও একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানীর উপযুক্ত সাধনা অজ্ঞানী গ্রহণ করিবে কেন? শাক্তের সন্তান-সন্ততিগণ কি বৈষ্ণব বংশীয়গণের সহিত সমান পাত্র? সমাজের একাংশের জন্য ধর্ম্ম নহে। তাই, হিন্দুধর্ম্ম উচ্চ, নীচ ও মধ্য অধিকারী ভেদে নানাবিধ সাধনাপ্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহা-দের উদ্দেশ্য একই, কেবল প্রকরণ ভিন্ন মাত্র। এজন্য, সেই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে আদৌ দ্বিবিধ সাধন-পথ দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাধিকারীর জন্য নিবৃত্তি-পথ ও নিষ্কামধর্ম্ম; নিম্নাধিকারীর জন্য প্রবৃত্তি-পথের বিস্তারিত ক্ষেত্র।

নিবৃত্তিপথের নীচেই প্রবৃত্তিপথের মহা কাম্যক্ষেত্র; এই বিস্তারিত কাম্যপথেই লোক স্বর্গাদির অভিলাষী হয়। এই কাম্যপথ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে পারলৌকিক কামনা প্রশস্ত, অন্য ভাগে ঐহলৌকিক কামনাই প্রধান। ঐহলৌকিক কামনায় লোকে ইহকালেই ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা যশস্বী হইতে চায়; কেহ বা অতুল সম্পত্তি বা নানা সন্তানলাভের প্রয়াসী হইয়া ভগ-বানের কৃপা প্রার্থনা করে। অপরভাগে, লোকে পরলোকে সুখী হইবার নিমিত্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এই পারলৌকিক সুখের প্রতি একান্ত দৃষ্টি পড়িলে ক্রমে লোকে ঐহলৌকিক সুখত্যাগী হইতে থাকে। তখন সংযম আরম্ভ হয়। সুতরাং এই উভয় শ্রেণীস্থ জনগণকে কামনাই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেয়। এজন্য, এই মহাপ্রবৃত্তিপথ ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ।

এই মহা প্রবৃত্তি-পথে সাধারণ জনগণ সমস্তই আছে। সেই সাধারণ জনগণের প্রবৃত্তিকে ধর্ম্ম-কর্ম্মে ফিরাইয়া আনাই কাম্য পথের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই, এই পথ ভক্তি-সাধক ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের মহা ক্ষেত্র। কারণ, সাধারণ জনগণ কেবল ভক্তি দ্বারাই চালিত হইতে পারে। বুদ্ধির ও জ্ঞানের পথ তাহাদের নিকট তত ফলদায়ক হইতে পারে না। বেদে এই কাম্য পথের বিস্তারিত ক্ষেত্র পরিদৃষ্ট হয়। এই কাম্যপথ হইতে অল্প-সংখ্যক লোকই নিবৃত্তি-পথের পথিক হইতে পারে। কারণ, এই কাম্য-পথে চিত্তশুদ্ধি সাধিত না হইলে কেহ নিষ্কাম ধর্ম্মে উঠিতে পারে না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সাধনা ও মূল কথা। ইন্দ্রিয়-দমন ও রিপু-সংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধর্ম্মের সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং এই চিত্ত-শুদ্ধির সাধনাই প্রবৃত্তি-পথের সংযম ও প্রধান তপস্যা। যিনি যাহার শিষ্য বা ভক্ত হউন না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তুমি শাক্ত হও, শৈব হও, বৈষ্ণব হও, তান্ত্রিক হও, বা চৈতন্যদেবের শিষ্য হও, গাণপত্য হও বা সৌর হও, সংসারী হও বা বনবাসী হও, গুরু হও বা শিষ্য হও, পণ্ডিত হও বা মূর্খ হও, যাহাই হও না কেন, তোমাকে চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে হইবে, তবে হিন্দু-সমাজে ও হিন্দুধর্ম্ম-মতে সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। যাহার রিপুর শাসন ও ইন্দ্রিয়-দমন নাই, সে কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে সংযমী, সে সকল পথেই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাধু ও পুণ্যবান্ হইতে পারে। সংযমী হইয়া প্রবৃত্তিকে ভক্তি-পথে ঈশ্বর-পরায়ণ করিয়া আনাই প্রধান কথা।

চিত্তকে ইহ-সংসার হইতে ঈশ্বরে ন্যস্ত করাই তবে ভক্তিময়

কাম্য-পথের প্রধান উদ্দেশ্য। যতদিন পর্য্যন্ত না সমস্ত কামনা একই ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব হয়, যতদিনে না সমস্ত প্রবৃত্তি ভক্তিমুখী হইয়া কেবল ঈশ্বর-পরায়ণ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মে কাম্য-পথের সাধনা পর্য্যবসিত হয় না। যখন একা ঈশ্বরই সর্ব্বস্বের প্রভু ও একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি হইতে থাকেন, উপলব্ধি কি, সেই জ্ঞানানুযায়ী সর্ব্বকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে থাকে, আপনাকে সেই কর্ত্তারই যন্ত্ররূপে জ্ঞান হইতে থাকে, তখন সুতরাং সমস্ত কর্ম্মফল সেই ঈশ্বরেই সমর্পিত হয়। কারণ, ভগবান্ একাই কর্ম্মী, মানুষ কে? এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞান ও সংস্কার যখন স্বাভাবিক ও স্বতই সমুদিত হয়, তখন লোকে জ্ঞান-সাধক নিবৃত্তি-পথে আসেন। ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ দিয়া হিন্দু জ্ঞানযোগে উঠেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মের এই সকাম ও নিষ্কাম পথ-সকল বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ পথ। এইরূপ স্বাভাবিক সংযম-পথ দিয়া হিন্দুধর্ম্ম মানুষকে পুণ্যবান্ ও সাধু করিতে চাহে। এই দুই পথ বিভিন্ন হওয়াতে সেই ধর্ম্মকে নানা-মুখ দেখায়। প্রবৃত্তি-পথের সম্প্রদায়-ভেদে হিন্দু-ধর্ম্ম যেমন নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, তেমনি আবার এই ধর্ম্মবৃক্ষ অতি উচ্চাকাশেও উঠিয়া গিয়াছে। নিম্ন হইতে ইহার শিরোদেশ অনেক দূরে। এই দূরতা ও বিস্তৃতি তাহার নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি পন্থা-হেতু। তাই, হিন্দু-ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়-মধ্যে এত বিবাদ-বিসংবাদ ও তর্ক-বিচার। বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তি বিভিন্ন সাধন-পথের পথিক। সেই সেই পথ-অনুসারে প্রত্যেকের মতা-মত সঞ্জাত হইতে থাকে। তজ্জন্য মতভেদ ঘটিয়া যায়। এই মতভেদ অধিকাংশই নিম্নাধিকারী জনগণেই পরিদৃষ্ট হয়।

কারণ, তাহাদের অজ্ঞান ও মোহ অধিকতর। জ্ঞানের, রুচির ও প্রবৃত্তির তারতম্য-অনুসারে মতভেদ উপস্থিত হয়। নহিলে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন পথই স্বতন্ত্র নহে, সমস্ত-পথই নিবৃত্তি-মুখ হইয়া আছে। সেই নিবৃত্তি-ধর্ম্মের সহিত সকল পথের যোগ। সেই উচ্চতর ধর্ম্মে যাঁহারা কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগ-সূত্রে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা সবাই একই শান্তিময় সুখধামে উপনীত। * সেখানে বিবাদ-বিসংবাদ নাই, কলহ-কিচ্‌কিচি নাই, কেবলই ঈশ্বর-সম্ভোগ ও শান্তি। সেই শান্তি-ময় নিকেতনে আনিবার নিমিত্ত বিভিন্ন অধিকারানুসারে নানাবিধ উপাসনা-পন্থা বিরচিত হইয়াছে। ঈশ্বর-সম্ভোগী হইতে পারি-লেই পাপ-তাপ ও দুঃখরাশি আপনা-আপনি তিরোহিত হয়। যেমন সূর্য্যোদয়ে নিশার অন্ধকার স্বতই তিরোহিত হয়।

বদ্ধাবস্থা হইতে জীবকে মুক্ত করাই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার সে উদ্দেশ্য সাধন-নিমিত্ত জীবনব্যাপী সাধনার আব-শ্যকতা। জীবনব্যাপী সাধনায়ও তাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন; জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সে সাধনা করিতে হয়। এ জন্মে হয় ত কিয়দ্দূর হইল, আবার হয় ত জীবের পতন, পুনরায় তাহার উন্নতি, উন্নতি করিতে করিতে, না হয় কখন অবনতি, কখন উন্নতি করিতে করিতে শত সহস্র, শত সহস্র কি, কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তর চলিয়া গেল। চলিয়া যাইতে যাইতে হয় ত এক জন্মে

* শাস্ত্রে আছে, বেদ-বিদ্যা দ্বিবিধ, মোক্ষ-সাধিকা এবং মোক্ষেতর ফল-সাধিকা। এই মোক্ষেতর ফল-সাধিকা বিদ্যাই কর্ম্ম ও ভক্তিযোগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহারই অন্তর্গত শাক্তাদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপথ এবং তাহাই প্রবৃত্তি-পথকে মোক্ষ-সাধক নিবৃত্তি-পথে আনে।

সিদ্ধ হইল। ভগবানের রাজ্যে জীব যা'বে কোথায়? যাইলেই বা নিস্তার কোথায়? হয় ত চিরকালই পতিত রহিয়াছে; চির-কাল তাহার সংসারাবস্থা ঘটিতেছে। কিন্তু এক জন্মে, না হয়, আর এক জন্মে, কখন জীবাত্মার মুক্তি-সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

হিন্দু-ধর্ম্মের সাধনা-পথে এইরূপ সর্ব্ববিধ সাধনা, মতামত, ও বিশ্বাসমূলীয় আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়; কারণ, হিন্দু সাধনা সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্য। যিনি যেরূপ জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন না কেন, হিন্দু সাধন-পথের এক স্থানে, না হয়, অন্য স্থানে তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন। মানব-জ্ঞানের যতবিধ ভেদাভেদ হউক না কেন, সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চ দিয়া আত্মাকে উঠিতে হইবে। সেই প্রপঞ্চের পঞ্চবিধ ভেদ-জ্ঞানেই আত্মা * আচ্ছন্ন থাকিতে পারেন, কিন্তু অবশেষে যখন সেই প্রপঞ্চ কাটিয়া যায়, যখন সর্ব্ববিধ ভেদাভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন আত্মা নিজ অদ্বয়-স্বরূপ দেখিতে পান।

অদ্বৈতবাদ।

হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত সাধনা-পথ এজন্য অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনা। সেই সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে অদ্বৈত জ্ঞান। তাহার নিম্ন স্তরে দ্বৈতজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু সেই দ্বৈতজ্ঞান মধ্যেও অদ্বৈত জ্ঞান প্রচ্ছন্ন-ভাবে আছে। তাই, পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, দ্বৈতজ্ঞান দ্বিবিধ—শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রীয় দ্বৈতজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান

* জীব হইতে ঈশ্বর-ভেদ, জড় হইতে ঈশ্বর-ভেদ, জীব হইতে জড়ের ভেদ, জীবের পরস্পর-ভেদ, এবং জড়ের পরস্পর-ভেদ। এস্থলে জীব শব্দের অর্থ—চেতনা-বিশিষ্ট প্রাণী।

জন্মে, অশাস্ত্রীয় দ্বৈত, কামক্রোধাদি-জাত অতি তীব্র। সামান্য জনগণে এই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতজ্ঞান বিরাজিত। তাই, তাহারা জগতের বিষয়-জ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তাহাদের জ্ঞানে ঈশ্বর যেন জগৎ হইতে স্বতন্ত্র-রূপে অবস্থান করিতেছেন; পুরুষ যেন প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। দ্বৈতজ্ঞান যুক্তিতে অসিদ্ধ হইলেও সাধনা-পক্ষে স্বতন্ত্র পুরুষ-কল্পনা অবিহিত নহে। অবিহিত নহে এই জন্য যে, সেরূপ স্বতন্ত্র পুরুষ-কল্পনা-দ্বারা সেই মিথ্যা-জ্ঞানকে সত্য জ্ঞানে আনা যাইতে পারে। সেই সত্য জ্ঞানে পুরুষ-প্রকৃতি অভিন্ন। এরূপ অদ্বয় জ্ঞানে আনিবার জন্য হিন্দুর দেব-দেবী পূজার মধ্যে অদ্বয় ব্রহ্মভাব সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে যাহা স্বতন্ত্র দেখায়, তাহা বাস্তবিক স্বতন্ত্র নহে,—সকলই অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা। * তাই, শাস্ত্রীয় দ্বৈতজ্ঞানীর নিকটও এই উপাসনা-পদ্ধতি অবিহিত নহে। তিনি সেই উপাসনা-পদ্ধতিতে সেই একই অদ্বয়ব্রহ্মের পূজা করেন। সুতরাং, যাহা আপাততঃ অজ্ঞানীর জন্য বিহিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা জ্ঞানীর কাছেও বিহিত হইয়াছে। কারণ, হিন্দুর দ্বৈতজ্ঞানে অদ্বৈত ভাব সংশ্লিষ্ট হওয়াতে তাহা দ্বৈতাদ্বৈতে পরিণত হইয়াছে। দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত আভাসিত হইয়াছে। হিন্দুর দেব-দেবী বিশ্বরূপী—তাহার দেব সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মা, তাহার দেবী সর্ব্বব্যাপিনী অম্বিকা। হিন্দু প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করেন—সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় স্থূলরূপে সূক্ষ্ম দেবতার আবির্ভাব হয়। প্রস্তরের বা মৃত্তিকার মূর্ত্তি উড়িয়া যায়—ধ্যানে সেই সূক্ষ্ম দেবতারই পূজা হয়, যিনি বিশ্বব্যাপী পরম পুরুষ। হিন্দু বিশ্ব-পূজা

* এই ব্রহ্মবাদ পর প্রস্তাবে গৃহীত হইয়াছে।

করিয়া বিষ্ণু-পূজা করেন। সংসারছাড়া ঈশ্বর নাই; ঈশ্বরছাড়া সংসার নাই; তাই সন্ন্যাসীও সংসারী। তাহার সর্ব্বব্যাপী দেবতা বিশ্বের সর্ব্বরূপেই বর্ত্তমান। এ দেবতা খৃষ্টান বা মুসলমানের সর্ব্ব-ব্যাপী ঈশ্বর নহেন। তাহাদের ঈশ্বর বিশ্ব হইতে বিভিন্ন এক স্বতন্ত্র পুরুষ। খৃষ্টান বা মুসলমান মুখে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলেন মাত্র। কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী-রূপে সর্ব্বত্র দেখেন—শালগ্রাম-শিলায় দেখেন—সূর্য্যে, চন্দ্রে, তারকায়, গগনে, মেঘে, নদে, নদীতে, গঙ্গায়, গোদাবরীতে, কাশীতে, প্রয়াগে, জলে-স্থলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, বনস্পতি অশ্বত্থে ও বটে—সর্ব্বঘটেই বিশ্বব্যাপী রূপে অনুভূত করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। কেহই প্রকৃতির পূজা করে না, প্রকৃতি-শক্তি-নিহিত অভিন্ন পুরুষের পূজা করেন। সর্ব্বঘটে তিনি বর্ত্তমান বলিয়া হিন্দুর পূজা প্রধানতঃ ঘটে ও পটে। মূর্ত্তি না গড়িয়াও হিন্দু সেই পরম পুরুষকে পূজা করেন। ধান-চালে তাঁহার লক্ষ্মীপূজা—সেই লক্ষ্মীপূজা-স্থলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও নারায়ণের পুরুষরূপ অঙ্কিত হয়। অগ্রে অনন্তের পূজা, তবে দেবীপূজা। যেখানে দেবী, সেই খানেই মহাদেব। কৃষ্ণরাধা যুগলরূপে পূজিত হয়েন। হিন্দুর সমস্ত দেবদেবী যুগলরূপধারী। পুরাণেও নরনারায়ণ একত্র-লিপ্ত। সুতরাং, এই দেবদেবী-পূজায় অদ্বয়ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। হিন্দু দেখেন, ব্রহ্মেরই অনন্তরূপের ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি তাঁহার তেত্রিশ কোটি দেবতা—দ্বৈত-জগতের মধ্যে সেই অদ্বৈতের আভাস। দার্শনিক পণ্ডিতগণও বিবিধ অধিকারী জনগণের শিক্ষার্থ দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমস্ত বাদেরই লক্ষ্য সেই এক অদ্বৈতবাদ—কেউ বা সাক্ষাৎ ভাবে,

কেউ বা গৌণভাবে অন্বেত। পরব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ প্রকৃতি-অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, স্থূলরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড। তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ প্রকৃতির শক্তি মাত্র—যে শক্তিতে তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্ব লালন-পালন ও শাসন করিতেছেন। সেই লালন-পালন ও শাসন-কারিণী শক্তিতে তিনি ব্যস্ত। সুতরাং, তাঁহার নিজের কোন কর্ম্ম না থাকিলেও তিনি সেই প্রকৃতি-শক্তিতে শক্তিমান্, সেই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিধাতা ও নিয়ন্তা—সমস্তই। হিন্দু-উপাসনার্থ শক্তি ও শক্তিমান্‌কে অভেদ কল্পনা করেন। জীব যোগবলে ও সাধনাবলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করেন মাত্র—তখন গুণভাব বর্ত্তমান থাকে। শেষে নিস্ত্রৈগুণ্য সাধন দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মভাবে উপনীত হন। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়। ক্ষুদ্র নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। এইরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতিপথই আত্মার গতি—অনন্ত সাগরে গতি। তাই, হিন্দুধর্ম্মে অসংখ্য সাধন-পথ ও সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সে সমস্ত সাম্প্রদায়িক সাধনাপথের গতি এক-মুখী। এই গতিপথের এক বা অন্য স্তরে

ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মপ্রণালী আছে; হিন্দু কাম্য ও নিষ্কাম-পথ আছে, দেবদেবীর স্থূল সাকার উপাসনা আছে, এবং সূক্ষ্ম সাকার উপাসনাও আছে,—শাক্ত আছে, বৈষ্ণব আছে, খৃষ্টান আছে, মুসলমান আছে, বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে, শিক আছে, পার্সী আছে, ব্রাহ্ম আছে—সম্প্রদায়-ভেদে সবাই আছে। এমন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আর নাই। এ ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাই, সর্ব্ববিধ অধিকারী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এই ধর্ম্মমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ঘোর বিষয়ী

হইতে ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞানী পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের আশ্রিত। হিন্দু-ধর্ম্মের সাধনা-প্রণালী এজন্য সম্পূর্ণাবয়বী। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জনগণ-মধ্যে যিনি যেরূপ পূজা-পদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন, সে সকল পূজাই একই অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা। কি স্থূল সাকার, কি সূক্ষ্ম সাকার, কি নিস্ত্রৈগুণ্য-সাধক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, সর্ব্ব-উপাসনাই একমুখী হইয়া রহিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"—৪।১১।

এমত উদার ও উচ্চশিক্ষা কি কোন ধর্ম্মে আছে? হিন্দু-ধর্ম্মের উদার গর্ভে সর্ব্বাধিকারী জনগণকে গ্রহণ করিবার জন্য, সর্ব্ববিধ ভক্তকেই আশ্রয়দান দিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের এই উদার শিক্ষা। তাহাতে স্থূল দেবদেবীর উপাসক, স্বর্গকামী বা বৈকুণ্ঠ-সুখকামী, নিষ্কাম-ধর্ম্মী জ্ঞানী, সূক্ষ্ম ঈশ্বরোপাসক, সবাই আছেন। কারণ, সবাই ধর্ম্মের তপস্যা পথের পথিক; সবাই এক-দিকে যাইতেছেন, সবাই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরেরই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। হিন্দুর ধর্ম্মপথ এতই প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ। তাই বলি হিন্দুধর্ম্মের এই প্রশস্ত পন্থায় সর্ব্ববিধ হিন্দু সম্প্রদায়, ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী; খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সী, শিক, ব্রাহ্ম—সকলেই থাকিয়া অনন্ত ব্রহ্মপদমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ইউ-রোপীয় Pantheism দার্শনিক তত্ত্বমাত্র; আর্য্য Pantheism বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মপ্রণালী। সেই ধর্ম্মপ্রণালীতে অদ্বৈত জ্ঞানের সহিত ঐশী ভক্তি মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্ববিধ জনগণের আশ্রয়ভূমি করিয়াছে।

সমাজ-ধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ ধ্যান ও স্তবস্তুতির পূজা-পদ্ধতি নহে, তাহা সর্ব্ববিধায়ে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম। তাহা প্রতি ব্যক্তির শুধু সাধন-ধর্ম্ম নহে, তাহা পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মপ্রণালীরূপেও বর্ত্ত-মান। হিন্দুর ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী; এজন্য সর্ব্ববিশ্বকে সাধনা করিয়া হিন্দু ঈশ্বরোপাসনা করেন। কি দেব-মন্দিরে, কি পরিবার-মণ্ডলে, কি শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে, কি বিবাহে, কি আহার-ব্যবহারে—সর্ব্ব স্থলেই হিন্দুধর্ম্মের সাধনা। সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম ও গুণাগুণ লইয়া মানব সম্পূর্ণ। মানব শুদ্ধ ভক্তি নহে,—মানব শ্রদ্ধা, প্রেম, সৌহার্দ্দ, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা, দম্ভ, বীরত্ব, দ্বেষ, হিংসা, মৃদুতা, সহিষ্ণুতা, আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতি সকল গুণাগুণেই ভূষিত। সেই সমস্ত-বৃত্তির সমঞ্জসীভূত সংযমে ও তৃপ্তিতে মানবের ঈশ্বরোপাসনা। তাই হিন্দু, পরিবার-ক্ষেত্রে যেমন, সমাজেও তেমনি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানী। আবার দেবসমীপে, দেব-মন্দিরে, সাধুসঙ্গেও হিন্দু তেমনি ভক্ত। সমুদায় বিশ্বকে লইয়া এমন দেবোপাসনা বুঝি আর কোন ধর্ম্মে নাই। পরিবার-মণ্ডলে ও সমাজ-ক্ষেত্রে অজানতভাবে কেবল হিন্দু আচার ব্যবহারের অনুসারী হইয়া হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আচার-ব্যবহারের সহিত ধর্ম্মকে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "সমাজতত্ত্ব"-গ্রন্থে এ বিষয় সম্যক্ সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, কি শূদ্র, কি অশূদ্র, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, সবাই পরিবারমণ্ডলে এবং হিন্দু সমাজক্ষেত্রে সংসার ধর্ম্ম-সাধনার সহিত ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে হিন্দু সর্ব্ববিধ সাংসারিক ও বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

সেইরূপে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রবৃদ্ধি-সাধন করাইয়া হিন্দুকে ধর্ম্মপথে চিরদিন নিয়োজিত করিয়া রাখা হয়। সেইরূপে যাহার ভক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিতা হইতে থাকে, তিনি উত্তরোত্তর ধর্ম্মসাধন-পথে সমুন্নত হইতে থাকেন। সমুন্নত হইয়া পরম পবিত্র পুণ্যপথে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে পরম তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হয়েন; সেই তত্ত্বজ্ঞানে তাহার মুক্তি-সাধন হয়। সুতরাং কি বিষয়ক্ষেত্রে, কি সংসার-ধর্ম্মে—সর্ব্বস্থলেই হিন্দু গৌণভাবে মুক্তি-সাধন-পথে দণ্ডায়মান। তত্ত্বজ্ঞানী সাক্ষাৎ-ভাবে মুক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত, হিন্দু-সংসারী অসাক্ষাৎ-ভাবে সেইরূপ প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছেন। বিষয়-কার্য্যের সহিত ধর্ম্ম মিশাইয়া হিন্দুধর্ম্ম যেমন পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, এমত আর কোন ধর্ম্মপ্রণালী হয় নাই। কি দেবালয়ে, কি পরিবারমণ্ডলে, কি সমাজে—সর্ব্বস্থলেই হিন্দু ঈশ্বরোপাসক।

ব্রহ্মানন্দ-কৈবল্য।

খৃষ্টীয় প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রণালী আত্মার গতিপথের শেষ দেখাইয়া দেয়। কারণ, সেই সেই দ্বৈতমতে ঈশ্বর মানবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। তাহাতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা পর্য্যন্তই বিহিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যখন বলিল :—

"Be perfect as God."

তখন তাহা মানবাত্মাকে সামীপ্য-মুক্তি পর্য্যন্তই উঠিতে বলিল, যেন তদূর্দ্ধে আর তাহার গতি হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম আত্মার গতিপথ তদূর্দ্ধেও নিয়োজিত করিয়া বলিবে—Be God। বেদান্তী বলেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হ'ন—"ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি।” খৃষ্টীয় প্রভৃতি ধর্ম্মের মত হিন্দুধর্ম্মেরও সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্ম্মের খণ্ডদেশ মাত্র। হিন্দুধর্ম্মেও দ্বৈতবাদ আছে বটে, কিন্তু তাহা অদ্বৈতের সহিত মিশ্রিত হইয়া অদ্বৈত-প্রমুখ হইয়া আছে; যেন সেই খানেই তাহার শেষ সীমা নহে। হিন্দুধর্ম্মেও ভক্ত সামীপ্য লাভ করিয়া as God হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাই শেষ গতি নহে, ভক্ত আরও অগ্রসর হইতে পারেন; অগ্রসর হইয়া সারূপ্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ নিস্ত্রৈগুণ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যিনি না হইবেন, হিন্দুশাস্ত্র বলিতেছেন, তাহার আত্মার গতি সেই খানে আপাততঃ রুদ্ধ থাকিলেও জন্মজন্মান্তরের সাধনায় সে আত্মার চরম মুক্তি এক-দিন সাধিত হইবে। তখন আত্মা নিজ স্বরূপে উপনীত হইয়া পরম আনন্দ-ধামে আসিবেন। যতদিন এই নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত না হয়, ততদিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, আত্মার কিছুতেই সংসার-বন্ধন ঘুচে না। সুতরাং, হিন্দুধর্ম্মানুসারে মান-বাত্মার গতি অনন্ত-পথে—আনন্দ-ধামে। বিষয়ানন্দ সাধনা-বলে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া এই পরমানন্দ-ধামে আইসে। বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের দ্বার-স্বরূপ। কেবল হিন্দুধর্ম্মের সাধনা-বলে সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইতে পারে। বিষয়ী লোকের আত্মায় বিষয়ানন্দরূপে ব্রহ্মানন্দ আভাসিত আছে মাত্র। কারণ, সংসারের নানা মায়া-বন্ধনে সংসারীর আত্মা আবদ্ধ রহিয়াছে; আবদ্ধ থাকাতে আত্মার আনন্দ-স্বরূপ আবরিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা নিজ স্বরূপে আসিয়া অনন্ত ব্রহ্মানন্দে মিশিয়া যায়। যেমন দীপ-আলোক, সূর্য্য-আলোকের সহিত মিশিয়া যায়, তেমনি মানবাত্মার আনন্দ, অনন্ত পূর্ণানন্দময়

পরব্রহ্মে মিশিয়া যায়। এই মুক্তি-সাধন-পথ সুতরাং আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসাধন-পথ হইয়াছে। এজন্য, হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বসাধনা-প্রণালীই মুখ্যভাবে হউক, আর গৌণভাবে হউক, এই যোগসাধন-পথ। সেই যোগসাধন-তপস্যা ভক্তি-পথে, কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানমার্গে। এই ত্রিবিধ পথ হিন্দু ধর্ম্মের আপ্তবাক্য-মূলক শাস্ত্র পরিষ্কৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের মত আর কোন ধর্ম্মে আত্মার মুক্তিসাধন-পথ এত বিশদরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। তজ্জন্য, সেই বিষয়ের পরিচয়ে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব শতমুখে সপ্রমাণ হয়।



হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মবাদ।

ব্রহ্ম-চৈতন্য।

পূর্ব্ব-প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্ম-প্রণালী মুক্তি-অনুসারে সংগঠিত হইয়াছে। সেই মুক্তি-পথের চরমগতি যে ব্রহ্মপদ, সেই ব্রহ্মপদ এক্ষণে গৃহীত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম যে বেদান্তমূলক সেই বেদান্তমতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে না। তিনি অনাদি ও অনন্ত। কারণ, এ জগতে যদি বস্তু কিছু থাকে, তবে সেই বস্তু অবশ্য অনাদি হইবে। যেহেতু, সেই বস্তুর আদি স্বীকার করিলে, অনুমান করিতে হয় যে, তাহা অবশ্য অন্য বস্তু হইতে উৎপন্ন। নহিলে, সে বস্তু কোথা হইতে আসিবে? যদি সেই বস্তু অন্য বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়, তবে আবার সেই উৎপাদক বস্তুর আদি কি? সেই উৎপাদক বস্তু যদি তৃতীয় উৎপাদক বস্তুর উৎপন্ন পদার্থ হয়, তবে ত এইরূপে বস্তুর অনন্ত পারম্পর্য্য ঘটে। নিত্য বস্তুর যদি অনন্ত পারম্পর্য্য ঘটে, তবে তাহা অবশ্য অনন্ত এবং অনাদি। এই অনন্ত, অনাদি, নিত্য বস্তুর নামই ব্রহ্ম। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"——ছান্দোগ্য।

এই ব্রহ্মই যদি একমাত্র অদ্বিতীয়, নিত্য বস্তু হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি? সেই নিত্য সত্তা কি প্রকার? তিনি একমাত্র সত্তা-স্বরূপ বলিয়া বৈদিক ঋষি উদ্দালক তাঁহাকে সৎ-স্বরূপ বলিয়াছেন। এ জগতে সেই সত্তার চৈতন্য-রূপের পরিচয় সর্ব্বত্রই। অতএব, সেই সত্তা চৈতন্য-স্বরূপ। তাই, ঋগ্বেদে তিনি চিৎ-রূপে উক্ত হইয়াছেন। যাহা চিৎ-স্বরূপ, তাহা অবশ্য আনন্দময়।

সুখের অভাবই দুঃখ। সুখের অনন্তরূপই নিত্যানন্দ। এ জগতে যে সুখের পরিচয় আছে, সেই সুখ অপরিচ্ছিন্নরূপে অনন্ত হইলেই নিত্যানন্দময় হয়। তাই, পরম ঋষি সনৎকুমার ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতএব, ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্ম যদি একমাত্র নিত্য বস্তু হন, তবে আমরা যে পরিবর্ত্তন-শীল জগৎ দেখিতেছি, এ জগৎ কি? এ সমুদায় তাঁহারই রূপ।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"——ছান্দোগ্য।

এ জগৎ সমুদায়ই ব্রহ্ম, যেহেতু—তজ্জ—তাঁহা হইতে জন্মে; তল্ল—তাঁহাতে লীন হয়; এবং তদন্—তাঁহাতে স্থিতি করে বা চেষ্টিত হয়।

সুতরাং, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সহিত অনন্ত ব্রহ্ম-সত্তার সামঞ্জস্য এই যে, এ জগৎ যদি ব্রহ্মে লীন হয়, তবে তাঁহার সেই জগতের লীনাবস্থা আছে। সেই লীনাবস্থাই নির্গুণ বীজাবস্থা। যেমন বীজে বৃক্ষ লীন থাকে, তেমনি এ জগৎ এককালে ব্রহ্ম-রূপ অনন্ত বীজ-সত্তায় লীন থাকে। তাই যদি হয়, তবে ব্রহ্মের সেই বীজাবস্থা অবশ্য জগৎ-রূপ ব্যক্ত ও বিরাট অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র; তাহা অবিরাট, অব্যক্ত অবস্থা; আর এই জগৎ তাঁহার সেই বীজাবস্থার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তরূপই চেষ্টিত অবস্থা, সুতরাং অব্যক্ত অবস্থা নিশ্চেষ্ট। চেষ্টা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত। সুতরাং, নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এই ত্রিবিধ চেষ্টা যদি লীন থাকে, তবে সেই অব্যক্ত ও বীজাবস্থার নিশ্চেষ্টতা-বশতঃ তাহা নির্গুণ। অতএব, যখন বেদান্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্ম—নির্গুণ, তখন বুঝিতে হইবে, সেই নির্গুণ-শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয়; এবং সগুণ-শব্দের অর্থ সচেষ্ট বা সক্রিয়। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলে এমত বুঝায়

না যে, তাঁহাতে গুণের একেবারে অভাব, তাঁহাতে ঐ ত্রিগুণের একেবারে অভাব নহে, তাহা অন্তর্লীন মাত্র।

ঈশ্বর, কূটস্থ ও জীব-চৈতন্য।

অতএব বেদান্ত যেমন বলিয়াছেন, এ জগৎ এককালে ব্রহ্মে লীন হয়, তেমনি আবার বলিয়াছেন, এ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত থাকে। এই উৎপন্ন-শব্দের অর্থ এমত নহে যে, পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল না, সেই বস্তুর সহসা উদ্ভব হইল; ইহার অর্থ, সেই অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার বীজাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিলেন। প্রথমে, সেই অনন্ত নির্গুণ সত্তা এক অনন্ত গুণমাত্র-ব্যঞ্জক সগুণ সত্তারূপে দেখা দেয়। তাহার নামই মহত্তত্ব। এই মহত্তত্বই ক্রমশঃ বিশ্ব-বিকাশিনী বা সৃষ্টি-কারিণী সূক্ষ্মশক্তি-সমূহে বিবৃদ্ধ হয়। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার সাত্ত্বিক ক্রিয়াশীলতার নামই সগুণ মহত্তত্ব। "বেদান্ত-সার"-প্রণেতা পরমহংস শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র বলিয়াছেন, এই শুদ্ধ-সত্ত্ব, সগুণ মহত্তত্বই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। বস্তুতঃ এই মহত্তত্বই ঈশ্বর-চৈতন্যের উপাধি; এই উপাধি নির্ম্মল জ্ঞানময় সত্তা। এই নির্ম্মল জ্ঞানময় মহত্তত্ব কখন কখন মনঃ বা বুদ্ধি নামেও অভিহিত হন। যেমন ব্রহ্ম মহত্তত্বে ঈশ্বর-চৈতন্য-রূপে বিবর্ত্তিত হন, তেমনি সেই মহত্তত্ব হইতে যখন আবার বিশ্ব-শক্তির পরিণাম ঘটে, সেই ঈশ্বর-চৈতন্য আবার সেই সমস্ত শক্তির চৈতন্য বা আত্মা-রূপে দেখা দেন।

এই মহত্তত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বের শক্তিময় অণ্ড-স্বরূপ। * ঈশ্বর-চৈতন্য এই শক্তি-সমূহের

---

* এই ব্রহ্মাণ্ডই অবিশেষ মহত্তত্ব হইতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় বীজোৎ-

আত্মা-রূপে অবস্থিত হইলে তাঁহাকে কূটস্থ চৈতন্য বলে। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে যখন বিরাট বিশ্ব প্রসূত হয়, তখন এই কূটস্থ চৈতন্য চেতনাচেতন জীবের সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের আত্মা-রূপে দেখা দেন।

প্রতি জীবের অন্তরে তবে এই কূটস্থ চৈতন্য আত্মা-রূপে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থাই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎ। যাহা শক্তির আত্মা-স্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকাশিত হইলে, সেই কূটস্থ চৈতন্য প্রতি চেতন জীবের আত্মা-রূপে এবং অচেতন জীবেরও আত্মা-রূপে অবস্থিত থাকেন। যাহা এই জীব-চৈতন্যের উপাধি, তাহাই জীব নামে অভিহিত।

চৈতন্য তবে চতুর্ব্বিধ—ব্রহ্ম-চৈতন্য, ঈশ্বর-চৈতন্য, কূটস্থ-চৈতন্য এবং জীব-চৈতন্য। চৈতন্য এই চতুর্ব্বিধ আকারেই অনন্ত। তিনি অনন্তরূপে এই বিশ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্ব ত খণ্ডিত জীবপূর্ণ; তবে ব্রহ্মচৈতন্য অনন্তরূপে আছেন কি প্রকারে? বিশ্ব সেই খণ্ডিত জীবপূর্ণ হইয়াও অনন্ত, এজন্য অনন্ত ব্রহ্ম সেই বিশ্বব্যাপী হইয়া আছেন। এ বিশ্বের জীবরূপ-সমস্ত খণ্ডিতাকার ধারণ করিলেও ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বদর্শীর নিকট তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য রূপে প্রতীত হয় না। কেবল স্থূলদর্শীর নিকট বিশ্বের খণ্ডিত রূপ। সেই স্থূলদর্শী জনগণকে অনন্তের আভাস দিবার জন্য ব্রহ্মবিৎ যেরূপ

পত্তি। এই বিশেষ জাতীয় বীজ-সত্তাই বৈশেষিকের বিশেষ-পদার্থ। পরমাণুবাদীর বিশেষ বিশেষ পরমাণু-জগৎ—বেদান্তীর হিরণ্যগর্ভ—পৌরাণিকের ব্রহ্মা—জাতিবাদের জাতি-সমষ্টি-সম্পন্ন ব্রহ্মার কায়া। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীব পর্য্যন্ত নৈয়ায়িকদিগের আরম্ভবাদ-ভুক্ত।

বৈজ্ঞানিক অনুমানে বিশ্বের অনন্তত্ব খ্যাপন করেন, তাহা বলা যাইতেছে।

অনন্ত রূপের প্রমাণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদি ও অনন্ত। অনন্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলে তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত সত্তা এক বই দুই হইতে পারে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহা সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত। যাহা অনন্তরূপে সর্ব্বব্যাপী, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্তুর সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তুই অবস্থান করিতেছে।

এ কথা যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র-সত্তা অসত্য। জগৎ আবার অনন্ত হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদি বল, জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে, পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএব, জগৎ বাসুদেবেই অবস্থান করিতেছে। এক নারায়ণ বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। কোন ন্যায়ে এ যুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদার্থ, তাঁহারা পাকতঃ পরমেশ্বরের অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করেন না। যখনই বলিলে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার করিলে। সুতরাং, নারায়ণ যদি অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, এই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই নারায়ণের শরীর ও রূপ। তিনি অনন্ত বিশ্বের বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন; এবং এই অনন্ত বিশ্ব বাসুদেবে অবস্থান করিতেছে।

যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদি। যাহার আদি আছে, তাহার সীমা ও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না। সুতরাং অনন্ত পদার্থ অনাদি। এই অনন্ত পদার্থেরই বিকাশ ও দেহ যদি বিশ্ব হয়, তবে এ বিশ্ব অবশ্য অনাদি। এই বিশ্ব, অনাদি ও অনন্ত নারায়ণের রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যাস মহাভারতে ব্রহ্মার রূপ এই প্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি; মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র-চতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী-সকল শিরা, এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয় রূপে পরিণত হইল; এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল।" *

ভগবদ্গীতায় ব্যাস বাসুদেবের বিরাট বিশ্বমূর্ত্তির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে বহুমুখ ও বহু-নয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ুধধারী, দিব্যমাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্য গন্ধচর্চ্চিত, সর্ব্বতোমুখ, অদ্ভুত-দর্শন, পরম ঐশিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ধনঞ্জয় তাঁহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত, একস্থানস্থিত, সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে দেব! আমি তোমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন অনন্তরূপ নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রলাঞ্ছিত, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সূর্য্যসঙ্কাশ,

* শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি! তুমি অক্ষয়, পরব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন ধর্ম্মপ্রতিপালক ও অনন্তবীর্য্য; হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ এবং একাকী হইয়াও অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। * * * * * আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী বহু বর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাল লোচন ও অতিপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি-অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নি-সন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছে; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

ব্যাস পৌরাণিক ভাষায় নারায়ণের বিশ্বরূপ এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়া সংসারের অনাদিত্ব তদ্রূপ পৌরাণিক ভাষায় এই প্রকার বর্ণন করিতেছেন।

"হে অর্জ্জুন! সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; উর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোতে উহার শাখা। বেদ-সমুদায় উহার পত্র। যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা। এই বৃক্ষের শাখা অধঃ ও উর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, উহা সত্ত্বাদি গুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়-সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম প্রভৃতি মূল-সকল অধঃ প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধমূল সুদৃঢ় অশ্বত্থবৃক্ষ নির্ম্মমত্ব-রূপ শস্ত্র-দ্বারা ছেদন করিয়া উহার মূলীভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে; উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।"

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ। সেই শাস্ত্রমতে শুদ্ধ যে নারায়ণ অনন্ত ও অনাদি এমত নহে, যে বিরাট বিশ্ব নারায়ণের

রূপ ও দেহ, সেই বিশ্বও অনাদি এবং অনন্ত। বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত এবং এই সংসারও অনাদি ও অনন্ত। সংসারস্থ জীবস্রোত সেই অনাদি ও অনন্ত দেবের স্থূল শরীর মাত্র। এই সংসারের জীবস্রোত অনন্ত-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। উহার আদি-অনুমান কল্পনা মাত্র। ন্যায় ও প্রমাণে সে আদি সাব্যস্ত হয় না। জীবস্রোতের আদি দেখিতে গেলে আমরা অনন্ত-বংশ-পরম্পরায় উপনীত হই। উহার আদি খুঁজিয়া পাই না। সংসারের জীবস্রোত অবলম্বন করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠি না কেন, অবশেষে অনন্ত দেশে মিলাইয়া যাই। তখন কাজেকাজেই বলিতে হয়, সংসার ও জীবস্রোত অনাদি। উদ্ভিদ জীব দেখ, তাহাও অনাদি। কোন্ বৃক্ষের তুমি আদি খুঁজিয়া পাও? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মিতেছে। বৃক্ষ ও বীজ, চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রথম বীজ কল্পনা করিলে প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিতে হয়। তদ্রূপ প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিলে প্রথম বীজের কল্পনা করিতে হয়। মনুষ্যের আদি কোথায়—তাহাও মনুষ্যের নিকট ঘোর প্রহেলিকা। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জীব জরায়ুতে বর্ত্তমান। জরায়ুর পূর্ব্বে জীব শোণিত-শুক্রময় বীজে বর্ত্তমান। এই শোণিত-শুক্র জৈবিক পদার্থে পরিপূর্ণ। সেই জৈবিক পদার্থের মিলন ও মিশ্রণে বীজের উৎপত্তি। সুতরাং বীজের পূর্ব্বে জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান। সেই জৈবিক পদার্থ ও কোষ-সমুদায় পিতামাতার শরীরে বর্ত্তমান। আমি নিজে যেরূপে উৎপন্ন, আমার পিতামাতাও সেইরূপে উৎপন্ন। আমি পিতামাতার আত্মজ। আবার, আমার পিতামাতা তাঁহাদের পিতামাতার আত্মজ ও আত্মজা। শরীর হইতে শরীরের উৎপত্তি। শারীর পদার্থ ভিন্ন শারীর পদার্থের উৎপত্তির

কারণ হইতে পারে না। উদ্ভিদের যেমন, বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, মনুষ্যেরও তেমনি মনুষ্য হইতে বীজ, বীজ হইতে মনুষ্য। আজি যেরূপে মনুষ্য উৎপন্ন, শতবর্ষ পূর্ব্বে, সহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও সেই প্রকারে উৎপন্ন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, হইতেও পারে না। সুতরাং মনুষ্যের আদি ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনন্ত-পর্য্যায় আসিয়া পড়ে। অনন্ত-শ্রেণী-মনুষ্য বংশপরম্পরায় জন্মিয়া আসিয়াছে। এই বংশপরম্পরার শেষ নাই। দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের উৎপত্তি যদি হঠাৎ শূন্য হইতে সম্ভব হয়, তবে আজিও হইতে পারে। কিন্তু আজি ত কোন জীবকে হঠাৎ শূন্য হইতে জন্মিতে দেখি না। এ সম্ভাবনার কথা কেবল কল্পনা মাত্র—মূর্খের কল্পনা। প্রাকৃতিক নিয়মের কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কখন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহা মনুষ্যের দৃষ্টান্তে সত্য, তাহা অন্যান্য জীবেও সত্য। সুতরাং জীব অনাদি। এই জীব-সমূহ সেই অনন্ত-দেবের অনন্ত বিশ্বে লীন হইয়া আছে। অনন্ত-দেবের শরীরে জীবদেহ কিরূপে লীন হইয়া আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা মনুষ্যের দৃষ্টান্ত লইয়া এই তত্ত্বের আলোচনা করিব। যাহা মনুষ্যজীবে খাটে, তাহা সর্ব্বজীবে খাটে।

যাহাকে আমি আমার দেহ বলি, সেই দেহের সীমা কোথায়? কই, স্থূল দেহ ত আমার সীমা নহে, আমি যে অনন্তদেশে লীন হইয়া রহিয়াছি। মহাসাগরের একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ যেমন সেই মহাসাগরের অঙ্গ, আমিও তেমনি অনন্তদেশের মহাসাগরের একটী ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মাত্র। আমার বাহিরে চারিধারে আকাশ, আমার অভ্যন্তরে দেহময় আকাশ। বাহিরের আকাশ আমার দেহের ভিতরে ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমার স্থূলদেহ

ছিদ্রময়, অস্থি ছিদ্রময়, নাড়ীসকল ছিদ্রময়। দেহের প্রতি অংশ, অংশেরও প্রতি অংশ, এবং তাহারও অণু সমুদয় ছিদ্রময়। দেহের এমত পরমাণু নাই, যাহা ছিদ্রময় নহে। তবে আকাশ আমার কোথায় নাই? আকাশ আমার দেহের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সেই আকাশই ত অনন্ত আকাশে আসিয়া মিশিয়াছে। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে, আমি অনন্ত আকাশে মিশিয়া আছি।

আমি বায়ু-সাগর-বেষ্টিত। এই বায়ু-সাগর-মধ্যে আমি একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। শুদ্ধ দ্বীপ নহে, বায়ু এই দ্বীপের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট। বায়ুই এই দ্বীপের অঙ্গ। আমার দেহের কোন্ স্থানে বায়ু নাই? সেই বায়ু কি বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিত নহে? বাহিরের বায়ুর শেষ কোথায়? কে জানে অনন্তদেশ কি পদার্থে পরিপূর্ণ? যে বায়ু-সাগর অথবা তৎসম পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া আছে, যাহা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতেছে, সেই বায়ু দেহাভ্যন্তরিক সমুদয় আকাশদেশ পূর্ণ করিয়া তোমাকে অনন্ত বায়ু-সাগরের সহিত মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি লোমকূপ দিয়া দেহাভ্যন্তরে গিয়া, গাত্রের প্রতি ছিদ্র ও অণুছিদ্র পূর্ণ করিয়া, প্রতি অস্থির ছিদ্রদেশে থাকিয়া প্রতি নাড়ীর আকাশদেশে অবস্থিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেহ-মধ্যে কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতেছে। মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"সমান বায়ুস্রোত দেহাগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে, অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে।" * * "প্রাণবায়ু অগ্নিবেগ-প্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে

আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগকূর্ম্মাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ু-প্রভাবে নাড়ী-সমূহ দ্বারা শরীর মধ্যে উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে পরিচালিত হয়।" *

বায়ুস্রোত যে কেবল শরীরের বাহিরে অবস্থান করিতেছে এমত নহে, দেহের অভ্যন্তরেও তাহার কার্য্য চলিতেছে। স্রোত যে কেবল অনন্ত বায়ুসাগরে প্রবাহিত এমত নহে, দেহ-জগতেরও আভ্যন্তরিক আকাশে প্রবাহিত হইতেছে। বায়ু আমাদের শরীরকে অনন্ত দেশের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। তাহা শুদ্ধ নাসিকার রন্ধ্র দিয়া যে দেহাভ্যন্তরে যাইতেছে এমত নহে, দেহের সর্ব্বদেশ দিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে এবং দেহকে অনন্ত দেশের সহিত একত্র করিয়া রাখিয়াছে। এই বায়ুই শরীরের প্রাণ। জীব বায়ুতে নিয়ত অবস্থান করিয়া জীবিত রহিয়াছেন। জীবের চারিদিকে যেমন অনন্ত আকাশ, তেমনি অনন্ত বায়ু-সাগর। জীব বায়ু-সাগরে মিশিয়া রহিয়াছেন। রস ও অগ্নি এই বায়ু দ্বারাই দেহ মধ্যে বিচরণ করিতেছে। জীব বায়ুময়, বায়ু তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

বাহ্যজগতের শুদ্ধ আকাশ ও বায়ুরাশি দ্বারা যে আমরা অনন্তের সহিত মিশিয়া আছি এমত নহে, অগ্নি এবং রসও আমাদিগকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। বাহ্যজগৎ অগ্নি ও তেজোময়, আমাদিগের শরীরও অগ্নিময়। অগ্নি আমাদের সমুদয় দেহকে জীবিত ও উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের অগ্নি আমাদিগের গাত্রকে কখন শীতল, কখন উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। যে অগ্নি বাহিরে বর্ত্তমান, সেই অগ্নিই দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। কেবল স্থানবিশেষে অবান্তর কারণবশতঃ তাহার আধিক্য

মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মান্তর্গত ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ-দেখ।

ও অনাধিক্য ঘটিতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস এই অগ্নিকে জ্বালিতেছে ও উহার উষ্ণতা বাহিরে আনিতেছে। বাহিরের উত্তাপ গাত্র দিয়া দেহ-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। প্রবিষ্ট হইয়া দেহাগ্নিকে রক্ষা করিতেছে। দেহের তাপ আবার গাত্র দিয়া বাহিরের সহিত মিশিতেছে। মহাভারত বলিতেছেন :—

"অগ্নি প্রাণিগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীর-রক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি-সমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।" * * "অগ্নি শরীর মধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উৰ্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে।" * * * "জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে সমুদায় শিরা দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে।" *

বায়ু কেমন দেহাগ্নিকে শরীরের সর্ব্বত্র লইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহিরের অনন্ত দেশে যে অগ্নি কোথাও লীনাবস্থায়, কোথাও স্ফুরিতাবস্থায় রহিয়াছে, শরীর-মধ্যেও সেই অগ্নি তদ্রূপ রহিয়াছে। বাহ্যজগতের প্রভাবে তাহা কখন উদ্দীপ্ত কখন বা ঈষৎ আবির্ভূত হইতেছে। দেহের প্রতি পরমাণুতে অগ্নি সমাশ্রিত। সেই লীন অগ্নি কভু উদ্রিক্ত কভু বা আবার বিলীন হইতেছে। জীব অগ্নিময় হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহাভ্যন্তরে প্রতিক্ষণে যে সৃষ্টিকাণ্ড চলিতেছে, যাহা দ্বারা অন্নের ও রসের পরিপাক হইয়া তাঁহার দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে, সেই সৃষ্টিব্যাপার অগ্নি ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টি অগ্নিময়, ব্রহ্মা অগ্নিময়। অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডময় ও

* মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদ দেখ।

অনন্তদেশে বিস্তৃত,—আকাশে, মেঘে, বিদ্যুতে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে—সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত। একই অগ্নি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

শুদ্ধ আকাশ, বায়ু ও অগ্নিই কি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে? জল এবং রসও তাহাকে অনন্তের সহিত একত্রীভূত করিয়াছে। মনুষ্যের দেহাগার রসে পরিপূর্ণ, বায়ুও রসে পরিপূর্ণ। যে রস বায়ুকে সিক্ত করিয়া শীতল করিতেছে, সেই রস সেই বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিতেছে। শরীরের উত্তাপ এই রসে কিয়দংশ প্রশমিত হইয়া মন্দীভূত হইতেছে। শরীর বহির্দ্দেশীয় রসে প্লাবিত হইয়া অনন্ত জগতের রসে মিশিয়া রহিয়াছে। বায়ুতরঙ্গ, সেই রস দেহের অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, কূপে কূপে, অস্থিতে অস্থিতে প্রবাহিত করিতেছে। বায়ু আপনি যেমন দেহের সমস্ত আকাশ-দেশ পরিপূর্ণ করিতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বাহ্য রস লইয়া শরীরের সকল পরমাণু সিক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা যে সমস্ত পানীয় গ্রহণ করি, তাহা পরিপাক-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরীরের সমস্ত রস কোন্ উপায়ে আহৃত হয়? সেই রস কি বাহ্য জগতের বায়ু-সঞ্চারিত রস নহে? অতএব, যে রস অনন্ত জগতে বায়ুর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট ও সংবিদ্ধ হইয়া আছে, সেই রস আমাদের শরীরেও অনুবিদ্ধ হইয়া জগতের রসের সহিত শরীরকে রসসিক্ত করিয়া অনন্তের রসের সহিত শারীরিক পরমাণু-পুঞ্জকে রস-প্লাবিত করিয়া রাখি-য়াছে। শরীরের জল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ ও শোণিত শুদ্ধ যে পানীয়-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে এমত নহে, অনন্ত

আকাশের রসেও তাহা পরিবর্দ্ধিত ও প্রশমিত হইতেছে। শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয়-সমুদয় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল, বায়ু ও অগ্নি নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে এমত নহে, মনুষ্য-দেহকে অনন্ত দেশের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

জল, বায়ু, অগ্নি ও ব্যোম, এই চতুর্ভূত দ্বারা মানবদেহ কেমন অনন্তের সহিত একাধার হইয়া আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, পঞ্চম ভূত ক্ষিতিব কথা। যদি আমাদের পৃথ্বীতল অনন্তের অংশ মাত্র হয়, যদি পৃথিবী-দেশ সচ্ছিদ্র আকাশময় হয়, যদি সচ্ছিদ্র আকাশময় ভূমণ্ডল বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যদি রসাতল সর্ব্ব রসের আধার হয়, যদি অগ্নি ক্ষিতিতলের স্তরে স্তরে সংবিদ্ধ ও বিলীন থাকে, তবে এই কঠিন মেদিনীমণ্ডল তাহার কঠিন সত্তার সহিত অনন্ত দেশে মিশিয়া রহিয়াছে না ত কি? এবং আমাদের দেহযষ্টি যে সেই পৃথ্বীদেশের অংশমাত্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি এই দেহ ক্ষিতিরই অংশ হয়, এবং ক্ষিতি যদি অনন্ত বিশ্বের অংশ হয়, তবে আমাদের শরীর যে অনন্ত বিশ্বের অংশ নয় কে বলিতে পারে? আর ভূমণ্ডল যদি বিশ্বের সহিত এক হয়, যদি অনন্ত বিশ্ব ভূমণ্ডলকে এক সঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে এই মনুষ্য-দেহরূপ ভূমণ্ডলের অংশও অনন্ত দেশের সহিত মিশিয়া আছে। ভূমণ্ডলে পঞ্চভূত ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। মানব-দেহ যেমন ইন্দ্রিয়াত্মক পঞ্চভূতের ঘনীভূত মূর্ত্তি, ভূমণ্ডল সেইরূপ অনন্ত দেশের এক ঘনীভূত মূর্ত্তি। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রাজ্যে ও অনন্ত আকাশে যে এইরূপ কত কোটি কোটি ঘনীভূত মূর্ত্তি আছে, কে বলিতে পারে? যেমন

অনন্ত বিশ্বের ইয়ত্তা নাই, তেমনি গগনদেশের জ্যোতিষ্করাজিরও ইয়ত্তা নাই। অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে এই সমস্ত ঘনীভূত মূর্ত্তি স্থাপিত ও ভ্রাম্যমাণ হইয়া রহিয়াছে। অনন্ত দেশের যে অংশ পৃথ্বীতলের নিকটবর্ত্তী, সেই অংশে যে সূক্ষ্মভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই ঘনীভূত হওয়াতে পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী ও তৎ-উপরিস্থিত পঞ্চভূতাত্মক প্রাণিপুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চভূত সমুদয় পৃথ্বীদেশের পুঞ্জীকৃত ভূতরাশি হইতে বিকীর্ণ হইয়া যে অনন্ত দেশের কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে? এবং সেই সীমার পর যে এই সমুদয় ভূত আবার কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই পঞ্চভূত সমুদয় :আবার কি আকারে পরিণত হইয়া কোন্ লোকে সেই সমস্ত ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেবল অনন্তদেবই জানেন। এই সমস্ত লোকমণ্ডলে দেবতারা আবার কি প্রকার সূক্ষ্মাকারে গঠিত, তাহাই বা কে জানে? সে যাহা হউক, অনন্তদেশ যাহা দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, এই ভূমণ্ডল যখন তাহার কণামাত্র, সেই কণায় ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জ যে অনন্তদেশের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। নিজে ভূমণ্ডলই যখন অনন্তের কণামাত্র, ভূমণ্ডলের প্রাণিপুঞ্জ আবার যখন সেই ভূমণ্ডলের কণামাত্র, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেই প্রাণিপুঞ্জ অনন্তদেশের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম কণা। আবার সমগ্র মানবকুল কি ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র অংশ নহে? মানবজাতি যখন ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র কণা, তখন কি আর পরিমাণ হয়, সেই মানবকুল অনন্তের কত ক্ষুদ্রতম কণার কণামাত্র? অনন্তের সহিত তুলনায় এ কণার পরিমাণ হয় না।

যাহার পরিমাণ হয় না তাহা পরমাণুবৎ, তাহা যে অনন্ত বিশ্বের সহিত এক অঙ্গে মিলিয়া থাকিবে তাহাতে আর সংশয় কি? সমগ্র মানবকুলের আমি কত কোটি অংশ? আমার দেহস্থিত একটী পরমাণু আমার বিশালদেহের যত অংশ, আমি সমস্ত মানবজাতির হয় ত তত অংশ হইবার সম্ভাবনা। সে স্থলে আমি অনন্তদেশের কোথায়! যখন সমগ্র মানবজাতি অনন্তের কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার স্থান যে অনুমানেও পরিমাণ হয় না! আমি কেবল বলিতে পারি, আমি অনন্তের কোথায়! আমার প্রতিধ্বনি অমনি বলে, আমি অনন্তের কোথায়! বাস্তবিক, অনন্তের মধ্যে যে আমি কোথায় লীন হইয়া আছি, কল্পনায়ও তাহার ধারণা হয় না। অনন্ত হইতে সম্ভূত আমি অনন্তধামের যাত্রী এবং অনন্তে আমি লীন হইয়া যাইব। তবে আমি একবার রামপ্রসাদের সঙ্গে গাই:—

"বলদেখি ভাই কি হয় ম'লে?"

"ও তুই যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে, যেমন জলবিম্ব মিলায় জলে।"

যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যজীব অবস্থিত, সেই ভূমণ্ডল যে অনন্ত আকাশে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে এই দেখুন মহাভারত কি বলিতেছেন:—

"ভৃগু কহিলেন, তপোধন! আকাশমণ্ডল অনন্ত, রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। উঁহাদের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই অনন্ত আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জ-কলেবর দেবতা বাস করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। * * * বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদায় পদার্থকে

আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। *** যে বস্তুর চরম-সীমা অদৃশ্য ও অগম্য, কোন্ ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ এবং দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা-নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত নামের অনুরূপ রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্যরূপ কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে।" *

আত্মার প্রমাণ।

এই আকাশদেশ যে অসংখ্য সূর্য্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ তাহা মহাভারতও বলিয়াছেন। এই সূর্য্যমণ্ডল-সমস্ত অনন্তদেশ-ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলস্থ এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল তবে সেই অনন্ত দেশের কণামাত্র নহে কি? তাই যদি হয়, তবে সেই ভূমণ্ডলস্থ জীবসংঘ কি?. এই জীব-সমূহও কি অনন্তে লীন নহে? জীব-দেহও অনন্তের কণামাত্র। যে ব্রহ্ম এই অনন্ত পদার্থে অন্তর্লীন রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ব। সেই সর্ব্বকে আমরা আমাদের স্থূলদৃষ্টি-হেতু দেখিতে পাইতেছি না। এই স্থূলদৃষ্টিকে ক্রমে যোগবলে সূক্ষ্ম-দর্শী করিতে পারিলে তবে তাঁহাকে দেখা যায়। তাই মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"মহান্ আত্মা নবদ্বার-সম্পন্ন সত্ত্বাদিভাব-পরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত উহাকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি অজর ও অমর। *** এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয়-লাভের কারণ; কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শন

* শান্তিপর্ব্ব ১৮২ অধ্যায়। কা, সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মার প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। দেহের অনন্তত্ব-নিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই রহিয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহ-সম্বন্ধ ছেদনের উপায়ান্তর নাই।" *

তবেই মহাভারত বলিতেছেন, দেহের অনন্তত্ব-নিবন্ধন আত্মার দেহ-সম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই রহিয়াছে। এই আত্মার প্রত্যক্ষ এবং অনুমান-সিদ্ধ প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। ইহা সূত্রাত্মা-রূপে জীবে চিরকালই জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং প্রলয়কালে পরব্রহ্মে লীন হইয়া আবার সৃষ্টিকালে পুনরাবির্ভূত হয়েন। সৃষ্টিকালে পরব্রহ্ম যখন ঈশ্বর-চৈতন্যরূপ ধারণ করেন, তখন সেই ঈশ্বর-চৈতন্য পরমাত্মা-রূপে নিজ কর্তৃত্বশক্তি-প্রভাবে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ব্যক্ত হয়েন। সেইরূপে ব্যক্ত হওয়ার নামই সৃষ্টি এবং সেইরূপে অবস্থিতির নামই স্থিতি। কালপূর্ণ হইলে এই বিশ্ব আবার তাঁহাতেই বিলীন হইবে। তখন প্রলয় উপস্থিত হইবে। তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন ঃ—

"স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ॥
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্॥"—১।২—৬৩—৬৫।

* শান্তিপর্ব্ব ২১০ অধ্যায়। কা, প্র, সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত।

"প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকে পালন করেন, এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হয়েন। যেহেতু পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিরূপ জগৎ সমস্তই পুরুষাখ্য। যখন ঐ অব্যয় হরিই সর্ব্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ তখন ভূতস্থ সর্গাদি (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) তাঁহারই বিভূতির বিস্তার হেতু (উপকারক)।

মনুষ্যে অনন্তের প্রতীতি।

তবেই এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহারই ব্যক্তাবস্থা মাত্র। আকাশ—অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল ; বিষ্ণু সেই অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। যিনি নিজে অনন্ত, তাঁহার রূপও অনন্ত। তবে কেন আমাদের চক্ষে এ বিশ্ব খণ্ডিত আকারে পরিচ্ছিন্ন দেখায় ? বিজ্ঞান-চক্ষুর অভাবে। মনুষ্য রজঃ ও তমোগুণান্বিত হইয়া স্থূলদর্শী হইয়াছে। সেই স্থূলদর্শনে সকলই পরিচ্ছিন্ন দেখায়। স্থূলদর্শনে অনন্তের প্রতীতি হয় না। বাহ্য-বিজ্ঞান সেই অনন্তের আভাস মাত্র দেয়। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে মানুষের যে অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, সেই অন্তর্দৃষ্টিতে সম্যক্ দর্শন উৎপাদিত হইলে অনন্তের পূর্ণ প্রতীতি ও প্রত্যক্ষ হয়। বেদবেদান্ত এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই জ্ঞানচক্ষু ও দেবনেত্র। বাহ্য-বিজ্ঞান কেবল স্থূলদর্শনকে সূক্ষ্মদর্শনে আনিতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নহিলে সেই সূক্ষ্মদর্শনকে সম্যগ্দর্শনে আনিতে পারে না। স্থূলদর্শনে জগতের সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায়, এজন্য মানুষের সুখ-দুঃখ বোধ হয়। এই সুখ-দুঃখ আর কিছুই নহে, সেই অনন্ত নিত্যানন্দের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মাত্র। পরিচ্ছিন্ন

বলিয়া খণ্ডিত সুখ ও সুখের অভাব দুঃখ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে কেন? যেহেতু, অনন্তের জ্ঞান নাই। অনন্তের জ্ঞান হইলে, সেই অনন্ত সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে আপনাতেই সেই অনন্ত সুখ-জ্ঞান উপলব্ধি হইত। কারণ, আপনি ত অনন্ত ছাড়া নহে। আপনাতে অনন্ত সুখ-জ্ঞান হইলে আর সুখ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই সুখ পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে কিসে? বিষয়ভোগে। বিষয়ভোগে লিপ্ত হইলে রিপুগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় সুখ অনবরতই দুঃখ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। এই সুখ-দুঃখের সমত্ব জ্ঞান না জন্মিলে সতত চিত্তপ্রসাদ জন্মে না। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের এবং রিপুগণের সংযম-সাধন দ্বারা বিষয়ামোদ হইতে চিত্তকে চিরদিনের জন্য ফিরাইতে পারিয়াছেন, যাঁহারা মায়ামমতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহারা বিষয়সুখ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগে তাঁহাতেই আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই অনিত্য সুখ-দুঃখের সমত্বজ্ঞান হয়। সেইরূপ সুখ-দুঃখের সমত্বজ্ঞান-সাধন করিবার পন্থাই হিন্দু ধর্ম্ম-সাধনপ্রণালী। তাই হিন্দুধর্ম্মের সাধনাপ্রণালী মানুষকে নিত্য চিত্তপ্রসন্নতায় উপনীত করিয়া তাহাকে আনন্দধামে লইয়া যায়। তাহাই মানবাত্মার মুক্তি। কিসের মুক্তি? পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান এবং পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি বা ভেদদৃষ্টি হইতে মুক্তি। এই মুক্তি সাধিত হইলে আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও দৃষ্টি থাকে না; তখন মানুষ অনন্ত জ্ঞানে ও অনন্ত সুখে উপনীত হয়েন।

হিন্দুধর্ম্মে মায়াবাদ।

মায়ার রূপ।

হিন্দুধর্ম্মের মায়াবাদ না বলিলে ব্রহ্মবাদ সম্পূর্ণ হয় না; তাই মায়াবাদ গৃহীত হইতেছে।

বেদান্তী বলিয়াছেন,—এ সংসার মায়াময়। এই সংসার-লীলা অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। এ কথা বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, অনাদিকালই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সংসার-লীলাও সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রবাহরূপে অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। যে ব্রহ্ম হইতে সমুদায় উৎপন্ন, সেই ব্রহ্মই যখন অনাদিকাল বর্ত্তমান, তখন, সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীবের লীলাও তদ্রূপ বর্ত্তমান। ব্রহ্মের যেমন আদি নাই, তেমনি সেই ব্রহ্ম-বিবর্ত্তিত ঈশ্বরেরও আদি নাই এবং মনুষ্যাদি জীবেরও আদি নাই। সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম যে ঈশ্বর-চৈতন্যে এবং ঈশ্বর যে জীব-চৈতন্যে বিবর্ত্তিত হন, সেই ঈশ্বর এবং জীব-চৈতন্য, নির্গুণ সত্তার পরিণামরূপ সগুণ সত্তায় উপহিত হয়েন। এই সগুণ সত্তা কোথা হইতে আইসে? প্রতি প্রলয়কালে এই বিশ্বসত্তা বীজাকারে আসিয়া যে নির্গুণসত্তায় পরিণত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়, সেই সত্তাই সগুণ হইয়া সৃষ্টিকালে কি জীব, কি ঈশ্বর উভয়েরই শরীরোৎপাদনরূপে পরিণত হয়। সুতরাং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের এই সত্তাংশমাত্র নির্গুণ অবস্থা হইতে সগুণ আকার ধারণ করে। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ত্রিপাদ অমৃত এবং তাঁহার একপাদমাত্র এইরূপ মায়াময় সংসার-লীলায় লিপ্ত রহিয়াছে। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন:—

"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

"এই সমুদায় ভূত তাঁহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।" *

অমৃত কেন? তাহা জন্ম-মরণের অতীত। নিত্যমুক্ত কেন? তাহা ত্রিগুণের অতীত হইয়া নির্গুণ, এবং অপরিণামী হেতু নিত্য-মুক্ত এবং তাহা আনন্দময় স্বর্গধাম।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তেও আছে ঃ—

"ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন। তাঁহার একপাদমাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। মায়াতে আসিয়া অনন্তর স্বয়ংই চেতন ও অচেতন-বহুল বিবিধরূপী জগৎ হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।"—চতুর্থ সূক্ত। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি-কৃত অনুবাদ।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে যে, সৃষ্টিকালে যখন সেই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ জগতের উৎপত্তি হয়, তখন তাঁহার সমুদায় ব্রহ্ম-সত্তাংশ সগুণ আকার ধারণ করে না, তাঁহার অমৃত-পাদ অব্যাহত থাকে। কেবল যাহা চিরকাল সগুণ হইতেছে, সেই অংশমাত্রই সগুণ হয়। যেমন পৃথিবীর অশেষ মৃত্তিকাময় উপাদানের একাংশমাত্র ঘট-শরাবাদিতে পরিণত হইলেও অবশিষ্ট অসীম পৃথিবী সেই মৃত্তিকাময়ই থাকিতে পারে, তদ্রূপ। যদি বল, অনন্তের আবার অংশ কি? শুদ্ধ ব্যাবহারিক অর্থে অনন্ত ব্রহ্মের অংশ-কল্পনা করা হইয়াছে। অজ্ঞানবিমূঢ় জনগণকে বুঝা-ইবার নিমিত্তই বেদ এইরূপ অনন্ত পুরুষের অংশ কল্পনা করিয়াছেন। সে অংশ কিরূপ? যেমন এক এক জন মনুষ্য অনন্ত বিশ্বের এক এক অংশ, অথচ প্রতি ব্যক্তির দেহ অনন্ত বিশ্বে লীন থাকাতে সেই দেহের অনন্তত্ব ঘটিয়াছে, ব্রহ্মের এই মায়ালিপ্ত পাদ

* বেদান্তদর্শন—৪।৪।১৯ শারীরক ভাষ্য এবং গীতা ১০—৪১।৪২ ও দ্রষ্টব্য।

সেইরূপে অনন্ত ব্রহ্মের অংশ। তাহাতে ব্রহ্মের অনন্তত্বের ব্যাঘাত হয় নাই; এবং অবশিষ্ট অমৃতময় ত্রিপাদেরও ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি সেই অমৃত-স্বরূপে এই অনন্ত বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

যে পাদ দ্বারা ব্রহ্ম মায়াতে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই পাদই মায়া-রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টিকালে প্রথমে নির্ম্মল সত্ত্বময় মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। পূর্ব্ব-প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে, এই মহত্তত্ত্বই—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, জগৎকারণ-বীজস্বরূপ, অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েন। শুধু বেদান্তসার এই কথা বলিয়াছেন, এমত নহে, পুরাণও বলিয়াছেন ঃ—

"যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্ব্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩ স্ক, ২৬ অ, ২০।

সত্ত্বগুণযুক্ত, নির্ম্মল, রাগাদিরহিত-বশতঃ শান্ত এবং উপলব্ধি-স্থান চিত্তের (চিৎ-স্বরূপ পুরুষের) নাম বাসুদেব। অধ্যাত্মরূপে সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া তাহা চিত্ত এবং উপাস্য বলিয়া বাসুদেব। সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ।"

তবেই, কি বৈজ্ঞানিক বেদান্ত, কি ভক্তিশাস্ত্র পুরাণ, উভয়ই বলিতেছেন, এই মহত্তত্ত্ব সত্ত্বগুণ-প্রধান; সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া তাহা নির্ম্মল-সত্ত্ব মায়া-উপাদান। তাহাতে রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অভিভূত; অথবা সেই গুণদ্বয় সম্পূর্ণরূপে সত্ত্ব-গুণের অধীন। এই শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল উপাদানকে যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচৈতন্য অনু-প্রাণিত করেন, তাহা সেই উপাদানের নির্ম্মলতা হেতু তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—শুদ্ধসত্ত্ব মায়া-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই ঈশ্বর। মহত্তত্ত্ব কিরূপে প্রতিবিম্বিত?

যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকে জবাকুসুম প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি স্বচ্ছ মহত্তত্ত্বরূপ মায়াতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়েন। এ কথার অর্থ এই যে, সেই মায়াতে ব্রহ্মচৈতন্যের আনন্দ-স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সেই শুদ্ধসত্ত্বময় উপাদান আনন্দে আক্রান্ত হইয়া যায়। এজন্য এই ঈশ্বর-উপাধিকে আনন্দময় কোষ কহে। যাহা শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণময়, তাহা শান্ত ও আনন্দময় না হইবে কেন? তাই ঈশ্বর-চৈতন্য সেই আনন্দময় কোষ-উপহিত হইলে তাঁহাতে সেই সাত্ত্বিক উপাধির শক্তি আরোপ করিয়া পুরাণ সেই মহত্তত্ত্বকে উপাস্য বাসুদেব বলিয়াছেন।

এই শুদ্ধসত্ত্ব মায়া বীজ-স্বরূপ। মায়ার অর্থই বীজ। কিসে বীজ? তাহা জগতের আদিকারণরূপে জগতের বীজ-স্বরূপ। তাহা জগতের আদিকারণ কিরূপে হইল? প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব বীজাকার ধারণ করিয়া এই মহত্তত্ত্বে লীন হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে সেই বিশ্ব বীজাকারে থাকে। সৃষ্টিকালে আবার বিশ্ব সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সম্ভূত হয়। যাহা বিলীন থাকে, তাহাই সম্প্রকাশ হয় মাত্র। কারণের অর্থই তাই। কারণে কার্য্য অব্যক্ত থাকে মাত্র, কার্য্য সেই কারণের ব্যক্তরূপ। সুতরাং মহত্তত্ত্বকে বিশ্বের আদিকারণ বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, বিশ্ব সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইল। কিরূপে ব্যক্ত হইল? পূর্ব্বে প্রলয়কালে যেরূপ বীজাকারে আসিয়াছিল, সেই বীজাকারেই প্রসবিত হইল। এ জন্য, এই বিশ্ব-বীজকেও অন্যরূপ মায়া কহে। তাহা মলিনসত্ত্ব মায়া বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা সম্ভূত হইলে ঈশ্বর-চৈতন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করেন। সুতরাং সেই ঈশ্বর-চৈতন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে এই অবিদ্যারূপ মায়াতে সেই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন। এ জন্য,

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম-চৈতন্যই জীব। এই জীব-চৈতন্য অবিদ্যাতে নিজ দেবাংশ ও আনন্দ প্রতিবিম্বিত করেন। অবিদ্যার মলিন সত্ত্বে সেই আনন্দ সম্যক্ প্রতিভাত হয় না।

এই অবিদ্যা কিরূপ? ঘোর আত্ম-অভিমানে পরিপূর্ণ। এই অভিমান কোথা হইতে আইসে? এই অভিমানের প্রকৃতি অহং-কার-তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বে যে রজোগুণাংশ নিহিত, অবিদ্যা-সংস্পর্শে সেই রজোগুণের প্রাবল্য হওয়াতে তাহা জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছায় পরিণত হয়। এ জন্য ঈশ্বরে জগৎ-সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—ভগবানই এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে কর্ত্তৃত্ব ও ইচ্ছা সেই মায়ার। এই মায়িক প্রকৃতিকেই ইচ্ছাময়ী মহামায়া ভগবৎ-শক্তি বলে। সেই প্রকৃতি-শক্তিতে পুরুষ শক্তিমান্ হইয়া ইচ্ছাময় ভগবান্ বলিয়া উক্ত হন। ভগবান্ এইরূপে ইচ্ছাময় হইলে কি বলিলেন? "অহং বহু স্যাম্।" আমি বহু হইব। শ্রুতিবাক্য এই:—

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"

তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব বা জন্মিব।"

সুতরাং সৃষ্টিকালে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন—আমি বহু হইব। এই অস্মিতা বা আমিত্ব-জ্ঞানই অহঙ্কার। এই অহঙ্কার অবি-দ্যায় প্রতিবিম্বিত হইলে তাহা সেই অবিদ্যাকে অভিমানাচ্ছন্ন করিয়াছিল। অবিদ্যা যে অভিমান-পূর্ণ, তাহাই অহঙ্কারের বৈকারিক রূপ। সেই অবিদ্যাপূর্ণ অহঙ্কার অভিমান-রূপী। কিসের অভিমান? জীবের মায়াময় কর্ত্তৃত্বাভিমান। এই কর্ত্তৃত্বা-ভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া জীব নিজ দর্পে গগন ফাটাইয়া ফেলেন।

অহঙ্কারের যে প্রাকৃতিক রূপ, সেই রূপে অহঙ্কার ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্বগুণান্বিত অহঙ্কারকে বৈকারিক, রজোগুণের তেজঃপূর্ণ অহঙ্কারকে তৈজস এবং তমোগুণান্বিত অহঙ্কারকে তামসিক অহঙ্কার বলে। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে অবিদ্যায় অন্তঃকরণের আবির্ভাব হয়, তৈজস অহঙ্কার হইতে বাহ্য করণ বা ইন্দ্রিয়াদির (কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়) উদ্ভব এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূলভূতের কারণ-শক্তি-স্বরূপ পঞ্চ মহাভূতের বিকাশ হয়। অবিদ্যা এইরূপে অহঙ্কারপূর্ণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলে অনন্ত দেশে ব্রহ্মাণ্ড-কমলের সৃষ্টি হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত কূটস্থ চৈতন্য ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া বিশ্ব গড়িতে থাকেন। তৎপরেই স্থূল বিশ্বের বিকাশ হয়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে সমস্তই শক্তিময় কার্য্য। তাই, এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার পর্য্যন্ত যত প্রকার বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী শক্তির আবির্ভাব হয়, তৎ-সমুদায়কে সাংখ্যকার প্রকৃতি-শক্তি বলিয়াছেন। এই প্রকৃতি-শক্তি যে বিশ্বকে বিকাশ করে, তাহাই বিকৃতি নামে অভিহিত। তাহা অবিদ্যারূপ মায়ার অনন্ত পরিচ্ছিন্নরূপ। ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে ঈশ্বরের মায়িক প্রকৃতি-শক্তি অবিদ্যাকে অনন্ত আকারে আকারিত করিয়া এই অনন্ত জীব-পরিপূর্ণ বিশ্বকে বিকাশিত করেন। এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে সেই প্রকৃতির যে শক্তি-সমূহ কার্য্য করে, তাহারাই অবিশেষাখ্য। সেই অবিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষ জাতির সমুদ্ভব হয়। এই বিশেষ বিশেষ জাতি হইতে বিশেষ বিশেষ স্থূল জীব-সমূহের সৃষ্টি হয়।

কোন্ শক্তি দ্বারা অবিদ্যা অনন্ত আকারে পরিচ্ছিন্ন হয়েন? সে শক্তি মহাভূত-পঞ্চ। এ জন্য এই পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ দেব-শক্তি বা দেবতা। এই পঞ্চ দেবতাই ঈশ্বরের সাক্ষি-স্বরূপ। এই

পঞ্চ দেবতায় শক্তিমান্ হইয়া ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্। এই পঞ্চ মহাভূত নিত্য শক্তিরূপে বিদ্যমান বলিয়া পঞ্চ মহাভূত নামে উক্ত হইয়াছেন। কারণ, ভূত শব্দের অর্থই তাই।

"পূর্ব্বমেব সৎ ভূতম্ প্রথমদৃষ্টত্বাৎ।"—নিরুক্ত-টীকা।

"যাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান, যাহা কৃত বা উৎপন্ন নহে, সুতরাং নিত্য, তাহাই ভূত।"

এই পঞ্চ মহাভূত হইতে স্থূলভূত-পঞ্চ এবং সমস্ত জীবরূপ ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য, তাহাদিগকে মহাভূত বলে।

এই মহাভূত-পঞ্চ অবিদ্যা-সত্তানিহিত মহাশক্তি-পঞ্চ। এই শক্তি-পঞ্চ কি কি? আকাশ অনন্ত দেশ (Space) ও অনন্তকাল (Time) স্বরূপ বিকাশ বা বিস্তার-করণ-শক্তি; বায়ু, সেই দেশ ও কালের গতিশক্তি; অগ্নি, দেশ ও কালের বিরাগ বা বিভিন্ন-করণ শক্তি; জল বা রস তাহাদের রাগ-রসময় সংযোগ-করণ-শক্তি এবং পৃথিবী—ঐ চতুর্ব্বিধ শক্তির সামঞ্জস্য-সাধক গুরুত্বের বিধাতৃ-শক্তিরূপে উহাদের রূপ বা মূর্ত্তি-গঠন শক্তি। এই পঞ্চ শক্তি ঈশ্বর-প্রাণিত হইয়া, ইন্দ্রাদি পঞ্চ দেবতারূপে অভিহিত হয়েন। এই পঞ্চ শক্তিময় মহাভূতেরই স্থূলরূপ এই দৃশ্যমান আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী।

তদ্রূপ, তৈজস অহঙ্কার হইতে যে সকল করণ-শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহারা যুগ্মরূপী অশ্বিনীকুমার-দ্বয়। তাহা হইতে ইন্দ্রিয়-গণ চক্ষুরাদিক্রমে যুগ্মরূপে দেখা দেয়।

এ জন্য পুরাণ এই অহঙ্কারের কার্য্যরূপ মহাভূত-নিচয়কে মহা সঙ্কর্ষণাখ্য পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই পঞ্চশক্তির সমষ্টি-স্বরূপ যাহা, তাহাই সেই শক্তি-পঞ্চের মিলিত রূপী সঙ্কর্ষণাখ্য পুরুষ। সেই পুরুষ কিরূপ?

"সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্যমনন্তং প্রচক্ষতে।

সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্॥—শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২৬।২৪।

"যিনি সঙ্কর্ষণাখ্য সহস্রশীর্ষ পুরুষ, সাক্ষাৎ অনন্ত-দেব, তিনি এই অহঙ্কারের কার্য্য—ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনঃ এই সকলের স্বরূপ।"

ভূতই মহাভূত-পঞ্চ—যাহা তামসিক অহঙ্কারের কার্য্য। ইন্দ্রিয়ই করণ-শক্তি—যাহা তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য এবং মনঃ সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য। অনন্তদেব এইরূপ সঙ্কর্ষণ-শক্তি।

আমরা দেখিলাম, মায়া দ্বিবিধ—শুদ্ধসত্ত্ব মহত্তত্ত্ব—যাহা এই জগতের আদি-কারণ ও বাসস্থানীয় বাসুদেব এবং সেই মহত্তত্ত্ব-সমুৎপন্ন অহঙ্কারপূর্ণ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত মলিনসত্ত্ব মায়া—যাহা সেই অহঙ্কার-সমুৎপন্ন পঞ্চ সূক্ষ্মশক্তি-মিলিত সংকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে সহস্র শিরে: বিভক্ত হইয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত অনন্ত জীবের আবাস-স্থান-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড। এই ত্রিগুণময়ী মলিন-সত্ত্ব জীব-মায়া সৃষ্টি ও স্থিতিকালে ক্রিয়াশীল সত্তা এবং প্রলয়-কালে নির্গুণ সত্তা-রূপে ব্রহ্মাংশ। এ জন্য যে সাংখ্যশাস্ত্রে বস্তুতত্ত্ব সংখ্যাত হইয়াছে, সেই সাংখ্য-বিদ্যায় তাহা বস্তুরূপে গণ্য হইয়াছে। সাংখ্যে এই দ্বিবিধ মায়া প্রকৃতি এবং বিকৃতি বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। যখন প্রলয়-কাল উপস্থিত হয়, তখন সকল বস্তুই বীজাবস্থায় পরিণত হয় বলিয়া এই মায়াসত্ত্ব যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাতেই তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া এক মূল প্রকৃতি-সত্তায় পরিণত হয়। যে সত্তা যে অবস্থায় থাকে, সে সত্তা সেই অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয়তা লাভ করিয়া জাতীয় আকারে আসিয়া ব্রহ্ম-সত্তায় মিশিয়া যায়। এ জন্য, সাংখ্যমতে এই মূল প্রকৃতি সৎ। কিন্তু বেদান্ত, ব্রহ্মের পরিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় সত্তাকে প্রভিন্ন করিয়া বুঝাইবার জন্য সেই মূল

নির্গুণ প্রকৃতি-সত্তাকে অসৎ বলিয়াছেন। প্রলয়-কালে অসৎ-রূপে তাহা ব্রহ্মে লীন থাকে, পুনঃ-সৃষ্টিকালে আবার সৎ-রূপে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং, যাহা বেদান্তবাদীর অসৎ মায়া, তাহা সাংখ্যবাদীর সৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি। এই ব্রহ্মসত্তাংশ মায়া ক্রিয়াশীলতা-বশতঃ যত প্রকার প্রাকৃতিক এবং বৈকারিক রূপ ধারণ করুক না কেন, তথাপি তাহা প্রকৃত বস্তু। সাংখ্য-বিদ্যায় এই প্রকৃত বস্তুতত্ত্বই নির্ণীত হইয়াছে। মায়ার সেই বস্তু-সত্তা চতুর্বিংশতি জাতীয়-আকারে আকারিত হয়। তাই, এই চতুর্বিংশতি জাতীয় তত্ত্বকে সাংখ্যবিদ্যা প্রকৃত বস্তুরূপে গণনা করিয়া দিয়াছেন। এই চতুর্বিংশতি প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্বের সম্যক্ পরিজ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ সাধন করাই সাংখ্যযোগ।

সাংখ্য-বিদ্যায় তবে এই দৃশ্য জগতে চতুর্বিংশতি পদার্থ ভিন্ন আর পদার্থ নাই। এই চব্বিশ প্রকার পদার্থের সংযোগ-বিয়োগে এবং মিলন-মিশ্রণে দৃশ্য জগতে অগণ্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। সাংখ্যকার এই দৃশ্য জগৎকে প্রকৃতি এবং বিকৃতি-ভেদে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। নির্গুণা মূল-প্রকৃতি হইতে যে অপর সপ্ত সগুণ, ক্রিয়াশীল প্রকৃতির ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হইয়াছে, সেই প্রকৃতি-সপ্ত সূক্ষ্ম শক্তিময় দৃশ্য জগৎ এবং সেই সূক্ষ্ম দৃশ্য জগৎ হইতে এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক দৃশ্য জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দৃশ্য জগতের অন্তরে প্রাণস্বরূপ দ্রষ্টাপুরুষ রহিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিয়া তবে এই দৃশ্য জগতে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব সংখ্যাত হয়। যে নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম এই দৃশ্য জগতের অতীত, যাঁহার বিবর্ত্তমাত্র জগৎ-অনুপ্রবিষ্ট দ্রষ্টা-পুরুষ, সেই পরব্রহ্মকে ধরিয়া বৈদান্তিকেরা ছাব্বিশ তত্ত্ব গণনা করিয়া থাকেন। বৈদান্তিকেরা বেদবাক্য-

অনুসারে সাংখ্যকারের চব্বিশ তত্ত্বকেও দুই ভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু সে ভাগদ্বয় সূক্ষ্ম ও স্থূল দৃশ্য ধরিয়া নহে, তাহা অহঙ্কার ও নিরহঙ্কার ধরিয়া বিভক্ত হইয়াছে। এই দুই ভাগই মায়াবাদ বলিয়া উক্ত। একভাগে শুদ্ধসত্ত্ব মায়া, অপরভাগে মলিন-সত্ত্ব মায়া বা অবিদ্যা। মায়া নিরহঙ্কৃত, অবিদ্যা অহঙ্কৃত। অহঙ্কৃত হইয়া তাহা মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি ও বিকৃতিবাদ এই দ্বিবিধ মায়ারই অন্তর্গত। তাই, বেদান্ত বলিয়াছেন ঃ—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।"—
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪র্থ অধ্যায়

যে সগুণা প্রকৃতি বা মায়া এই দৃশ্য জগৎ-ব্যাপ্ত, তদ্দ্বারাই জগতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। যে মূল প্রকৃতির গর্ভ হইতে এই দৃশ্য জগৎ সমুৎপন্ন, ব্রহ্মই তাহার বীজস্বরূপ; সেই ব্রহ্মবীজ হইতে এই দুই মায়াময় গর্ভের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বীজ ও গর্ভজাত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাই, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"—১৪।৪।

"হে কৌন্তেয়। দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হয়, মহত্তত্ত্বরূপ মহদ্ ব্রহ্মই তত্তাবতের মাতৃস্থানীয় এবং আমিই তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।"

মহত্তত্ত্ব মায়ারূপে যেন মাতৃস্থানীয় হইলেন, কিন্তু বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ কিসে পিতৃস্থানীয়? তিনি অন্তর্যামী হইয়া

জীবে অবস্থানপূর্ব্বক জীবাত্মা-রূপে সর্ব্বজীবের প্রাণ ও বীজপ্রদ পিতা হইয়া রহিয়াছেন।

বাস্তবিক, জীবের যে রাগাদি-হেতু কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই রাগাদি-বিরহিত হওয়াতে দ্রষ্টা-পুরুষের কোন কর্ম্ম নাই। তিনি চিৎ-স্বরূপ জ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মা। কর্ম্ম-সমস্ত ত্রিগুণা প্রকৃতির। তাই, পূর্ণকাম মহাবিষ্ণুর ও মহেশ্বরের যুদ্ধাদি কোন কর্ম্ম নাই, তাঁহাদের জগৎ-অনুপ্রবিষ্ট এবং তজ্জন্য অবতীর্ণ (যাহা অনুপ্রবিষ্ট, তাহাই অবতীর্ণ) শক্তি সমুদায়ই কর্ম্মী। সেই অবতীর্ণ শক্তিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, রুদ্রাদির অবতার, দুর্গাদি ভগবৎ-শক্তি এবং দশদিকস্থ দশমহাবিদ্যা। এই সমস্ত অবতীর্ণ শক্তিই মহামায়ার মহাশক্তি। কারণ, মায়াই সমস্ত শক্তির আধার। পুরাণ ও তন্ত্র মহামায়ার মহাশক্তিকে এই প্রকার বিরাটাকারে দেবদেবীরূপে দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন কি জন্য? সেই শক্তির শক্তিমান্‌কে আরাধ্য করাইবার জন্য। স্থূলদর্শী নিম্নাধিকারী ভক্তজনগণের চক্ষে শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—পুরুষ প্রকৃতি অভিন্নরূপে উপাস্য ও সম্পূজ্য। তাই, হিন্দুভক্ত সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তাই, ভক্তিশাস্ত্র পুরাণে ও তন্ত্রে মহাশক্তিবাদের বিশাল সৃষ্টি।

যে ঈশ্বর-চৈতন্য ভগবান্ রাগাদি-রহিত ও পূর্ণকাম, কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদে তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থূলদর্শী ভক্তজনগণের চক্ষে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান-যোগ তত আদরণীয় হইতে পারে না বলিয়া, পাছে তাহাদের ভক্তির ব্যাঘাত জন্মে, তাই ভক্তিবাদে ভগবানের নৈষ্কর্ম্ম্য নাই। ভক্তিবাদে ভগবানই সর্ব্বেসর্ব্বা, জগতের নিয়ন্তা, স্রষ্টা, প্রলয়কর্ত্তা

প্রভৃতি সকলই। তাহা না হইলে তিনি সর্ব্বসাধারণের আরাধ্য হইবেন কেন? তাই, পদ্মপুরাণাদিতে মায়াবাদ বাহ্য আস্তিক বাদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকবাদ বলিয়াই নিন্দনীয় এবং অগ্রাহ্য-হইয়াছে। তবে, শাস্ত্রে মায়াবাদ কেন? পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি :—

"সর্ব্বস্ব জগতোঽপ্যত্র নাশনার্থ-কলৌ যুগে।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্॥" ইত্যাদি।

"কলিযুগে নিখিল জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি জগতের সংহারের আশায় বেদের মায়াবাদ প্রকাশ করিয়াছি।"

এইরূপে পদ্মপুরাণ বেদবাক্যও বজায় রাখিয়াছেন।

বাস্তবিক, ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব-হেতু শক্তিবাদই প্রশস্ত হইয়াছে। মায়াবাদ উচ্চাধিকারী জনগণের নিমিত্ত। উচ্চাধিকারে প্রবিষ্ট সেই উচ্চাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগের নিষ্কামধর্ম্ম ও জ্ঞান-যোগের সমদর্শিতা উপযোগী হয়। নচেৎ, যে ভক্ত বলিয়াছেন, আমি চিনি হ'তে চাহি না, চিনি খেতে চাই, হিন্দুধর্ম্মীয় ভক্তিবাদ তাহাকে চিনি খাইতেই প্রবৃত্তি দিয়াছেন। চিনি খাইতে খাইতে যখন ভক্ত দেখিবেন, চিনিতে আর মিষ্টতা নাই, নিজে চিনি না হইলে নিত্য শান্তি লব্ধ হয় না, তখন জ্ঞানযোগের প্রয়োজন জানিয়া সেই চিনির অভিলাষী ভক্ত জ্ঞানযোগ গ্রহণ করিবেন। এই সর্ব্বশান্তিময় ব্রহ্মানন্দ-কৈবল্য লাভ করিবার সোপানস্বরূপ তাই হিন্দুধর্ম্মে সামীপ্য-মুক্তিপন্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ম্মযোগ যে নৈষ্কর্ম্ম্য-সাধক, সেই নিষ্কাম-ধর্ম্ম জীবকে সন্ন্যাসে উপনীত করিলে, সেই সন্ন্যাসে নিস্ত্রৈগুণ্য-সাধন দ্বারা জীবের চরম গতিস্বরূপ নিত্যানন্দধাম লব্ধ হয়।

মায়ার কার্য্য।

বেদান্তী এই মায়াকে অসৎ বলিয়াছেন কেন? শৈবদর্শনে মায়া-শব্দের এইরূপ অর্থ ধৃত হইয়াছে:—

"মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ
সৃষ্টৌ ব্যক্তিং যাতীতি মায়া।"—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ।

"প্রলয়ে শক্ত্যাত্মা দ্বারা সমুদায় জগৎ ইহাতে মিশ্রিত বা উপসংহৃত হয় এবং সৃষ্টিকালে আবার সমস্তই ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে। এই অর্থে মায়া—মা শব্দে উপসংহরণ এবং য়া শব্দে ব্যক্তীকরণ।"

সুতরাং মহত্তত্ত্ব যে মায়া, তাহা অবিদ্যার ব্যক্তীকরণ এবং উপসংহরণ শক্তিমাত্র। সেই সগুণা শক্তিরূপে তাহা আবার নিজে নির্গুণ মূলপ্রকৃতির বিকার। এ জন্য তাহা নির্গুণের পরিণাম। যাহা পরিণামী, তাহাই অসৎ। অবিদ্যা-সমুৎপন্ন জীব-জগতের নিয়তই অবস্থান্তর ঘটিতেছে। অবিদ্যার পরিণামের সীমা ও শেষ নাই। জগৎ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অবস্থাভেদ ও পরিণাম-সমস্তই অনিত্য—নিত্য বস্তুর অনিত্য অবস্থা। যাহা অবিদ্য-স্বভাব, কখন একরূপে নাই, সততই অবিদ্যমান, তাহাই অসৎ অবিদ্যা। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই নির্ব্বিকার ও সৎ। সেই নির্ব্বিকার সৎ বস্তু হইতে প্রভেদ করিবার নিমিত্ত পরিণামী অবিদ্যা ও মায়াকে অসৎ বলা হইয়াছে।

ত্রিগুণময়ী মায়া নিজ প্রকৃতি-বশতঃ অসৎ। এই প্রকৃতি দ্বিবিধ—মায়ার আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তি কি?

অহঙ্কার-পূর্ণ অবিদ্যা জীবে সততই কামনার উৎপত্তি করিতেছে।

এই কামনা হইতে জীবের কামনাময় সূক্ষ্ম-শরীরের সৃষ্টি। এই সূক্ষ্ম-শরীরই জীবের প্রকৃত দেহ। এই দেহভূত প্রাণই দেহী ও জীবাত্মা। জীবের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ সেই কামনাময় দেহেরই ভোগ-শরীর মাত্র। এই কামনাময় দেহই জীবাত্মার পিঞ্জর-স্বরূপ। সেই কামনাময় ঘোর লোভী কংসের কারাগারে বসুদেব-রূপ সাত্ত্বিক বিবেকজ্ঞান, দেবশক্তি-ভক্তিমতী দেবকীর সহিত বন্ধনযুক্ত হইয়া বাস করেন। তাই গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"ধূমদ্বারা যেমন বহ্নি, মলিনতা দ্বারা যেমন দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা যেমন গর্ভ আবৃত থাকে, কামদ্বারা সেইরূপ বিবেকজ্ঞান আবৃত থাকে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের নিত্য বৈরী অতি দুষ্পূরণীয় ও অনলতুল্য সন্তাপকর কামনা দ্বারাই জ্ঞানীর জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে।"—৩—৩৮।৩৯।

কামনাময় মায়ার আবরণ-শক্তির প্রভাব এইরূপ। এই আবরণ, কামনার ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত হয়। তজ্জন্য জীবের সাত্ত্বিকাংশ মলিন হইয়া যায়। তাই অবিদ্যা, সত্ত্বগুণকে মালিন্যময় করে। সেই সত্ত্বরূপী বসুদেব, মালিন্যময় কামনাদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই কামনা অতি চঞ্চলা, তাহার স্থিরতা কিছুই নাই। মায়া এই কামনাযুক্ত হইয়া সততই অনিত্য ভাবাপন্ন হইয়া আছে। এই অসৎ কামনাময়ী অবিদ্যাধীন হইয়া জীব কর্ত্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া থাকেন। নিজ কর্ত্তৃত্বে পূর্ণ হইয়া তিনি আর ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। যেখানে জীব কর্ত্তা, সেখানে ঈশ্বর কে? এই কর্ত্তৃত্বাভিমান জীবের অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তিনি জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। ইহাই মায়ার ঘোর আবরণ-শক্তি।

এই আবরণ-শক্তিহেতু মায়ার যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত হয়, তাহা হইতেই মায়ার বিক্ষেপশক্তির উৎপত্তি। জীবের অভিমান যে মিথ্যাদৃষ্টির সঞ্চার করে, সেই দৃষ্টি-হেতু জগতের সমস্ত মায়িক রূপ ও ব্যবহার সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। সেই রূপ-সকল কি বাস্তবিক সত্য না জীবের কল্পনা মাত্র? বেদান্তী বলেন, জীবের মিথ্যাদৃষ্টি-মায়া জগতের যে রূপ-সকলকে বিক্ষেপ করে, তাহাই মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির পরিচায়ক; নহিলে জগৎ অনন্ত ব্রহ্মময়।

জীব-দৃষ্টির সহিত ব্রহ্ম-পদার্থের এক বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ-জনিত জগতের এই বিরাট রূপের কল্পনা। মানুষের চক্ষুর সহিত জগতের সম্বন্ধ এরূপ যে, তাহা বিশেষ বিশেষ রূপ-বিশিষ্ট বোধ হয়। পেচকের চক্ষে পেচকী যেমন সুন্দরী, নরের কাছে নারী তেমনি সুন্দরী। অতএব, রূপ কেবল দৃষ্টির বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ-নিবন্ধন সঞ্জাত হয়। সুতরাং জীবের মানস-দৃষ্টি এবং স্থূল-দৃষ্টি বশতঃ জগতের সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ। মায়ার অর্থই রূপ-পরিমাণ। এ জগৎ তবে ব্রহ্মের স্পষ্ট রূপ নহে, তাহা জীবের কল্পিত রূপ। এই কল্পনাই মায়া ও মিথ্যা-দৃষ্টি। পঞ্চদশীকার বলেন—এই মায়া কেবল ব্যাবহারিক জ্ঞানে বাস্তবিক, নহিলে ইহা পরমার্থজ্ঞানে অতি তুচ্ছ এবং যুক্তিতে অতি অনির্ব্বচনীয়। শঙ্কর বলেন :—

"যেমন প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন সমুদায়কে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে, ব্রহ্মাত্ম-বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লৌকিক ব্যবহার-সকলকে তদ্রূপ জানিবে।"—বেদান্ত দর্শন ২।১।১৪।—শারীরক ভাষ্য।

বাস্তবিক, লোক যখন নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখে, তখন সে কখন সেই স্বপ্নকে মিথ্যা জ্ঞান করে না। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তবে সেই স্বপ্নের অলীকত্ব প্রতিপাদিত হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন,

স্বপ্নাবস্থায়ও তেমনি সমস্তই ঠিক ঠিক ঘটিয়া যায়; তেমনি মারামারি, কাটাকাটি, ভালবাসাবাসি, প্রেম, দ্বেষ ও ভয়াদির উৎপত্তি, তেমনি মিলন, বিরহ, স্ত্রী-সম্ভোগ, রাজভোগ, আহারাদি, জলে অবগাহন, সর্প-দংশন, আর কি না ঘটে? এমত কি, সেই সকল কর্ম্মের ফলাদি পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। স্ত্রী-সম্ভোগের প্রকৃত ফলাফল কি ঘটে না? স্বপ্ন-দর্শন যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার জ্ঞান মিথ্যা নহে। নয় বলিয়া সে জ্ঞান নিদ্রা-ভঙ্গেও থাকে। তবে যদি বল, সেই স্বপ্নাবস্থা মিথ্যা, কি জাগ্রৎ অবস্থা মিথ্যা? সে কথা স্বতন্ত্র।

লৌকিক জ্ঞান সত্য, না পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সত্য? লৌকিক জ্ঞান যে সত্য নহে, বাহ্য বিজ্ঞান তাহা অনেক দূর সপ্রমাণ করে। লৌকিক জ্ঞানে বোধ হয়, মেঘমালা সূর্য্যকে ঢাকিয়াছে। বাস্তবিক কি মেঘমালা সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে? রামধনু কি প্রকৃত-পক্ষে ধনু? সূর্য্য-গ্রহণে কি রাহুগ্রাস সত্য? না, সেই রাহু চন্দ্রের প্রতিবিম্ব মাত্র? সূর্য্যের দৈনিক গতি সত্য, না পৃথিবীর দৈনিক গতি সত্য? লৌকিক স্থূল দর্শন এইরূপ।

বাহ্য বিজ্ঞানে লৌকিক দর্শনের অলীকত্ব অনেক দূর সপ্রমাণ হইলেও তদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় না। সেই অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের যোগ-প্রকরণ দ্বারা যে সম্যক্ দর্শন জন্মে, সেই দৃষ্টি-প্রভাবে মায়ার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয়। যোগ কি? কর্ম্মেতে যে কৌশল তাহাই যোগ। গীতা সেই কথাই বলিয়াছেন:—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"—২।৫০।

বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রসাদে ইহ জন্মেই সুকৃত-দুষ্কৃত পরিত্যাগ করেন। অতএব, তুমি ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্মযোগ কর। কর্ম্মেতে যে কৌশল, তাহাই যোগ। কামনাজাত কর্ম্মের বন্ধকত্ব থাকিলেও যেরূপ কৌশলে কর্ম্ম করিলে তাহার বন্ধকত্ব দূর হয়, অপিচ তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, কর্ম্মকরণের সেইরূপ কার্য্যকেই যোগ কহা যায়।"

হিন্দুধর্ম্মের সাধনা-পথের এই কৌশল; তাহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কর্ম্ম-প্রকরণ। এই প্রকরণ গীতা অতি বিশদরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। এই প্রকরণ দ্বারা একান্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে ভক্ত যে কৃষ্ণশক্তি লাভ করেন, তদ্দ্বারা মায়ারূপ কারাগার হইতে দেবভক্তি দেবকীর সহিত শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-রূপ বিবেক-জ্ঞানকে সমুদ্ধার করিয়া জীবাত্মাকে অনায়াসে মুক্ত করিতে পারেন। নহিলে তাহাকে কামনা-সম্ভূত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বহু বহু জন্ম-জন্মান্তর এই ঘোর দুঃখময় সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। কিছুতেই আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ইহাকেই কামনাজাত পাপপুণ্য-কর্ম্মের বন্ধকত্ব বলে। গীতা বলিতেছেন :—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—৭।১৩।১৪

"এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ ভাবে সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমি যে এই ত্রিবিধ ভাবে অস্পৃষ্ট এবং ইহাদের নিয়ন্তা-হেতু নির্ব্বিকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। আমার এই মায়া (ঈশ্বর-শক্তি) অলৌকিকী, গুণময়ী (সত্ত্বাদি গুণ-বিকারাত্মিকা) এবং দুস্তরা। কিন্তু যাহারা একান্ত ভক্তি দ্বারা আমারই শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই আমার এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।"

এই মায়া কিরূপে অতিক্রম করা যায়? জীবের কামনা-সম্ভূত সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ-সাধন করাই মায়া কাটাইবার প্রধান উপায়। কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে শরীরের ক্ষয় নাই। কর্ম্মফলে অভিলাষী না হইয়া তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেই কামনা পরিত্যক্ত হয়। শুদ্ধ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্মফলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। প্রবৃত্তিকে এইরূপ নিবৃত্তি-পথে আনিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা করিতে পারিলে তবে কামনার লয়-সাধন করা যায়। তবে কামনাময় শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই কামনাময় শরীরের লয়-সাধন করিয়াও যদি অহঙ্কার (আমিত্ব জ্ঞান) কিয়ৎ পরিমাণেও থাকে, তাহাও ঈশ্বরার্পিত চিত্তে সংহার করিতে হইবে। অহঙ্কার তিরোহিত হইলেই ঈশ্বরের সারূপ্য লব্ধ হয়। ঈশ্বরের সারূপ্য লব্ধ হইলে তৎ-উপাধি-স্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র থাকে। এই সাত্ত্বিক দেহের লয়-সাধনার্থ নিস্ত্রৈগুণ্যের যোগ-সাধনা চাই। নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন।



হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি যেরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় অনেকাংশে প্রতীত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ একটি বিশিষ্ট পন্থা প্রবর্ত্তিত আছে। হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষা-শব্দের অর্থ শাস্ত্র-পাঠ মাত্র নহে; সেই শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে কর্ম্ম না করিলে লোকে ধর্ম্মে শিক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী মানুষের সর্ব্ববিধ কর্ম্মকেই নিয়মিত করিতে চাহে। মানুষ নিজ স্বভাব-গুণে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করুক না কেন, সে সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মানুবর্ত্তী করিয়া আনাই কর্ম্মযোগ ও ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী। সুতরাং কি বৈষয়িক, কি সাংসারিক, কি সামাজিক, কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক—মানুষের সর্ব্ববিধ কর্ম্মই ধর্ম্ম-শিক্ষা ও কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। যত দিন প্রবৃত্তি প্রবলা, ততদিন কর্ম্ম করিতেই হইবে; কিন্তু সেই কর্ম্ম-সমস্ত কিরূপ কৌশলে করিলে ধর্ম্মানুবর্ত্তী হয়, হিন্দু কর্ম্মযোগ ও ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী তাহাই শিক্ষা দেয়। কারণ, তাহা ধর্ম্মের অধিকারভুক্ত। কর্ম্মকে ধর্ম্ম-দ্বারা নিয়মিত করিয়া আনিতে পারিলেই অধর্ম্মের হ্রাস হইতে থাকে। হিন্দুধর্ম্মে পাপ-নিবারণ করিবার এই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। প্রবৃত্তি ও স্বভাবকে ধর্ম্মানুরত করিতে পারিলে আর লোকের পাপে মতি হইবে কেন? তাই গীতা বলিয়াছেন:—

"যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥—৭।২৮।

"পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হয়, তাঁহারাই শীতোষ্ণ, সুখ-

দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-নিমিত্ত মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন এবং দৃঢ়-ব্রত হইয়া আমার (ঈশ্বরের) ভজনা করেন।”

এইরূপ পুণ্যকর্ম্মে অনুরক্তি মানুষের একদিনে হয় না, তাহা বহু দিনের অভ্যাসের ফল। অভ্যাস-জাত এইরূপ তপস্যাকেই গীতা অভ্যাস-যোগ বলিয়াছেন। পাপাচারে এবং পাপাসক্তিতে যতবার মন ধাবিত হইবে, ততবারই তাহাকে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ফিরাইয়া আনিয়া সেই আসক্তিকে ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিয়োজিত করাই ধর্ম্মশিক্ষা ও অভ্যাস-যোগ। তাই প্রবৃত্তি ও কামনার উপর সনাতন ধর্ম্মের এত আধিপত্য ও দৃষ্টি। কিসে মানুষের মন, বুদ্ধি ও কামনা ধর্ম্ম-প্রমুখ ও ঈশ্বর-পরায়ণ হয়, তজ্জন্যই সনাতন ধর্ম্মের সমস্ত সাধনা-প্রণালী নিয়োজিত আছে। সেই সাধনা-প্রণালী সংসার-ধর্ম্মে, সমাজ-ধর্ম্মে ও হিন্দুর সর্ব্ব কর্ম্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে; বিদ্যমান থাকিয়া অজানত-ভাবে ও আস্তে আস্তে মানুষের প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মমুখ করিয়া আনে। প্রবৃত্তি ও কামনাকে এইরূপে নিয়মিত করিয়া আনাই হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী। অভ্যাস-যোগ সেই শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান সহায়। এই অভ্যাস-যোগের প্রভাবে লোকে প্রবৃত্তির ও রিপুগণের সংযম-সাধন করিয়া ক্রমশঃ ইহলোকের ক্ষণস্থায়ী বিষয়-সুখ হইতে পারমার্থিক চির শান্তি-সম্ভোগে উপনীত হন। সুতরাং লোকের সুখাংশ বর্দ্ধিত করাই হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা-প্রণালী পশুতুল্য মানবকে মানুষ গড়িতে চাহে; সেই পশু, মানুষ হইলে তাহাকে দেবত্ব দিতে চাহে, দেবতাকে ঈশ্বর করে এবং ঈশ্বরকে অমৃতময় ব্রহ্মপদে আনে। কারণ, সেই ব্রহ্মপদেই অনন্ত সুখ ও শান্তি বিরাজিত।

হিন্দুসমাজে যেমন জ্ঞানশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ তেমনি স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রণালী আছে। * জ্ঞান-শিক্ষার্থ যেমন প্রথমে বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন, ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ তেমনি প্রথমে ধর্ম্মজ্ঞানের বর্ণপরিচয় আবশ্যক। "দেবসুন্দরী"তে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সেই বর্ণপরিচয় দেবদেবী-পূজার ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রবৃত্তি-পথের নানা ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা প্রথমে আরব্ধ করা হয়। আরব্ধ করাইবার নিমিত্ত হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ স্বতন্ত্র গুরুগণ নির্দ্দিষ্ট আছেন। কারণ, গুরু ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে এক পদ অগ্রসর হইবার যো নাই। যেমন জ্ঞান-শিক্ষার্থ প্রথমে পাঠশালায় হাতে খড়ী হয়, তার পর সামান্য গুরুর নিকট পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মশিক্ষার্থ প্রথমে কৌলিক গুরু-পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতির আরম্ভ করিতে হয়। এই পূজা-পদ্ধতি এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের শিক্ষা এই যে, কর্ম্মফল-সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ কর। জ্ঞান-শিক্ষায় বালকেরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিলে যেমন উত্তরোত্তর ভাল ভাল শিক্ষকের ও পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়, হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রণালীতেও তদ্রূপ। পাঠশালার গুরু-মহাশয় যেমন বিশিষ্টরূপে পণ্ডিত না হইলেও চলে, তেমনি কুল-গুরু-পুরোহিতগণ বিশিষ্টরূপে পণ্ডিত না হইলেও চলিয়া যায়।

* প্রাচীন হিন্দুসমাজে যখন আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইত, তখনকার কালে সেই আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন কেমন হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী ছিল, তাহা "সমাজ-তত্ত্বে" কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক কালে সংসার-আশ্রমে কিরূপ ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, এ প্রস্তাবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেওয়া যাইতেছে। "সমাজ-তত্ত্বে" এবং "কাব্য-চিন্তা"য়ও এই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মানুষ্ঠানের হাতে খড়ী দেন মাত্র। তজ্জন্য যতদূর পাণ্ডিত্যের বা কার্য্য-দক্ষতার প্রয়োজন, ততদূর থাকিলেই যথেষ্ট হইল। তবে কুলগুরু-পুরোহিতগণ যদি অধিকতর পণ্ডিত বা কার্য্যকুশল হয়েন, তবে ত আরও ভাল। পূর্ব্বকালে রাজগুরু-পুরোহিতগণ অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সামান্য লোকের কুলগুরু-পুরোহিতগণ ততদূর ক্ষমতাশীল ও উচ্চাধিকারী ছিলেন না। এক্ষণকার হিন্দুসমাজেও তদনুরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি গাণপত্য, কি সৌর, কি তান্ত্রিক—হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ নিজ নিজ ধর্ম্মসাধনাপথে গুরুর উপদেশানুসারে অনুষ্ঠানাদি করিয়া ধর্ম্মাচার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে থাকেন। তদ্রূপে পরিশুদ্ধ হইতে না পারিলে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উচ্চাদর্শে উঠা যায় না। সেইরূপ উচ্চাদর্শে উত্তোলিত করিয়া আনিবার নিমিত্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পথ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেই উচ্চাদর্শে উঠিলে তবে হিন্দুধর্ম্মের উচ্চশিখরে পৌঁছিতে পারা যায়। সেই উচ্চদেশে হিন্দুধর্ম্মের পরম নিবৃত্তি-পথের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম। সেই সন্ন্যাসে আসিয়া সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক জনগণ এক হইয়া যান। সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মে ব্রহ্ম-তন্ময়তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্ম-তন্ময়তায় ব্রহ্মময় বিশ্বের পূজা ও প্রেম। সেই বিশ্বপ্রেমে সমদর্শিতা হয়, সেই সমদর্শিতায় বিশ্ব ও ব্রহ্ম একই বস্তু। হিন্দুধর্ম্মের এই উচ্চ শিখরে আনিবার নিমিত্ত প্রতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিভিন্ন ধর্ম্মাচার, জপ-তপ, তন্ত্র-মন্ত্র, ব্রত-অনুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতির সৃষ্টি। কেহ ভগবানের রূপ ধরিয়া উঠে, কেহ নাম ধরিয়া উঠে। কেহ বাহ্যানুষ্ঠানে ভক্তির পরিচয় দেয়, কেহ বা আন্তরিক পূজায় ভক্তির

সার্থকতা করে। নহিলে পথ সব একই, কেবল প্রকরণ ভিন্ন। নাম, রূপকে আনে; রূপ, নামকে আনে। রূপ ও নাম প্রকরণ মাত্র। এই সমস্ত প্রকরণে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার নিমিত্ত যদি ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকারে অধিকতর পণ্ডিত গুরুর আবশ্যক হয়, তবে তদ্রূপ গুরুর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিবার কোন সম্প্রদায়ে কিছুই আপত্তি নাই। যিনি যে কুলে জন্মিয়াছেন, তাহার সেই কুলের গুরু-পুরোহিতের নিকট প্রথমে ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, এই মাত্র নিয়ম। এ নিয়মে কি শিষ্য-যজমান, কি গুরু-পুরোহিত, উভয় পক্ষেরই সুবিধা। তদ্দ্বারা শিষ্য-যজমান এবং গুরু-পুরোহিত উভয় কুলই সুরক্ষিত হয়।

হিন্দুধর্ম্মের গুরু ত্রিবিধ—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং পরমগুরু। গুরু-শব্দে পুরোহিতকেও বুঝায়। পিতামাতাও গুরু-পদবাচ্য; তাঁহারাও উপদেশে, অনুষ্ঠানে এবং দৃষ্টান্তে সন্তান-সন্ততিগণকে ধর্ম্মকর্ম্মে সুশিক্ষিত করিয়া আনেন। কুল-গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রবৃদ্ধ হইলে, যাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত পিপাসা জন্মে, তাহার পক্ষে শিক্ষা-গুরুর প্রয়োজন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ শিক্ষা-গুরুর অভাব হয় না, এ পর্য্যন্ত কাহারই অভাব হয় নাই। সকলেই সময়-ক্রমে নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী সেরূপ গুরু লাভ করিয়াছেন। তবে একই শিক্ষা-গুরুর নিকট সর্ব্ব শাস্ত্র-জ্ঞান বা ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতি লাভ করা না যাইতে পারে; সে স্থলে, ভিন্ন ভিন্ন গুরু অনুসন্ধান করিয়া লইতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিরল ও দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু খুঁজিলে যে একেবারে পাওয়া যায় না, এমত নহে। এইরূপ গুরু অনেক সময়ে আপনা-আপনি জুটিয়া যায়। যে, যে পথে থাকে, সে সেই পথের আলোচনা করিতে করিতে

এমত সাধুসঙ্গে আইসে যে, সেই সাধুসঙ্গ হইতে গুরু-লাভ হয়। শিক্ষা-গুরুর সহায়তায় ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার জন্মে। এই শাস্ত্র সমস্তই পরম গুরু-স্থানীয়। স্বয়ং ঈশ্বরই পরম গুরু, এই শাস্ত্র সমস্ত সেই ঈশ্বরের উপদেশ—বা ঈশ্বরসম আপ্তগণের উপদেশ। এই শাস্ত্রের উপদেশ-অনুযায়ী কি শিক্ষাগুরু, কি দীক্ষা-গুরু, সকলেই পরম্পরাক্রমে চালিত হইয়াছেন বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের মূল এই শাস্ত্র-বাক্য। শাস্ত্র-সমস্ত বেদ-মূলক। হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এই কয়েকটি অঙ্গ দেখা যায়ঃ—

(১) বেদ-বেদান্ত। বেদ কর্ম্মকাণ্ডের এবং বেদান্ত জ্ঞান-কাণ্ডের বিভাগ। * বেদব্যাস বেদ-সমূহকে কর্ম্ম এবং জ্ঞান ধরিয়া এইরূপ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বেদ প্রধানতঃ প্রবৃত্তি-পথের এবং বেদান্ত প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গের পথ-প্রদর্শক। অগ্রে কর্ম্ম, তৎপরে জ্ঞান; এ জন্য কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ব এবং জ্ঞানকাণ্ড শেষভাগ বলিয়া প্রথিত।

(২) দর্শন-শাস্ত্র। এই দর্শন-শাস্ত্র সমুদায় বেদ-বেদান্তের প্রধান চক্ষু ও মীমাংসা-শাস্ত্ররূপে প্রকৃত-পক্ষে ত্রয়ীবিদ্যার দর্শনস্বরূপ হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্র অধিকারী-ভেদে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদে বিভক্ত হইয়াছে। প্রমাণ-পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য এই দর্শন-শাস্ত্র আস্তিক এবং নাস্তিক-ভেদেও দ্বিবিধ হইয়াছে।

---

* এই সকাম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, মনুষ্যকে ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিপথে আনিয়া নিষ্কাম করিবার শিক্ষাপ্রণালী। নিষ্কাম ধর্ম্মে মানুষের যে জ্ঞানোদয় হয়, সেই বিবেক-জ্ঞানে মানুষের ব্রহ্মদর্শন-হেতু মোক্ষলাভ হয়। এই ব্রহ্মদর্শনে মানুষ সমুদায় বিশ্বকেই ব্রহ্মময় দেখেন। বেদ-বেদান্ত এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের শিক্ষা-প্রণালী।

সংশয় না হইলে কিসের মীমাংসা হইবে? ষড়্‌বিধ নাস্তিক দর্শন সেইজন্য দর্শন-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ষড়্‌বিধ আস্তিক দর্শন সেই নাস্তিকবাদ খণ্ডন করিয়া বেদকে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

(৩) স্মৃতি-আদি মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র। এই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে লোকযাত্রার সমুদায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য স্বতন্ত্র শাস্ত্র-সৃষ্টি দেখা যায় না। বেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যে প্রকার অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মরূপে আভাসিত হইয়াছে, লোকযাত্রার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। এ জন্য স্মৃত্যাদি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বেদ-বেদান্তের অনুমানসিদ্ধ কর্ত্তব্য-নিরূপক শাস্ত্র। এই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে মনু প্রভৃতি আপ্ত ঋষিগণ সেই কর্ত্তব্যপথ অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য কর্ত্তব্যাবধারণে আর কোন লোকের কোন প্রকার ত্রুটি ও বাধা-বিপত্তি ঘটিতে পারে না। তদ্দারা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান লাভের কর্ত্তব্যপথ অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। লোকযাত্রা-বিধায়ক এই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের যদি কোন বিষয়ে কিছু সংশয় হয়, সেই সংশয়-নিরাকরণ করিবার অতি সুন্দর পন্থাও সেই শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এই মানবধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, পূর্ব্ব মীমাংসা-দর্শনে সেই সকলের সুন্দর মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞান-লাভের পন্থাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া আনিয়া অতি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

(৪) ভক্তি-মীমাংসা। দর্শন-শাস্ত্রে যেমন কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা আছে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে তদ্রূপ ভক্তি-পথেরও স্বতন্ত্র মীমাংসা-শাস্ত্র নারদাদি আপ্ত ঋষিগণ-কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভক্তি-পথের সকল সংশয় এই মীমাংসা-শাস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত হয়।

তদ্দ্বারা ভক্তি-পথে যে আলোকপাত হইয়াছে, সেই আলোকে ভক্তির অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক পন্থায় ভক্তগণ চালিত হইয়া পরমেশ্বরের দর্শনলাভ পূর্ব্বক সর্ব্বশান্তিময় আনন্দধামে উপনীত হয়েন।

(৫) পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র।—বেদে সূক্ষ্মরূপে যে যোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তন্ত্রে বা আগমে সেই যোগপথ পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। সেই যোগপথে সামর্থ্য দিবার জন্য যে সকল শক্তির প্রয়োজন, এই যোগশাস্ত্রে সেই সকল শক্তির বিরাটরূপও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনাদিতে সূক্ষ্ম কথার প্রসঙ্গ, পুরাণে ও আগমে স্থূল কথার প্রসঙ্গ। ইউরোপীয় বিদ্যায় যেমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিষয় সকল ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সেইরূপ অগ্রে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদায় শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনে বিবৃত হইয়াছে, তৎপরে সেই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদায় আগমে ও পুরাণে প্রতিমার স্থূলরূপে এবং বিস্তারিত আকারে খণ্ড-বিখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। আগমের শক্তি-সাধনা এইরূপ যোগ-বিদ্যার চিত্রিত ছবি এবং পুরাণের দেব-দেবী সকল বৈদিক ব্রহ্ম-বিদ্যার খণ্ডিত স্থূলরূপ ও প্রতিমা। শুদ্ধ তাহাই নহে, এই সকল তত্ত্ব ভক্তগণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ইতিহাস ত্রিবিধ—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদায় বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য পশুপক্ষী প্রভৃতির আখ্যানচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ দেওয়া এক প্রকার ইতিহাস। এইরূপ ইতিহাস মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম-কর্ত্তৃক বিস্তর কথিত হইয়াছে। অন্যবিধ ইতিহাস—দেব-দেবীর সৃষ্টি ও লীলাদি-বিষয়ক। নিম্নাধিকারী জনগণের প্রবোধ এবং শিক্ষার্থ এই সকল ইতিহাসের সৃষ্টি। এ কথার প্রমাণ এই গ্রন্থে পরে দৃষ্ট হইবে।

তৃতীয় প্রকার ইতিহাস—ভক্ত, সাধক এবং যোগী-দিগের আখ্যায়িকা—সমস্ত জীবনের আখ্যায়িকা নহে, তাঁহাদের সামান্য ব্যবহারেরও বৃত্তান্ত নহে, তাঁহাদের জীবন-চরিত মধ্যে যাহা কিছু অসামান্য, অসাধারণ ও দেবতুল্য ছিল, কেবল সেই চরিত্রাংশ-বিষয়ক বিবরণ। কারণ, হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য—পরমার্থ-তত্ত্ব। পঞ্চদশীকার ইতিহাসের সেইরূপই লক্ষণ দিয়াছেন। মহাভারত কিরূপ ইতিহাস, মহামুনি ব্যাস তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন :—

"ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সংপ্রকাশিতম্॥"—আদি, ১।৮৭।

"এই ইতিহাস-প্রদীপ প্রকাশিত হইয়া লোকের মোহাবরণ অপনয়ন পূর্ব্বক সমুদায় বিশ্ব যথাবৎ প্রকাশিত করিয়াছে।"

এখানে দেখুন, বেদব্যাস প্রকাণ্ড মহাভারতকে চন্দ্রের বা সূর্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া ক্ষুদ্র প্রদীপের সহিত তুলনা করিলেন। মহাভারতীয় ইতিহাস প্রদীপ-স্বরূপ কেন? চন্দ্র-সূর্য্য বিশ্বের বহির্দ্দেশীয় অন্ধকার-রাশিই অপসারিত করিতে পারেন, কিন্তু লোকালয়ের গৃহপুরস্থ আভ্যন্তরিক ধ্বান্তরাশি কি চন্দ্রকিরণদ্বারা অপসারিত হয়? তথায় সে কিরণজাল পৌছিতে পারে না; তথায় দীপালোক চাই। মানুষের আন্তরিক গৃহপুরের আধ্যাত্মিক তমোরাশি তদ্রূপ। সেই আধ্যাত্মিক তমোরাশি অপসারিত করিয়া মহাভারতীয় ইতিহাস মানবান্তরে দীপ জ্বালিয়া দিলে তদ্দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় বিশ্বরহস্য যথাবৎ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইংরাজীতে যাহাকে History বলে, আর্য্যশাস্ত্রে ইতিহাস-শব্দের অর্থ ঠিক তাহা নহে।

মহাভারত এইরূপ ইতিহাস, তাহা শুদ্ধ বাহ্য জগতের ইতিবৃত্ত নহে। সেই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য—প্রধানতঃ পরমার্থ তত্ত্ব; ব্যাবহারিক জ্ঞান নহে। সেই তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য মহাভারতীয় অদ্ভুত কল্পনা-সম্পন্ন বিস্তারিত ঘটনা-পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণের সৃষ্টি। সেই ইতিহাস পরমার্থ-জ্ঞানের প্রবাহক মাত্র। নানা ঘটনার আবরণে আচ্ছাদিত মহাভারতীয় কাব্য-কল্পনা প্রগাঢ় রসে প্রবাহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-রাশি আবালবৃদ্ধবনিতা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা দিতেছে। এইরূপ লক্ষ্য ধরিয়াই সমস্ত পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতির উপকথা যেমন ইতিহাস বলিয়া প্রথিত হইয়াছে, সাধুচরিত্র-বর্ণনও তেমনি ইতিহাস। দেবদেবীর সৃষ্টি এবং লীলাদিরও ইতিহাস তদ্রূপ ইতিহাস। সমস্তেরই লক্ষ্য এক। বেদে ও উপনিষদেও সামান্যাকারে এইরূপ অনেক আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিষদে সামান্যাকারে যে ইতিহাসের আরম্ভ আছে, পুরাণে ও আগমে তাহারই বিস্তৃত সৃষ্টি। ভগবান্ জৈমিনি দেখাইয়াছেন, বেদে যে সমস্ত ঋষিগণের কথা আছে, সে সমস্তই আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ এইরূপ পারমার্থিক ইতিহাস—অধ্যাত্ম-জগতের প্রকৃত ঘটনা ও তত্ত্বকথা।

এই পঞ্চবিধ আপ্তবাক্য হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শিক্ষক। সে শিক্ষা প্রথমে পিতামাতার নিকট পরিবার-মণ্ডলে আরব্ধ হয়, কিরূপে আরব্ধ হয়, "সমাজতত্ত্বে" তাহা উক্ত হইয়াছে। আচার্য্য ও গুরুগণ যাহার নেতৃ-স্বরূপ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পথ দেখাইয়া দিয়া আসেন, আপ্তবাক্য-নিচয় পরিশেষে সেই ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ও পরম গুরু-স্বরূপ হইয়া পড়েন। যতদিন না শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকার জন্মে, ততদিন উক্ত ত্রিবিধ গুরুকে মান্য

করিয়া চলিতে হইবে। ততদিন মাতৃবাক্য, পিতৃবাক্য এবং গুরু-বাক্যই প্রধানতঃ সম্মাননীয়। তাঁহাদের আদেশই ধর্ম্ম। তাঁহারা সন্তান-সন্ততি ও শিষ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর বহুদর্শী, বিজ্ঞ, কার্য্য-কুশল এবং উহাদের প্রকৃত হিতাভিলাষী। এ জন্য, মনু সকলকেই ঐ গুরুত্রয়ের মন্ত্রশিষ্য হইয়া তাঁহাদের একান্ত বশবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন উল্লঙ্ঘন করা কোন মতেই বিধেয় নহে। তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রজ্ঞানে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। সেই জ্ঞানের অধিকার হইলেও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত নহে। আচার্য্য ধর্ম্মগুরুরূপে শাস্ত্রীয় মীমাংসাসকল চিরকাল উপদেশ না দিলে এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি ও কৌশলাদি না দেখাইয়া দিলে ধর্ম্মপথে কখনই অগ্রসর হওয়া যায় না।

এই পঞ্চ আপ্তবাক্য হইতেই হিন্দুধর্ম্মীয় শক্তিবাদ, ভক্তিবাদ, কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ প্রভৃতি নানাবাদের স্বষ্টি হইয়াছে। পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে নিম্নাধিকারী উপাসকের নিমিত্ত শক্তিবাদ, ভক্তিবাদ এবং কর্ম্মবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত বাদই ভক্তিমূলক; ভক্তি নহিলে নিম্নাধিকারী জনগণের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ঈশ্বরোপসনা কিরূপে সম্পন্ন হইবে? তাই, এই সমস্ত বাদ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অন্ন-স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহার প্রবৃত্তি যেরূপ, তিনি তদনুযায়ী ভক্তিমূলক এক বা অন্যতর বাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎ-আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ হইলে যখন তাঁহার কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন তিনি দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েন; এই দর্শন-সমস্ত এক এক ব্রহ্মদর্শনের পন্থা; সেই পন্থা প্রতি দর্শন-নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্মদর্শনের এইরূপ জ্ঞানযোগে উপনীত

করিবার জন্যই হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালীর ভক্তি ও কর্ম্মযোগের সৃষ্টি। গীতা সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ!
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥"—৩।৩।

"হে অনঘ! এই সংসারে শুদ্ধান্তঃকরণ এবং অশুদ্ধান্তঃকরণ ভেদে অধিকারী দ্বিবিধ। অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মযোগাদি দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণ করেন। সুতরাং সাংখ্যাদি জ্ঞানমার্গ এবং কর্ম্মযোগের নিষ্ঠা ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। জ্ঞানের সোপানই কর্ম্মযোগ।"

শুদ্ধান্তঃকরণ-ব্যক্তি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়া কেহ সাংখ্য যোগ-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষার্থ সিদ্ধ করেন; কেহ বা নৈয়ায়িক-দিগের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স-সাধন পূর্ব্বক আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ বা উত্তর-মীমাংসা-প্রতিপাদিত জ্ঞানযোগের অধিকারের উপযোগী হইলে উপনিষদোক্ত জ্ঞান-সাধন দ্বারা মায়া-মোহ কাটাইয়া সমদর্শিতা লাভ করিয়া নিখিল সংসার ব্রহ্মময় দর্শন করেন। দর্শন-সমস্ত এইরূপ এক এক প্রকার জ্ঞানযোগের ও পরমাত্ম-দর্শনের শিক্ষাগুরু-রূপে হিন্দুধর্ম্মের মোক্ষসাধন পন্থা-স্বরূপ হইয়া আছে। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা এক যুগল নয়ন, কাপিল ও পাতঞ্জল সাংখ্য অন্যতর যুগল চক্ষু এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অন্যতম যুগল নেত্র। কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সকলই বেদ-বেদান্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া উহাদেরই অনুমান-শাস্ত্ররূপে হিন্দুধর্ম্মের পরম গুরু-স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মীয় পরম-গুরুস্বরূপ এই সমস্ত আপ্তবাক্য কিরূপ প্রমাণে দণ্ডায়মান আছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

হিন্দু আপ্তবাক্যের প্রকৃতি।

পূর্ব্ব-প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের মূল যে বেদ, সেই বেদ হইতে উৎপন্ন শাস্ত্র-সকল বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত হওয়াতে উহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বেদ নিজেই ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানকাণ্ড, সেই ব্রহ্মের উপাসনা-কাণ্ড এবং সেই উপাসনার উপযোগী প্রবৃত্তি-ধর্ম্মীয় নিবৃত্তি-সাধক কর্ম্মকাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং, সেই বেদ হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও তদ্রূপ বিভাগে বিভক্ত না হইবে কেন? বেদান্ত-দর্শনকেও আমরা সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক, উপাসনা-বিষয়ক, কর্ম্ম-বিষয়ক এবং আত্মার বিভিন্ন অবস্থা-বিষয়ক-বিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। যেখানে অধিকার-ভেদ আছে, সেখানে সেই ভেদ-বশতঃ উপদেশেরও বিভেদ হইয়া গিয়াছে। কারণ, সকল অধিকারী এক প্রকার উপদেশের উপযুক্ত হইতে পারে না। তাই, শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত। এ জন্য আমরা দেখাইয়াছি যে, ভক্তিশাস্ত্র পদ্ম-পুরাণে উচ্চাধিকারীর মায়াবাদ নিন্দনীয় হইয়াছে। তদ্রূপ, যোগৈশ্বর্য্য প্রতিষিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাপিল সাংখ্যে এবং জৈমিনির কর্ম্মবাদে সগুণ ঈশ্বরোপাসনা অসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কি ভগবান্ কপিল, কি জৈমিনি উভয়েই পুরুষ এবং আত্মা স্বীকার করিয়াছেন; স্বীকার করিয়া জ্ঞানযোগ-সাধন দ্বারা মুক্তিমার্গ স্থির করিয়া গিয়াছেন। সকলেই এক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ অধিকার-ভুক্ত উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, উপদেশ অধিকার-বহির্ভূত হইলে অধিকারী জনগণের বুদ্ধিভেদ ঘটিয়া যায়। অবোধ জনগণকে কোন নিশ্চিত পন্থা

দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদিত হইলে ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে। তাই, গীতা বলিয়াছেন :—

"প্রকৃতেগু´ণসংমূঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥—৩।২৯।

"যাঁহারা প্রাকৃতিক গুণে (রজঃ এবং তমঃ) সংমূঢ় হইয়া ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত, সেই সকল আসুর ভাব প্রাপ্ত মন্দমতিকে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি বিচালিত করিবেন না।"

করিলে বিপরীত ফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতোক্ত যোগ-রহস্য অভক্ত জনগণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব, অধিকারানুযায়ী শাস্ত্রোপদেশ নিয়মিত করা আবশ্যক; নহিলে, অধিকারীর পক্ষে উপযুক্ত হইবে কেন? তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এই অধিকার-অনুসারে শাস্ত্র-সমস্ত বিভক্ত হইলেও প্রতি শাস্ত্রের উপদেশ নিজ নিজ অধিকারে নির্দ্দোষ। যাহা আপ্ত ঋষিগণ-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তাহা নির্দ্দোষ না হইবে কেন? তাঁহাদের কোন স্বার্থ ছিল না। তাঁহারা ঈশ্বর-তুল্য সাধু ও জ্ঞানবান্ ছিলেন। যিনি যে পথ ধরিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পথেরই উপদেশ দেওয়াতে সেই পথের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হইয়াছে। কারণ, সে পথ অগ্রে পরীক্ষিত হইয়া তবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ স্ব স্ব পথেরই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কাজেই, তাহা সামান্য, অসিদ্ধ, লোকের উপদেশ-মত দোষাশ্রিত হয় নাই। সেরূপ দোষাশ্রিত নহে বলিয়া তাহা আপ্তবাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। আপ্তবাক্য কি? যাহাতে সামান্য মনুষ্য-বাক্যের

দোষ-স্পর্শ করে নাই, তাহাই আপ্তবাক্য। সামান্য মনুষ্য-বাক্যের দোষ কি কি ?

(১) মনুষ্য-বাক্য ভ্রান্তিসঙ্কুল। যে বস্তু যাহা, তাহাকে সেই রূপে প্রতীত না করাই ভ্রান্তি।

(২) মনুষ্য-বাক্য প্রমাদ-বিশিষ্ট। অনবধানতা-বশতঃ যে মিথ্যাজ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রমাদ।

(৩) তৃতীয় দোষ, বিপ্রলিপ্সা। যে অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা না বুঝাইয়া অন্য প্রকার বুঝানই বিপ্রলিপ্সা। বিপ্রলিপ্সা সুতরাং প্রতারণা-বাক্য।

(৪) চতুর্থ দোষ—করণাপাটব। করণের বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বশতঃ যথাযথ বস্তু-গ্রহণে অসামর্থ্য ঘটিলে যে দোষ ঘটে, তাহাই করণাপাটব।

আপ্তবাক্যে এই প্রকার সামান্য-জনোচিত দোষ সম্ভবে না। যাহা মনুষ্য-বাক্যের দোষাশ্রিত নহে, তাহা দেব-বাক্য। আপ্ত-বাক্য-সমস্ত এ জন্য ঈশ্বর-বাক্য বা ঈশ্বর-প্রতিম ঋষিবাক্য। শাস্ত্র-কারগণ ঈশ্বর-রূপেই শাস্ত্রে গণনীয় হইয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা ভগবান্ বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকেন।

এই আপ্তবাক্য ত্রিবিধ—নিত্য আপ্ত, স্বাভাবিক আপ্ত এবং সিদ্ধ-আপ্তবাক্য। আমরা একে একে এই ত্রিবিধ আপ্তবাক্যের প্রকৃতি বর্ণন করিতেছি।

১। নিত্য আপ্তবাক্য কি ? নিত্য আপ্তবাক্য বেদ ; বেদ বলিলে বেদান্তকেও বুঝায়। বেদ নিত্য শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া নিত্য আপ্তবাক্য। জগতে নিত্য শব্দ কি কিছু নাই ? আমরা পূর্ব্বে "ব্রহ্মবাদে" দেখাইয়াছি যে, আকাশই অনন্ত দেশ ও অনন্ত

কাল। কল্পাদি সমস্ত সেই অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের অংশ ও মূর্ত্তি মাত্র। তাই অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে ব্রহ্ম ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তিনিই মহাকাল ও অনন্ত ব্রহ্ম। এই মহাকালই শাস্ত্রে মহাদেব-রূপে উক্ত হইয়াছেন। শুধু মহাকাল নহে, তিনিই আবার পরম ব্যোম মহেশ্বর। প্রতি কল্পারম্ভে এই আকাশ সগুণরূপে ব্যক্ত হইলে তাহা সক্রিয় হইয়া গতিসম্পন্ন হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া সেই খানেই গতি। আবার যেখানে গতি সেই খানেই শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দ দ্বারাই আকাশ শব্দময় হইয়া যায়। সূক্ষ্ম মহাভূত-স্বরূপ বায়ু-শক্তিই আকাশ-দেশকে অনন্ত গতিবিশিষ্ট করে। সেই অনন্ত গতিই অনন্ত শব্দের কারণ। এই আকাশ ও বায়ু যদি অনাদি ও নিত্য হয়, তবে যে শব্দ সেই বায়ু-সমুৎপন্ন এবং যাহা অনন্ত আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা অনাদি ও নিত্য হইবে না কেন? সেই নিত্য শব্দ প্রলয়ে বায়ুর সহিত বিলীন হইয়া আবার কল্পারম্ভে পুনরাবির্ভূত হয়। এই নিত্য শব্দময় ব্রহ্মই পরম ব্যোম মহেশ্বর।

সৃষ্টিকালে যে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত কূটস্থ-চৈতন্য এই আকাশ-ব্যাপী হইয়া সৃষ্টি করেন, শাস্ত্রে তাঁহাকেই ব্রহ্মা কহে। আমরা "ব্রহ্মবাদে" দেখাইয়াছি যে, মহাভারতে এই ব্রহ্মা অনন্ত আকাশ-ব্যাপ্ত-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া এই নিত্য শব্দময়ও হইয়াছেন। কারণ, আকাশই শব্দময়। এই নিত্য শব্দময় আকাশ-ব্যাপ্ত ব্রহ্মা হইতে যদি জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, জগৎ সেই নিত্য শব্দব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। শাস্ত্রেও আমরা শুনিতে পাই যে, জগৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূজ্যপাদ নাগেশ ভট্ট স্বকীয় মঞ্জুষা-নামক গ্রন্থে তাহা

বুঝাইয়া দিয়াছেন। শুধু যে বাহ্য জগৎ এই নিত্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত নহে, অধ্যাত্ম-জগৎও সেই শব্দ হইতে উৎপন্ন। এ জন্য শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে, শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দ হইতে বেদ কিরূপে সম্ভূত হয় এবং বেদকেই বা শব্দব্রহ্ম বলে কেন, তাহা বলা যাইতেছে।

এই নিত্য শব্দকে আমাদের ভাষান্তর্গত বর্ণাত্মক অনিত্য শব্দ হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত পাণিনি মুনি তাহাকে "স্ফোট-" শব্দে অবিহিত করিয়াছেন। এই স্ফোট সম্ভবতঃ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অতি মৃদু ধ্বনি। সেই ধ্বনি কেবল সমাধি-প্রাপ্ত ঋষি-গণ-কর্ত্তৃকই শ্রুত হইয়াছিল। তাহা নিশ্বাসবৎ ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রুতিতে শুনা যায় যে, বেদচতুষ্টয় ব্রহ্মার নিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন।

> "অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
> সামবেদঃ।"—শতপথব্রাহ্মণ।—৪৷৪৷৫।

এই নিশ্বাসবৎ স্ফোট-শব্দ হইতে বেদবাক্য-সকল স্ফুটিত হইয়াছে। যাহা এই স্ফোট-শব্দ হইতে লব্ধ হইয়াছে, তাহা কোন পুরুষ-কৃত নহে। যাহা পুরুষ-কৃত নহে, তাহাই অপৌরুষেয়।

কাঁহারা বেদকে শ্রুতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন? আমরা ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে দেখিতে পাই যে, সাধ্য ও ঋষিগণের সর্ব্বহুত নামক মানসযজ্ঞ হইতে চতুর্ব্বেদ শব্দিত হইয়া সমুত্থিত হইয়াছিল:—

> "তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
> ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত ॥"—৯ম সূক্ত।

"সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্‌মন্ত্র সকল এবং সামসঙ্গীত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা হইতেই ছন্দ সকল এবং তাহা হইতেই যজুর্মন্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইল।"

এই সর্ব্বহুত যজ্ঞ উহার সপ্তম সূক্তে মানস-যজ্ঞ রূপেই উক্ত হইয়াছে। মানস যজ্ঞ বলিলে দৃশ্যমান হোমাদির ন্যায় ঘৃতাহুতির ব্যাপার বুঝায় না। তাহা এক প্রকার মানসিক আহুতি-ব্যাপার। সেই মানসিক সমাধি-ব্যাপারে সমস্ত ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের আহুতি হওয়াতে অবশ্য ইন্দ্রিয়-নিরোধ হইয়াছিল; ঋষিগণের আর ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ছিল না। সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের ও মনের নিরোধ-সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বাহুতি দিয়া সেই সাধ্য ও ঋষিগণ সমাধিস্থ হইলে ঋক্, যজু ও সামসঙ্গীতের গম্ভীর শব্দ দৈববাণীর ন্যায় নিশ্বাসবৎ স্ফুরিত হইয়া সমুত্থিত হইয়াছিল। এরূপ হওয়া কি একান্ত অসম্ভব? পূর্ব্বকালে গ্রীশ দেশের Oracle এর কথা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এখনও তারকেশ্বরে ৺ বাবার নিকট সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক চিত্তে হত্তে (আহুতি) দিয়া পড়িয়া থাকিলে স্বপ্নবৎ দৈবাদেশবাণী শ্রুত হইয়া থাকে। সেই স্বপ্নঘটিত ঔষধিতে অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অরেকেলের ব্যাপার এবং হত্তে দেওয়ার ব্যাপার সামান্য আকারে মানসিক যজ্ঞ নহে কি? ঋষিদিগের উক্ত সর্ব্বহুত যজ্ঞের সহিত উহাদিগকে সমান করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কেবল সেই যজ্ঞের সম্ভাবনা দেখাইবার জন্যই উহাদের উল্লেখ হইয়াছে। বেদের উৎপত্তি এইরূপ।

এক্ষণে কথা এই, উক্ত সাধ্য এবং ঋষিগণ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন? গীতায় আছে:—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়। প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥"—৯।৭।

"হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়কালে ভূত সকল মদীয়া প্রকৃতি-প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ তাহারা আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হইয়া থাকে। পুনঃ

সৃষ্টিকালে সেই প্রলীন ভূত-সকলকে আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি। আবার তাহাদিগকে বিভাগানুসারে প্রব্যক্ত করি।”

প্রতি সৃষ্টিকালে তবে ব্রহ্মা হইতে সমস্ত ভূতের আবির্ভাব হইলে, তৎসঙ্গে পূর্ব্বকল্পীয় বেদবিৎ “জীবন্মুক্ত” পুরুষগণেরও জাতীয় বিভাগানুসারে আবির্ভাব হয়। কারণ, ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, তিনি গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি করেন। কিরূপে করেন, তাহা আমরা “সমাজ-তত্ত্বে” প্রদর্শন করিয়াছি। এই মুক্ত পুরুষগণই সাধ্য এবং ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রতি কল্পেই সর্ব্বহুত মানস যজ্ঞ হইতে নিশ্বাসবৎ শব্দের শ্রুতি-অনুসারে বেদবাক্য প্রকাশ করেন।

এই বেদ-শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলে কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋষিদিগের মানসযজ্ঞ হইতে শব্দ নিশ্বাসবৎ সমুত্থিত হয়। তাহা মনুষ্য-ভাষার শব্দবৎ নহে; তাহা বেদার্থপূর্ণ “স্ফোট” মাত্র। এই স্ফোটকে কেহ কেহ নাদও বলিয়া থাকেন। এই নাদই প্রণবের বিন্দু। কারণ, শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই নাদ এবং জগদুৎপত্তির কারণ—বিন্দুবৎ পরমাণু, একই কথা। যে পরমাণুপুঞ্জ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মার কারণ-শরীর। সুতরাং এই পরমাণু বা নাদই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত এই পরমাণু-সকল সৃষ্টিকালে নাদ-বিশিষ্ট হয়; যেহেতু সে সমস্ত তখন গতি ও ক্রিয়াশীল হয়। এই জন্যই যাহা শব্দময় পরমাণু, তাহাই নাদ। এই নাদ দ্বারাই জগৎ-বীজ আহিত হয়। এই নাদ বা শব্দকে বেদবাক্যও বলে। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন :—

“ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।”—পূর্ব্ব-মীমাংসা ১।৩।১।

“শব্দই ধর্ম্মের মূল, নিখিল ধর্ম্মই বেদমূলক, যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা ত্যাজ্য।”

শুধু যে পূর্ব্ব মীমাংসায় শব্দ-অর্থে বেদ বুঝায় এমত নহে, উত্তর-মীমাংসায়ও ভগবান্ বাদরায়ণ বেদ বুঝাইতে শব্দ কথাটি অনেক স্থলেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দই শব্দব্রহ্ম। যেহেতু, বেদ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-জগতের যে নিত্য নিয়মবলে ব্রহ্ম-লাভ হয়, সেই অধ্যাত্ম-জগতের বৈজ্ঞানিক নিয়ম-সকল প্রকাশ করিয়া বেদ সেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনও করিয়াছেন।

"তদিতি বা এতস্য মহতোভূতস্য নাম ভবতি যোঽস্মৈ তদেবং নাম বেদ ব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্ম ভবতি।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

সর্ব্বগত নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার প্রতিপাদকই বেদ; তজ্জন্য বেদের নাম ব্রহ্ম হইয়াছে। যিনি এই বেদকে বিদিত হয়েন, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।"

এই কারণেই বেদকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বৈদিক তপস্যা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। আভিধানিকেরাও সেই জন্য বেদকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন :—

"বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম।"—অমরকোষ।

"ব্রহ্ম তত্ত্বতপো বেদে ন দ্বয়োঃ পুংসি বেধসি।"—মেদিনী।

যেমন অনন্ত শব্দময় ব্যোম ব্রহ্মময়, তেমনি বেদ ব্রহ্মময়। এ জন্য এই উভয়ই শব্দব্রহ্ম। বেদের অর্থ এই নিত্য ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম-শব্দই নিত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য যে শব্দের অর্থ নিত্যব্রহ্ম, তাহাই শব্দব্রহ্ম। বেদের এইরূপ নিত্য অর্থ ধরিয়াই পূজ্যপাদ জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়াছেন। অর্থ ও শব্দ অভিন্ন—যে শব্দ সেই অর্থ। অর্থ ও শব্দ যদি অভিন্ন হয়, তবে নিত্য অর্থপূর্ণ বেদকে নিত্য শব্দ বলিব না কেন? এ শব্দ ভাষার বর্ণাত্মক শব্দের মত অনিত্য নহে। এ জন্য মহাভাষ্য-গ্রন্থে ভগবান্ পতঞ্জলি

বলিয়াছেন যে, বেদের অর্থ নিত্য, বেদের বর্ণ-বিন্যাস এবং বর্ণের আনুপূর্ব্বী নিত্য নহে। জৈমিনির মতে বেদ কেবল শব্দের শ্রুতি-মাত্র এবং তজ্জন্য অপৌরুষেয়। দর্শন-শাস্ত্রের এই অপৌরুষেয় বাদ এত জটিল যে, তাহা তদিতর ভাষায় সম্যক্ প্রকাশ করা অতিশয় কঠিন। বেদার্থ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য আপ্তবাক্য।

২। স্বাভাবিক আপ্তবাক্য। স্বাভাবিক আপ্তবাক্যের অর্থই এই যে, যাঁহারা স্বাভাবিক আপ্ত, তাঁহাদিগের বাক্য। স্বাভাবিক আপ্ত কে? স্বয়ং ভগবান্ এবং সেই ভগবানের স্থানীয় তাঁহার অবতারগণ বা তৎসদৃশ পুরুষগণই স্বাভাবিক আপ্ত পুরুষ। এ জন্য ভগবদ্বাক্য-কেই স্বাভাবিক আপ্তবাক্য কহে। নৈয়ায়িকদিগের মতে বেদ স্বাভাবিক আপ্তবাক্য। জৈমিনি, কপিল, রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদের নিত্য অর্থ ধরিয়া বেদকে অপৌরু-ষেয় বলিয়াছেন; নৈয়ায়িকেরা শুদ্ধ অর্থ ধরেন নাই, তাঁহারা বলেন, বেদ বিধাতার নিশ্বাসবৎ উচ্চারিত শব্দ-প্রমাণ বাক্য। এ জন্য, তাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়াছেন। পৌরুষেয় এবং অপৌরুষেয় বাদে এই মাত্র প্রভেদ যে, অপৌরষেয় বাদে বেদার্থ অর্থপূর্ণ স্ফোট বা নাদ-প্রমাণ শ্রুত হইয়াছিল; পৌরুষেয় বাদে সেই স্ফোট বা নাদ উচ্চারিত বাক্যরূপে শ্রুত। নৈয়ায়িকেরা আরম্ভবাদী; সুতরাং তাঁহারা নিম্নাধিকারী জনগণের নিমিত্ত সৃষ্টি-তত্ত্বে ঈশ্বরবাদই প্রকাশ করিয়াছেন। সেই নিম্নাধিকারী জন-গণের নিকট জটিল এবং অলৌকিক অপৌরুষেয় বাদ তত গ্রহ-ণীয় হইতে পারে না বলিয়া নৈয়ায়িকেরা সেই অপৌরুষেয় বাদকে ভক্তিপূর্ণ পৌরুষেয় বাদ-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পৌরুষেয় বাদমতে শুদ্ধ যে বেদ ভগবদ্বাক্য এমত নহে, সেই ঈশ্বরের অব-

তারপর মন্বাদি, শ্রীকৃষ্ণ এবং মহেশ্বর ও পার্ব্বতীর বাক্য সকলও ভগবদ্বাক্য। এ জন্য মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং তন্ত্রাদিও স্বাভাবিক আপ্তবাক্য।

৩। সিদ্ধ আপ্তবাক্য। এই সিদ্ধ আপ্তবাক্য—কপিলাদি সিদ্ধ পুরুষের এবং ঋষিগণের বাক্য। তাঁহারা যোগবলে জ্ঞান-চক্ষুঃ লাভ করিয়া বেদমন্ত্র সকল প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক নানা স্মৃতি, দর্শন ও পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এ জন্য সে সমস্ত শাস্ত্রই মূল বেদবাক্যের অর্থ-প্রকাশক অনুমানসিদ্ধ আপ্তবাক্য।

এই ত্রিবিধ আপ্তবাক্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, উহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে জগতে এক নূতন বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছে। সেই বিদ্যার নাম পরাবিদ্যা। বাহ্য-বিজ্ঞান যে বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কেবল ঐহিক সুখের বৃদ্ধি-সাধনেই ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহা অপরা বিদ্যাভুক্ত ব্যাবহারিক বিদ্যা। গীতা বলিয়াছেন যে, ঐহিক সুখকামনা অতি দুষ্পূরণীয় এবং আপাততঃ মনোরম হইলেও অনলের ন্যায় সন্তাপদায়ক। এ জন্য যাহা নিত্য সুখ ও চিরশান্তিময়, সেই সুখের পন্থা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই বেদ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিরশান্তি কেবল সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হইতে পারে। গীতা সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারিত শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন পূর্ব্বক নানা যোগপথ দেখাইয়া দিয়া বৈদিক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে অতি পরিস্ফুতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে পরমাত্ম-তত্ত্বালোচনায় বাহ্য বিজ্ঞান পরাস্ত, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। কোমৎ প্রভৃতি বড় বড় বাহ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে ক্ষেত্রকে মানুষের অধিকারাতীত বলিয়া সে পথ হইতে

মানুষকে একেবারে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি অপর বাহ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আবার বলিয়াছেন, কেন, আমরা সে পথ হইতে একেবারে বিমুখ হইব; তাহার প্রকৃত তত্ত্ব মানুষের অধিকারভুক্ত না হইলেও বাহ্য বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার অনেক দূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদও সেই কথাই বলিয়াছেন। বেদ বলিয়াছেন যে, অপরা বিদ্যা দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণীত হইবে, তাহা কেবল "নেতি নেতি" রূপেই পর্য্যবসিত হইবে। হার্বার্ট স্পেন্সরও ঠিক সেই পর্য্যন্তই আসিয়া The Unknowable Absolute বস্তুতে উপনীত হইয়াছেন মাত্র। মায়িক জ্ঞানের সীমা এই পর্য্যন্ত। সেই জ্ঞান Absolute পুরুষের কেবল মন্দির-দ্বারে উপনীত হইতে পারে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ প্রতীত করিতে পারে না। কেবল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারাই এই প্রত্যক্ষজ্ঞান-সিদ্ধ প্রতীতি লব্ধ হইতে পারে। ঋষিগণ সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপনীত হইয়া যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ উপলব্ধিরূপ সুস্পষ্ট প্রতীতি এবং সেই প্রত্যক্ষ প্রতীতিরূপে তাহা এই সমস্ত আপ্তবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। বাহ্য বিজ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ অনুমান ও আভাস-দ্বারা এই স্পষ্ট প্রতীতি-সমস্ত সমর্থিত হইতে পারে মাত্র। "সৃষ্টিতত্ত্ব"-বিষয়ক স্বতন্ত্র প্রবন্ধাবলিতে, আমরা তাহাই দেখাইয়াছি। অতএব, সনাতন ধর্ম্মপ্রণালী যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানমূলক, হিন্দুদর্শনসমূহ যাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা বাহ্য বিজ্ঞান-সম্মতও হইয়াছে।

এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পন্থাই,—কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এই সাধনাপ্রণালীনিচয় সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। এই এই পন্থাবলম্বন করিয়া

যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানে উপনীত হইতে পারেন, তিনিই মায়ামোহ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। বাহ্য বিজ্ঞান-দ্বারা এ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পন্থা-দ্বারা যে ব্রহ্ম-দর্শন ও আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তাহারই প্রমাণ আমরা পরে প্রদান করিব। যে আপ্তবাক্য-শাস্ত্রসমুদায় এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আপ্তবাক্য উচ্চাধিকারীর নিকট নিত্য আপ্তরূপে অপৌরুষেয়; কিন্তু নিম্নাধিকারী জনগণের নিকট স্বাভাবিক এবং সিদ্ধ আপ্তরূপে পৌরুষেয়। এই নিত্য, স্বাভাবিক এবং সিদ্ধ আপ্তবাক্যের প্রমাণ যে মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক শব্দ-প্রকাশক ঋষিগণ, ঈশ্বরের অবতারগণ এবং সিদ্ধবিদ্যা-প্রকাশক শাস্ত্রবেত্তাগণ ছিলেন, সেই আপ্তগণের প্রমাণও পরে প্রদত্ত হইবে। এ প্রস্তাবে কেবল হিন্দু আপ্তবাক্যের প্রকৃতি-মাত্র আলোচিত হইল।

পরতঃ এবং স্বতঃ-প্রমাণ

কোন ধর্ম্মপ্রণালী সামাজিক হইতে হইলে আপ্তবাক্যের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানী লোকের আপ্তবাক্য ভিন্ন জনসমাজ কাহার কথা মানিয়া চলিবে? বিশেষতঃ ধর্ম্মের অলৌকিক বিষয়-সম্বন্ধে সামান্যলোকের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির কথা কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মের আপ্তবাক্য কি কি, এবং কি প্রকার, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে কথা এই, সেই আপ্তবাক্য কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? আপ্তবাক্য নির্ণয় করিবার জন্য সকল ধর্ম্ম-প্রণালীই দ্বিবিধ প্রমাণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই দ্বিবিধ প্রমাণ-পদ্ধতি পরতঃ এবং স্বতঃ। সকল ধর্ম্মপ্রণালীরই যখন এই দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, হিন্দুধর্ম্মের কি নাই? হিন্দু-ধর্ম্মেরও ঐ দ্বিবিধ প্রমাণ আছে বটে; কিন্তু তাহার প্রমাণ-পদ্ধতি অপরাপর ধর্ম্মপ্রণালী হইতে বিভিন্ন প্রকার। হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ এবং স্বতঃ-প্রমাণ বলিবার পূর্ব্বে আমরা অপর এক ধর্ম্মপ্রণালীর সেই দ্বিবিধ প্রমাণ-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া সেই প্রমাণের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিতে চাই। সেই জন্য ইংরাজী কৃত-বিদ্যগণের সুবিধার নিমিত্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রমাণ-পদ্ধতি সংক্ষেপে গৃহীত হইল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম -ঈশ্বর-বাক্য। The New Testament বা নূতন বাইবেল ঈশা-উপদিষ্ট-বাক্য; সুতরাং পৌরুষেয়। লোকের বিশ্বাসভাজন করিবার নিমিত্ত, সকল ধর্ম্মপ্রণালীকেই ঈশ্বরবাক্য-রূপে পরিচিত করা চাই। এখন কথা এই, নূতন বাইবেল যাঁহার বাক্য, তিনি ঈশ্বর কি না? যদি তিনি ঈশ্বর হয়েন,

তবে তাঁহার ঈশ্বর-বিষয়ক এবং পরলোক-সম্বন্ধে অলৌকিক তত্ত্বের উপদেশ-সমুদায় সত্য, নহিলে নহে। বাইবেলের সত্যতা-প্রতিপাদন জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই দ্বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করেন :—

প্রথমতঃ। বাইবেলের পরতঃ-প্রমাণ বা External Evidence.

দ্বিতীয়তঃ। বাইবেলের স্বতঃ-প্রমাণ বা Internal Evidence.

পরতঃ-প্রমাণ প্রমাণান্তর হইতে বাইবেলকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহে। সেই প্রমাণান্তর ইতিহাস। ইতিহাস স্থাপন করিতে চাহে যে, ঈশা অদ্ভুত এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করিয়াছিলেন বলিয়া ঈশ্বর। একথায় আপত্তি এই :—

(১) শুদ্ধ অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। আজ যাহা অদ্ভুত, কাল তাহা অদ্ভুত নহে—বিজ্ঞান-জ্যোতিতে সামান্য এবং প্রাকৃত। অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তবে প্রতি বাজিকর ঈশ্বর।

(২) ইতিহাস * ঘটনাবলির যে সাক্ষ্য দেয়, তাহার প্রামাণ্য কি? তাহার প্রামাণ্য যাহা দিবে, তদুত্তরে বলিতে হয়, সে প্রামাণ্যের আবার প্রামাণ্য কি? সে প্রামাণ্যের যে প্রামাণ্য দিবে, তাহার আবার প্রামাণ্য কি? ঐতিহাসিক প্রমাণের

* আর্য্যশাস্ত্রে ইতিহাসের যে অর্থ, ইউরোপীয় History বলিতে ঠিক সে অর্থ বুঝায় না। এস্থলে ইতিহাস-শব্দ ইংরাজী History শব্দেরই প্রতিবাক্য। আর্য্যশাস্ত্রের ইতিহাস-শব্দের অর্থ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এইরূপ অনন্ত-পরম্পরায় প্রমাণের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণে অনবস্থা-দোষ ঘটে। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরতঃ-প্রমাণে বাইবেল প্রামাণ্য নহে।

হিউম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সে সমস্ত আপত্তি অদ্যাপি খণ্ডিত হয় নাই। এই সমস্ত আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া ইতিহাস ঈশ্বরত্বের প্রামাণ্য নহে। তবে কি ইতিহাস একেবারেই অগ্রাহ্য? আমরা এমত কথা বলি না। ইতিহাসের ব্যবহার কিরূপ করা যাইতে পারে, আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ইতিহাস বিলক্ষণ উপযোগী; কিন্তু ঈশ্বরত্ব স্থাপন-পক্ষে ইতিহাস প্রামাণ্য নহে। ঈশ্বরের জন্মকর্ম্ম ইতিহাস দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। এরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধ্যর্থ আর্য্যশাস্ত্র ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করে নাই। ঈশ্বরের জন্মকর্ম্ম-প্রতিপাদনার্থ ইতিহাস যদি অগ্রাহ্য হইল, তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্থাপন-পক্ষে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। সেই প্রমাণ বাইবেলের স্বতঃ-প্রামাণ্য। সেই স্বতঃ-প্রমাণ কি প্রকার?

নূতন বাইবেলে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সমুদায় নির্দ্দোষ। এরূপ নির্দ্দোষ-বাক্য অভ্রান্ত পুরুষ ভিন্ন উক্ত হইতে পারে না। কারণ, সামান্য ও ভ্রান্ত মনুষ্যোক্ত বাক্য হইলে তাহা অভ্রান্ত হইত না। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই অভ্রান্ত নহেন। সুতরাং বাইবেল ঈশ্বরোক্ত বাক্য এবং ঈশা সেই ঈশ্বর।

(১) এ যুক্তি বাইবেলের নিজবাক্য হইতে তাহাকে সত্যরূপে প্রমাণ করিতে চাহে। বাইবেল সত্য কেন? যেহেতু তাহা ঈশ্বর-বাক্য। বাইবেল ঈশ্বর-বাক্য কেন? যেহেতু

তাহা সত্য। সুতরাং এ যুক্তি আত্মাশ্রয় (Arguing in a circle) দোষাশ্রিত।

(২) এ যুক্তির সমস্ত বল বাইবেলের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আজ যদি বাইবেলের কোন অংশ ভ্রান্ত বা দোষাশ্রিত প্রমাণিত হয়, অমনি এ যুক্তির সমস্ত বল বিনষ্ট হইল। বাইবেলকে সত্য বলিয়া যে প্রমাণ করিবে, সে ত ভ্রান্তিশীল মনুষ্য। ভ্রান্ত মনুষ্য কিরূপে অভ্রান্তের প্রমাণ হইতে পারে? যে প্রমাণ করিবে, সেই মনুষ্যের প্রমাণ কি? যদি তাহার *কিছু প্রমাণ থাকে, তবে সেই প্রমাণান্তরের প্রমাণ কি? সুতরাং এস্থলেও অনবস্থা দোষ ঘটে। সেই অভ্রান্ত বাক্যের অভ্রান্ত ব্যাখ্যা কই?

অতএব, বাইবেল স্বতঃ-প্রমাণও নহে। ঈশা আপ্ত ছিলেন কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। উক্ত যুক্তিতে কিরূপ দোষ ঘটিয়াছে তাহাই মাত্র এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

সকল ধর্ম্মেরই যখন স্বতঃ এবং পরতঃ ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, হিন্দুধর্ম্মেরও সেইরূপ প্রমাণ আছে। তবে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান বল তাহার স্বতঃ-প্রমাণ। সেই স্বতঃ-প্রমাণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উক্ত স্বতঃ-প্রমাণ হইতে কিরূপ বিভিন্ন, তাহা আমরা পরে বলিব।



গীতার পরতঃ-প্রমাণ

হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণ বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরতঃপ্রমাণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যঋষি-প্রণীত ভক্তিসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর এই গীতার প্রমাণ-সমস্ত এমত সুন্দররূপে বিচার করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা শুধু যে গীতার প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে এমত নহে, তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মও অনেক দূর সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এ জন্য আমরা বরাবরই সেই প্রমাণ-পরিচয় অগ্রে দিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ-পদ্ধতির বিচার করিব। প্রথমে গীতার পরতঃ-প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বিবিধ বাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বেদব্যাস-কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং গীতা শ্রীকৃষ্ণোক্তিবশতঃ স্বাভাবিক আপ্তবাক্য এবং বেদব্যাস-ঋষি-প্রোক্ত বলিয়া সিদ্ধ আপ্তবাক্য।

শাণ্ডিল্যঋষি ভক্তিসূত্রে ভগবদ্গীতার প্রামাণ্য প্রদর্শন করিবার জন্য এই সূত্র দিয়াছেন :—

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ। ৯।

এই সূত্রের মুখ্যার্থ বিবৃত করিয়া টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ভক্তিশাস্ত্র-প্রধান গীতাকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিলেন :—

'ইদন্তু চিন্ত্যতে ভগবদ্গীতাবাক্যানি ন শব্দবিধয়া বেদবৎ প্রমাণম্। কিন্তু ভারতে স্মৃতিত্বেন। তথা চ কথং শব্দাদিতি নির্দ্দেশঃ। অত্রৈকেঽনুমিতশব্দাদিতি ব্যাচক্ষতে।"

অনেকে বলেন, ভগবদ্গীতা শ্রুতি মধ্যে গণ্য নহে বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। শ্রুতির যেমন সাক্ষাৎ প্রমাণ 'শব্দ',

গীতার তেমন সাক্ষাৎ শাব্দ প্রমাণ নাই। তবে স্মৃতির ন্যায় তাহার গৌণ আনুমানিক প্রমাণ স্বীকার্য্য বটে; যে হেতু তাহা মহাভারতান্তর্গত। স্মৃতি ও পুরাণাদি অনুমান-সিদ্ধ শব্দ, যে হেতু যাহা স্মৃতি ও পুরাণে আছে, তাহা বেদের কোন না কোন স্থানের তাৎপর্য্যার্থ। কিন্তু শব্দই স্মৃত্যাদির প্রমাণ। স্বপ্নেশ্বর গীতাকে শ্রুতিবৎ প্রতিপন্ন করিতে চান। তিনি উক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন ঃ—

"অত্রোচ্যতে অদৃষ্টার্থকভগবদ্বাক্যত্বমেব বেদত্বং তচ্চ গীতাস্বপ্যাবিশিষ্টম্।"

অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্যই বেদ। গীতা তদ্রূপ বাক্য। যেহেতু, গীতা ভগবদ্বাক্য এবং সেই বাক্যের বিষয়-সকলও অদৃষ্টার্থক— লৌকিকজ্ঞানে বা দৃষ্টি-দ্বারা প্রতিপন্ন নহে। অতএব, গীতা বেদবৎ-প্রামাণ্য। তৎপরে তিনি নিজ কথা সমর্থনার্থ ব্যাসবাক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ—

"অতএব, ভগবদ্গীতাসু "নিষৎস্বিতি দৃশ্যতে কেবলং ত এব শ্লোকা ব্যাসেন নিবদ্ধাঃ।"

গীতাবাক্য উপনিষদ্রূপ বলিয়া ব্যাস ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে তাহা উপনিষদ্রূপেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সেই বাক্যসকল শ্লোকাকারে "নিবদ্ধ" (Recorded *) করিয়াছেন মাত্র।

যদি বল, গীতা ব্যতীত ভারত সর্ব্বসাধারণ পাঠ্য; তাহা বলিতে পার না, যেহেতু গীতার শ্লোক-সমূহ ধরিয়াই ভারতের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে।

"তদ্বিহায়েতি চেন্ন লক্ষতাপরিপূর্ত্তেঃ।"

---

* কাউয়েল সাহেব-কৃত শাণ্ডিল্যের ইংরাজী অনুবাদ দেখ। মনু এই অর্থে "নিবদ্ধ"-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

তবেই, স্বপ্নেশ্বর গীতাকে অনেক উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র বলিতে চাহেন। কারণ, এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, স্বপ্নেশ্বর গীতাকে দুই কারণে বেদবাক্য বলেন।

প্রথমতঃ। তাহা ভগবদ্বাক্য। দ্বিতীয়তঃ। তাহা অদৃষ্টার্থক।

আমরা এই দুই বিষয়ই একে একে আলোচনা করিব। এই হেতু এই প্রবন্ধকে ঐ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলাম।

প্রথমতঃ। গীতা ভগবদ্বাক্য। গীতা শ্রীকৃষ্ণোক্তি, এই জন্য তাহা ভগবদ্বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের অবতার, তৎসম্বন্ধে দ্বিবিধ মত হিন্দুশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। (১) পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ—যিনি স্থূলশরীরী ঐতিহাসিক পুরুষ। (২) বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সূক্ষ্মরূপী চিন্ময়ীমূর্ত্তি। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এই দ্বিবিধ মত বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এই দুই মতই এক; কেবল বিভিন্ন অধিকারীর জন্য এই স্বাতন্ত্র্য। স্থূলদর্শী জনগণের নিমিত্ত পুরাণ। এই হেতু বৈদিক মূর্ত্তিকে স্থূলরূপে ব্যক্ত করাই পুরাণের অভিপ্রায়। ব্যাস যে কৌশলে পৌরাণিক অবতার গড়িয়াছেন, তাহা গীতা মধ্যেই নিবেশিত হইয়াছে। ভগবান্ কি প্রয়োজন-সাধন নিমিত্ত কি উপায়াবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই অবতার-তত্ত্বের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা তাহা একে একে প্রদর্শন করিব। ব্যাসের কৌশল এই যে, তিনি এই অবতার-তত্ত্ব মধ্যে বৈদিক শ্রীকৃষ্ণকেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আমরা সে কৌশলও প্রকাশ করিয়া দিব। প্রথমে আমরা ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী পৌরাণিক কৃষ্ণাবতারের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ—যিনি স্থূলশরীরী ঐতিহাসিক পুরুষ।

শাণ্ডিল্যসূত্রানুযায়ী পৌরাণিক কৃষ্ণাবতারের ব্যাখ্যা স্বপ্নেশ্বর এইরূপ দিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন :—

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।'

আমার এবং তোমার, হে অর্জ্জুন, বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।

মনুষ্যের জন্মের সহিত ভগবানের জন্ম যে পৃথক্, তাহা ব্যাস অর্জ্জুনের প্রশ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আপনার মনুষ্যের ন্যায় জন্ম কিরূপে সম্ভবে? আপনি ত মনুষ্যের ন্যায় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের বশীভূত নহেন। কর্ম্মফল ভোগার্থই শরীর। যাহার পূর্ব্বজন্ম নাই, তাহার কর্ম্মফল নাই, সুতরাং তাহার কর্ম্মফলভোগার্থ শরীরও সম্ভবে না। তবে আপনার জন্ম কিরূপে সম্ভব? আপনি ত অজ। এ কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"

আমার জন্ম কর্ম্ম সকলই দিব্য। তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, ভগবানের জন্ম-কর্ম্ম মনুষ্যের ন্যায় নহে, তাহা অলৌকিক। সেই দিব্য জন্ম কিরূপে ঘটে? গীতা বলিতেছেন :—

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"।—৪।৬।

আমি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়া দ্বারা শরীর গ্রহণ করি। শরীর-গ্রহণের উপায়—ঈশ্বরের মায়াশক্তি। সেই মায়াশক্তি দ্বারা ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন, সেই শরীর দিব্য; মানুষ শরীর নহে। যে মায়াশক্তি-বলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহাতে সৃষ্টিবীজ নিহিত, তদ্দ্বারা অমানুষী কায়া-সৃষ্টির অসম্ভাবনা কি? মায়াশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও

লয়ের কারণ। সুতরাং দিব্যশরীর সেই মায়ারই একবিধ আবির্ভাব এবং সেই শরীরের সংহৃতি, সেই শক্তিরই তিরোভাব মাত্র। নারদের প্রতিও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন :—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।"

হে নারদ! এই যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা মায়াময়। এই মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং দিব্য শরীর বলিলে মায়াময় অলৌকিক শরীর বুঝিতে হইবে। এ শরীর ভোগশরীর নহে। মানুষ ভোগশরীরেরই জন্মমৃত্যু আছে; কিন্তু মায়াময় দিব্যশরীরের জন্মমৃত্যু নাই। এই জন্য, ভগবানের এক নাম অজ এবং এই জন্যই তিনি অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন :—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" গীতা—৪।৬।

এক্ষণে কথা এই, পঞ্চভূত-নির্ম্মিত মানুষ শরীর ভিন্ন মায়াময় দিব্য শরীরের সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব? আস্থাপূর্ণ ভক্ত জনগণের নিকট এমত দিব্য শরীর অসম্ভাবিত নহে। পুরাণ যাহাদিগের জন্য সৃষ্ট, তাহাদিগের নিকট স্থূল অবতারবাদ সম্ভবযুক্তিতে প্রামাণ্য। তাহারা ঐতিহাসিক প্রমাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুরাণবাদিগণ দর্শনোক্ত প্রমাণাবলির অতিরিক্ত আর দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই প্রমাণদ্বয় "সম্ভব" ও "ঐতিহ্য"।

"সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।"

এই সম্ভব-যুক্তি-অনুসারে ভগবানের দিব্য শরীর স্থাপনার্থ শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন :—

"তচ্চ দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ।—ভক্তিসূত্র—৪৮।

"এবং এ সমস্তই (ভগবানের জন্ম-কর্ম্ম) দিব্য ; যেহেতু সে সমস্ত তাঁহার স্বশক্তি হইতে সমুদ্ভূত।"

এই সূত্র-অনুসারে ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম উভয়ই দিব্য বলিয়া টীকাকার স্বপ্নেশ্বর তাঁহার অলৌকিকী ক্রিয়া স্থাপন পূর্ব্বক সেই অলৌকিকী ক্রিয়া-হেতু অলৌকিক শরীরও স্থাপন করিয়াছেন।

ভগবানের জন্ম—দিব্য শরীর-পরিগ্রহ। দিব্য কি? যাহা ধর্ম্মা-ধর্ম্ম-জাত তাহাকে কি দিব্য বলিবে? তাহা বলিতে পার না; যেহেতু তিনি ধর্ম্মও করেন নাই, অধর্ম্মও করেন নাই। সুতরাং মনুষ্যের ন্যায় সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট-ভোগ নাই। তবে কি স্বর্গ-জাত বলিয়া দিব্য বলিবে? তাহাও নহে; যেহেতু, তিনি ত এই মর্ত্ত্যধাম ভূলোকেই জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মাদি করিয়াছেন। বরং বলিতে পার যে, ভগবানের শরীর মনুষ্য-শরীরের ন্যায় ভৌতিক উপাদান-সম্ভূত নহে। যাহা পাঞ্চভৌতিক উপাদানে সৃষ্ট নহে, তাহাই অলৌকিক ও দিব্য। যাহা ভৌতিক উপাদানে সম্ভূত নহে, তাহা স্বশক্তি-সম্ভূত বলিয়া দিব্য। মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক শরীরই ভোগ-শরীর। এরূপ ভোগ-শরীর সম্ভাবিত না হইলে, ভগবানের শরীরকে শরীর বলিবে কি প্রকারে? ভোগায়তন-শরীর ভিন্ন কি সূক্ষ্ম শক্তিময় শরীর সম্ভাবিত নহে? সম্ভাবিত বৈ কি। কি প্রকারে সম্ভাবিত, তাহা বলিতেছি।

ভোগায়তন-শরীর ইন্দ্রিয়াদি-বিরচিত। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান হইতে সংকল্পাত্মিকা ইচ্ছা বা প্রযত্ন সম্ভূত হয়। সেই প্রযত্ন হইতে সংকল্পিত কর্ম্মের চেষ্টা হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণদ্বারা চেষ্টা সাধ্য হয়। চেষ্টা হইতে ক্রিয়া সম্ভূত হইলেই ভোগ হয়।

সুতরাং প্রযত্নের (Volition) আশ্রয়স্থান জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি। চেষ্টার (Effort) আশ্রয়-স্থান হস্তপদাদি এবং ক্রিয়ার (**Action**) আশ্রয়-স্থান শরীর। যদি ক্রিয়ার আশ্রয়-স্থান শরীর হয়, তবে দিব্য শরীর হইবার বাধা কি? যদি দিব্য ক্রিয়া সম্ভাবিত হয়, তবে দিব্য শরীর সম্ভাবিত হইবে না কেন? যাঁহার দিব্য ক্রিয়া স্বীকার্য্য; তাঁহার দিব্য শরীরও স্বীকার্য্য। তবে দিব্য ক্রিয়া কি? ঈশ্বরের ক্রিয়া দিব্য ক্রিয়া কিরূপে?

ক্রিয়া মাত্রই চেষ্টাকৃত নহে। যেহেতু ক্রিয়া অনেক প্রকার আছে। চেষ্টা এক প্রকার ক্রিয়া মাত্র। এ কথার প্রমাণ কি? শরীরেরই যে চেষ্টা আছে, আর কিছুর চেষ্টা নাই, এ কথা স্বীকার্য্য নহে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে ত আর ভোগ থাকে না। সুতরাং মৃত শরীর ভোগায়তন নহে। কিন্তু মৃত শরীরে কি কখন চেষ্টা দৃষ্ট হয় না? মৃতশরীরের কখন কখন চেষ্টা দৃষ্ট হয় বলিয়া লোকে তাহা প্রেতাশ্রিত বলে। সেই প্রেতাশ্রিত শব্দের অর্থই দিব্য শরীর-চেষ্টা। মনুষ্য মরিবামাত্রই মৃত শরীরের ক্ষণকালের চেষ্টা কি ইচ্ছাকৃত চেষ্টা? অতএব ভোগায়তন-শরীর ভিন্ন দিব্য শক্তিময় শরীরের চেষ্টা সম্ভব।

আর এক কথা এই যে, মৃত শরীরের কি অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া সম্ভাবিত নহে? মৃত শরীরের লয়সাধন হয় কি প্রকারে? লয়সাধন ক্রিয়াও কি ক্রিয়া নহে? যদি ক্রিয়া হয়, তবে তাহা কি ভোগায়তন-শরীর-আশ্রয়ভূত ক্রিয়া? না শাক্ত শরীরের ক্রিয়া? ক্রিয়ামাত্রই তবে চেষ্টাকৃত নহে। চেষ্টা ভিন্নও শারীরিক ক্রিয়া আছে। চেষ্টা ভিন্ন যদি কোন প্রকার শারীরিক ক্রিয়া সম্ভাবিত হয়, তবে সেই ক্রিয়াকে শাক্ত বা দিব্য ক্রিয়া বলিবার হানি কি? যদি দিব্য ক্রিয়া সম্ভাবিত হয়, তবে দিব্য শরীর সম্ভাবিত নহে কেন?

এ ত গেল চেষ্টা ভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনার কথা। অন্য কথা এই যে, সকল চেষ্টাই কি সাক্ষাৎ প্রযত্ন বা ইচ্ছাকৃত? এমত চেষ্টা কি নাই, যাহা ভোগায়তন শরীরের সাক্ষাৎ প্রযত্ন-ব্যতীত সম্ভূত হইতেছে? যখন ভাঁটা গড়াইয়া দাও, তখন ভূমিতে পড়িয়া সেই ভাঁটার নানাবিধ বক্রগতি কি তোমার সাক্ষাৎ, না সেই ভাঁটার সাক্ষাৎ প্রযত্ন-সম্ভূত? যখন ঘটে অন্ন সিদ্ধ হইতেছে, তখন সে অন্নকে কে চেষ্টা করিয়া সিদ্ধ করিতেছে? তুমি কেবল অন্নপাকের আয়োজন মাত্র করিয়া সরিয়া বসিয়াছ। ঘটে অন্ন কি আপনি সিদ্ধ হইতেছে? সেই সিদ্ধ-ক্রিয়া, ক্রিয়ার প্রবাহ। সিদ্ধ করিবার চেষ্টা না থাকিলে ক্রিয়ার প্রবাহ আসিবে কোথা হইতে? ঘট কি ইচ্ছাবশতঃ চেষ্টা করিতেছে? অতএব, ভোগ-শরীরের সাক্ষাৎ প্রযত্ন-ব্যতীতও চেষ্টা সম্ভব হইতে পারে। যখন এইরূপ চেষ্টা সম্ভাবিত হয়, তখন সে চেষ্টা কোন্ শরীরাশ্রিত? তাহা কি দিব্য বা শাক্ত শরীরের প্রযত্নজ চেষ্টা নহে? সুতরাং ঈশ্বরের শরীর ভৌতিক নহে, অথচ চেষ্টাবান। এই চেষ্টা অলৌকিক এবং দিব্য ইচ্ছা বা প্রযত্ন-সম্ভূত। যাঁহার দিব্য ইচ্ছা আছে, তাঁহার সেই ইচ্ছা বা প্রযত্ন-হেতু দিব্য প্রয়োজন-সাধন-জন্য দিব্য শরীর-পরিগ্রহ সম্ভাবিত না হইবে কেন? অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, ভগবানের ক্রিয়াদি অলৌকিক বা দিব্য; তজ্জন্য তাঁহার ইচ্ছাও অলৌকিক বা দিব্য এবং সেই ইচ্ছা-হেতু তাঁহার দিব্য অলৌকিক শরীর-পরিগ্রহও সম্ভাবিত।

একথায় একটি আপত্তি হইতে পারে। যদি ঈশ্বরের দিব্য শরীর সম্ভব হয়, তবে কি দর্শনশাস্ত্রে যে তত্ত্ব-সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা? বেদান্ত-মতে তত্ত্ব-সমুদায় ছাব্বিশটি, কিন্তু ভগবানের দিব্য

শরীর স্থাপিত হইলে সেই সংখ্যা আরও একাধিক বা সাতাইশটি করা ত আবশ্যক? সে সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বর বলেন :—

"ন চ তত্ত্বাধিক্যং তচ্ছরীরস্য ব্রহ্মাণ্ডানুপাদানতয়া ঘটাদিবদতত্ত্বভাবাৎ ইন্দ্রিয়াপ্রকৃতিত্বাচ্চ।"

এই দিব্য শরীর বেদান্ত-নির্ণীত ষড়্‌বিংশতত্ত্বের অতীত পদার্থ নহে। যে হেতু এই শরীর কিছুরই বিবর্ত্ত বা পরিণাম নহে, কোন বাহ্য পদার্থেরও উপাদান-কারণ নহে এবং কোন ইন্দ্রিয়েরও উপাদান নহে। তাহা সেই ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের অন্তর্গত চিত্তেরই সাক্ষাৎ মায়া-সম্ভূত। স্থতরাং তাহা তত্ত্বসংখ্যার অতীত নহে।

ঈশ্বরের শরীর যেন দিব্য হইল, কিন্তু যখন ভগবান্ পূর্ণকাম এবং সেই অর্থে বিভু নামে খ্যাত, তখন তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন (motive) কি? যাঁহার প্রয়োজন নাই, তাঁহার কর্ম্মও নাই। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন আছে বৈ কি? সে প্রয়োজন গীতায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তিনি শুদ্ধ ভক্তজনগণের পরিত্রাণার্থ এবং দুষ্কৃতজনগণের বিনাশার্থ মায়াশক্তিতে অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং তাঁহার দিব্যকর্ম্ম বিশুদ্ধ মায়ার সাত্ত্বিককরুণাবশতঃ সমুৎপন্ন। এ জন্য শাণ্ডিল্য-ঋষি বলিলেন :—

"মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্।"—৪৯ সূত্র।

তিনি মুখ্যকারুণ্য-হেতু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই কারুণ্য সাত্ত্বিক ও অলৌকিক। জীব-লোকে আমরা যে করুণা-প্রবৃত্তি দেখিতে পাই, তাহাতে কামনার অংশ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু কেবল ভগবানের কোন ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষ নাই। মনুষ্য হয় ত

পুণ্য-উপার্জ্জনার্থ, না হয় পরোপকার দ্বারা নিজ প্রকৃতিকে উন্নত করিবার জন্য দয়াধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভগবানের তদ্রূপ কোন ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায় হইতে পারে না। যদি নিঃস্বার্থ কারুণ্য-ব্যবহার কিছু সম্ভব হয়, তবে তাহা এই ভগবানের করুণা। এ কারণ, এই করুণাকে অলৌকিক ও প্রকৃত সাত্ত্বিক করুণা বলে। সামান্য মানুষে এ প্রকার করুণার দৃষ্টান্ত সম্ভবে না।

মনুষ্যের কারুণ্য-ব্যবহার অন্য এক কারণহেতুও সমুৎপন্ন হয়। অনেক মনুষ্যকে দেখা যায়, তাহারা স্বভাবতই করুণাশীল, অপর কতিপয় মনুষ্য স্বভাবতই নির্দ্দয়-প্রকৃতি। এই যে স্বভাবের বিশেষ প্রবণতা, তাহা কেবল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-হেতু। কিন্তু ভগবানের করুণা সেরূপ কর্ম্মফল বা অদৃষ্টের অপেক্ষা করে না। তবেই মানুষের করুণা দুই কারণে গৌণ।

(১) সে কারুণ্য-ব্যবহারে ইষ্টসিদ্ধি আছে বলিয়া তাহা অন্য নিমিত্তের কারণ; এ জন্য গৌণ।

(২) তাহা পূর্ব্বজন্মের ফলাফলরূপ অদৃষ্টকে অপেক্ষা করে বলিয়া গৌণ।

কেবল ভগবানের কারুণ্য-ব্যবহারকেই মুখ্য করুণা বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিশুদ্ধ ও অলৌকিক করুণা হেতু যে কর্ম্ম প্রণোদিত হয়, তাহাই দিব্যকর্ম্ম। সুতরাং

ভগবানের শরীর দিব্য, তাঁহার কর্ম্মাদি দিব্য,
তাঁহার কারুণ্য-ব্যবহার দিব্য, তাঁহার প্রয়োজনমূলক ইচ্ছাও দিব্য।

কিন্তু সর্ব্ববিধ অবতারেই কি এই দিব্যত্ব ও অলৌকিকত্ব আছে? জীব মাত্রই ত ব্রহ্মাংশ। যাহার শরীর: প্রাকৃত ও কর্ম্মফলহেতু, তাহার কিছুই দিব্য ও অলৌকিক নহে। কেবল যখন ভগবান্

"আপনাকে সৃষ্টি করেন" যখন 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' হয়, তখনই কেবল "সম্ভবামি যুগে যুগে" ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবানের অবতার, বেদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং "সৃজাম্যহমে"র প্রমাণ ও প্রত্যভিজ্ঞান-বেদবাক্য। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।"

——অথর্ব্বশির উপনিষদে ষষ্ঠদশকে নবম বাক্য।

নারায়ণোপনিষদেও বাসুদেবের অবতার-বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রমাণ আছে। শুদ্ধ যে বিষ্ণুপুরাণে প্রমাণ আছে :—

"যদুবংশে পরব্রহ্ম নরাকৃতি বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন"—৪র্থ অংশ ১১ অধ্যায়।

এমত নহে, শ্রুতিও তাহার প্রত্যভিজ্ঞান। এ জন্য শাণ্ডিল্য বলিলেন—"প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ।"

স্মৃতি এবং পুরাণের প্রমাণ ব্যতীত শ্রুতির প্রমাণ-দ্বারাও বাসুদেবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। গীতা আরও বলিতেছেন :—

"রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি"—১০ অ ২৩ শ্লোক।

এবং পুরাণে কথিত হইয়াছে :—

"বিষ্ণুরুদ্রান্তরং শ্রিয়াদযঃ শ্রীগৌর্য্যন্তরং তথা।
তদ্‌ভ্রান্তিকস্য মূর্খস্য বাক্যং শাস্ত্রবিগর্হিতম্॥"

——স্কন্দপুবাণ। কাশীখণ্ড। পূর্ব্বভাগ, অং ২৭ শ্লো-১৮১

যাহারা বিষ্ণু ও রুদ্রের এবং শ্রী ও গৌরীর প্রভেদ জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ; তাহাদের বাক্য সর্ব্বদা শাস্ত্র-বিগর্হিত।

বেদোক্ত দেবদেবীর উক্তি-সমস্ত গীতা এইরূপ সম্ভব-যুক্তি দ্বারা সাধারণ জনগণের আদরণীয় করিয়াছেন। অবতার-তত্ত্বের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রকাশ করিয়া গীতা পরে তাহার ফলাফল বর্ণন করিয়াছেন। স্থূলদর্শী জনগণের ভক্তি-উদ্রেকের নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের এই

পৌরাণিক সৃষ্টি। কারণ, সামান্য জনগণ এক বিশেষ কালে, এক বিশেষ দেশে এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে স্থূলরূপে ভাবিতে বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ভাবনার ফল ভক্তি। অতএব, পৌরাণিক স্থূল অবতার-তত্ত্বের সৃষ্টি কেবল ভক্তি-উদ্রেকের জন্য। তাই গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"—৪।৯।

আমার দিব্য জন্ম-কর্ম্ম জানিলে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। ভগবানের দিব্য জন্ম-কর্ম্ম জানিলে মোক্ষ লাভ হইবে কি প্রকারে? শাণ্ডিল্য বলেন, তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হয় না। তবে কি হয়? সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয়। সাক্ষাৎ ভগবানের রূপ এবং তাঁহার অলৌকিক জন্ম-কর্ম্মাদি স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি-উদ্রেকের কারণ। ভক্তি হইতে ক্রমে মনোমালিন্য নিরাকৃত হইয়া চিত্তশুদ্ধি জন্মে। চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানাধিকারের উপায়। জ্ঞানাধিকার না হইলে মুক্তিপথে যাওয়া যায় না। এইরূপে অবতার-তত্ত্বজ্ঞান গৌণরূপে মুক্তির উপায়।

পুরাণান্তর্গত গীতোক্ত স্থূল অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা স্বপ্নেশ্বর এইরূপ দিয়াছেন। পুরাণ বেদেরই বিস্তৃতি মাত্র। সুতরাং পুরাণের প্রমাণ বেদমূলক ঋষিবাক্য। অধ্যাত্ম-জগতের যে সমস্ত নিত্য নিয়ম বেদের প্রতিপাদ্য, পুরাণ তাহারই স্থূল ব্যাখ্যা। যেমন সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক ভাবের স্থূল দেহ দেবদেবী, পুরাণ বেদের তেমনি স্থূল শরীর। এ জন্য বেদের প্রমাণ যাহা, পুরাণেরও প্রমাণ তাহা। তদ্ব্যতীত পুরাণের প্রমাণ ঋষিবাক্য। ঋষিবাক্যের প্রতি সাধারণ জনগণের বিশেষ আস্থা। গীতাও সেই কথা বলিতেছেন ঃ—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥—৩—২১।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অপরাপর সামান্য ব্যক্তি তাহা তাহা করে, এবং সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্য রূপে অবধারণ করেন, অন্য ব্যক্তিগণ তাহারই অনুসরণ করে।"

সামান্যবুদ্ধি স্থূলদর্শী লোকের নিকট ঐতিহাসিক পরতঃ-প্রমাণই স্বীকার্য্য। গীতার স্থূল অবতারবাদ পরতঃ এবং ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতিপন্ন। সম্ভবযুক্তি এই পরতঃ-প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত করে। সম্ভবযুক্তি শুদ্ধ যে স্থূল অবতারবাদের পক্ষ কক্ষীকৃত করে এমত নহে, এই যুক্তির উপর সাধারণ জনগণের অনেক ধর্ম্মতত্ত্বের আস্থা স্থাপিত আছে। এই সম্ভবযুক্তি-বলেই তাহারা ঋষিপ্রোক্ত আত্মা ও পরলোকাদির সত্তা এবং স্বরূপতত্ত্ব-সকল গ্রহণ করিয়াছে। যে প্রমাণে ধর্ম্মের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই প্রমাণে স্থূল অবতারবাদও সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সম্ভবযুক্তি এবং পরতঃ-প্রমাণ ব্যতীত সূক্ষ্মদর্শিগণের নিকট ধর্ম্মের অলৌকিক তত্ত্বসমূহের অন্য এক প্রমাণ আছে। তদ্দ্বারা সেই তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-ব্যাপার। যে স্থূল অবতারবাদ পরোক্ষবাদীর নিকট সম্ভবযুক্তিতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব, তাহা সূক্ষ্মদর্শী অলৌকিক প্রত্যক্ষ-বাদীর নিকট নিত্য সত্য ও প্রত্যক্ষানুভূতি। এই প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্মরূপী চিন্ময়ীমূর্ত্তি। এই বৈদিক শ্রীকৃষ্ণও গীতার স্থূল অবতারতত্ত্ব-মধ্যে নিহিত আছেন। এ জন্য স্বপ্নেশ্বরের মতে গীতা যেরূপ ভগবদ্বাক্য, তাহা সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণও অনুভব করেন।

পরোক্ষবাদিগণের বিশ্বাস—ভগবান্ যুগাবতাররূপে স্থূল কায়া

ধারণ করিয়া গীতাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং গীতা ভগবদ্বাক্য বলিয়া সত্য। যাঁহারা এ যুক্তিতে পরিতুষ্ট, তাঁহাদের নিকট গীতার প্রমাণ অকাট্য। গীতা এই স্থূলদর্শী লোক-মণ্ডলীর নিকট যেমন অকাট্য যুক্তিতে প্রামাণ্য; সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট গীতা তদধিক অকাট্য প্রমাণে অবস্থিত। গীতা নিজেই এই দ্বিবিধ প্রমাণের পরিচায়ক। শ্রীধর স্বামী গীতার অব-তারবাদের মধ্যে কেমন বৈদিক চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা আমরা পরে দেখাইব।



হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরতঃ-প্রমাণ যেরূপ যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। গীতোক্ত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ, এ জন্য স্বপ্নেশ্বর যাহা গীতার পরতঃ-প্রমাণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মেও সম্যক্ প্রযুক্ত হয়। হিন্দুশাস্ত্রের অপর দেশে পরতঃ-প্রমাণের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা স্বপ্নেশ্বরের যুক্তিপথই পরিস্থাপিত হইয়াছে। আমরা সেই পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

"পরাশর কহিলেন—ইন্দ্র গমন করিলে পর গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিনা-ক্লেশে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতি-সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে ও গোগণকে এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন। আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ম্ম—এ সকল কি, হে তাত, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন, প্রলম্বাসুরকেও বধ করিয়াছেন, আবার আজ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইতেছে। হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার বীর্য্য অবলোকন করিয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদয় দেবগণও একত্র হইলে এ কর্ম্ম করিতে পারেন না। হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালত্বে, এই অতিবীর্য্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এ সকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি।"—বিষ্ণুপুরাণ। –৫ম অংশ। ১৩ অধ্যায়।

অন্যত্র:—"তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইত্যাদি হঠাৎ

তিরস্কার-ভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-কালে যখন অনুপস্থিত তোমাকে বা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিযাছি, আমি অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"—গীতা, ১১ অঃ ৪১।৪২ শ্লোক।

স্থানান্তরেঃ—মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত উতঙ্কো-পাখ্যানে প্রকাশ যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন-কালে উতঙ্ক মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মুনি কুরুপাণ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যখন কুরুবংশের ধ্বংসের কথা শুনিলেন এবং বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংহার নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও নিবারণ করেন নাই, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে শাপোদ্যত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-পরিচয়ার্থ নিজ বিশ্ব-রূপ ধারণ করিলেন। উতঙ্ক সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং শাপ হইতে নিরস্ত হইলেন।

অতএব পুরাণেই প্রতিপন্ন যে, অদ্ভুত লীলা খৃষ্টানের ন্যায় হিন্দুর নিকটও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। এই প্রামাণ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব পুরাণে স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণোক্ত বাক্য-সকল প্রামাণ্য।

এইরূপ পরতঃ-প্রমাণ হিন্দুধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সেই ধর্ম্মের চূড়ান্ত প্রামাণ্য নহে। সাধারণ জনগণের জন্য এই প্রমাণ ব্যবস্থিত। নৈয়ায়িকেরা বেদের পৌরুষেয়বাদ স্থাপনার্থ যে তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের এই পরতঃ-প্রমাণ আরও বললাভ করিয়াছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন :—

"যদি বল ঈশ্বরের শরীর নাই। সুতরাং তালু প্রভৃতি স্থানের অভাব বশতঃ বর্ণোচ্চারণ সম্ভব না হওয়াতে, বেদের প্রণয়ন কিরূপে ঘটিতে পারে? এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, স্বভাবতঃ শরীর-হীন হইলেও তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণার্থ লীলা-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

জৈমিনি নৈয়ায়িকদের বিপক্ষে যাহাই বলুন না কেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অবতারবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা তত যুক্তি-দ্বারা পরিচালিত নহেন। তবু তাঁহাদেরও কিছুই যুক্তি নাই, এমত নহে। সে যুক্তি এই :—

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমানের স্বেচ্ছানুমত কার্য্য করিবার বাধা নাই। পৃথিবীর পাপ-ভার মোচনের জন্য তিনি দেহ-পরিগ্রহ করিয়া অমানুষী ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা সেই ভার মোচন করেন। যাহা মানুষে সম্ভব নহে, তাহা সর্ব্বশক্তিমানে সম্ভব।

এ যুক্তি যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল বটে, কিন্তু সাধারণ জনগণ এই যুক্তিতে পরিচালিত। খৃষ্টানগণও এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঈশার অবতরণ ও অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের সমর্থন করেন। নিম্নাধিকারী হিন্দু এবং খৃষ্টানের যুক্তি বা বিশ্বাস যাহাই হউক, খৃষ্টীয় অবতারবাদের সহিত হিন্দু-অবতারবাদের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। খৃষ্টানের ঈশ্বরাবতার পৃথিবীতে আপ্তবাক্য দিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মে সেরূপ ঘটে নাই। সনাতন ধর্ম্মে আপ্তবাক্যের অভাব কোন কালেই ছিল না। কারণ, হিন্দুর আপ্তবাক্য যে শ্রুতি, তাহা চিরকালই ছিল এবং এক্ষণেও আছে। তবে হিন্দু-ধর্ম্মে অবতারের প্রয়োজন কি? সনাতন ধর্ম্মে ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—৪।৭।৮।

এই উক্তি-অনুসারে প্রতীত হয় যে, যখন যখন জনসমাজে

ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, জনসমাজ অধর্ম্মাচারের পীড়নে বিকম্পিত হইয়াছিল, তখনই জগতের ভার-মোচনার্থ হিন্দু অবতারগণ উদয় হইয়াছিলেন। উদয় হইয়া নিপীড়নকারী অধর্ম্মাচারীর বিনাশ সাধন পূর্ব্বক সাধুদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের পুণ্য-পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত জন-সমাজের হিতার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শুদ্ধ যে এইরূপ পাপ-ভার-মোচনার্থ তাঁহাদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল এমত নহে, গীতা বলিয়াছেন, অন্য এক বিশেষ প্রয়োজন-সাধন নিমিত্ত ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বিশিষ্ট প্রয়োজন—ধর্ম্মসংস্থাপন। যখন যখন ভারতীয় পুণ্য-ভূমিতে বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তখন তখনই ঈশ্বর মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া সেই ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ উক্ত বাক্যাবলি বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন ঃ--

"এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ! ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥—৪ অঃ ২।৩।

"হে পরন্তপ! এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অবগত হ'ন। কিন্তু কালবশে সেই যোগ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তজ্জন্য আমি তোমাকে অদ্য সেই পুরাতন যোগ উপদেশ দিলাম। যেহেতু ইহা অতি উত্তম এবং ইহার তত্ত্ব অতি গূঢ়।"

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে অসুরগণের বধার্থ উদয় হইয়াছিলেন এমত নহে, তিনি বিলুপ্ত-প্রায় মোক্ষসাধক বৈদিক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-পথেরও উদ্ধার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তেমনি এককালে যখন সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত নিরীশ্বরবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-গ্রহণাভাবে

জনসমাজ কেবল নাস্তিকতায় পূর্ণ হইয়াছিল, তখন বুদ্ধদেব উদয় হইয়া প্রকৃত সাংখ্য-ধর্ম্মের জ্ঞান-যোগপথ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। আবার যখন সেই বুদ্ধদেব-প্রচারিত মুক্তিসাধন-পথের প্রকৃত তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বৌদ্ধগণ বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারে ভারত পূর্ণ করিতেছিলেন, তখন সেই বৌদ্ধগণের প্রলয়-স্বরূপ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য উদিত হইয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালেও যখন তান্ত্রিক বামাচারে বঙ্গধাম কেবল পাপ-পূর্ণ হইতেছিল, তখন শ্রীচৈতন্যদেব উদয় হইয়া পরম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই অবতারগণ কেহই কোন নবধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন না; সকলেই পুরাতন বৈদিক ধর্ম্মকেই পুনঃ স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। পুরাণ ও ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। সুতরাং এই অবতারগণ বারংবার উদিত হইয়া যে বৈদিক ধর্ম্মকে পুনঃ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর চক্ষে সেই ধর্ম্মের প্রমাণ বড় সামান্য নহে। অন্য কোন ধর্ম্মীয় আপ্তবাক্যের যদি এরূপ প্রামাণ্য থাকিত, তাহা হইলে আজি সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীতে ডঙ্কা মারিয়া বেড়াইতেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশা-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, এ জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সত্যতা-প্রমাণার্থ ঈশার ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল। অনেক উৎপন্ন ধর্ম্মেরই এইরূপ নিয়ম। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মে এরূপ ঘটে নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্ম যে বেদ হইতে উৎপন্ন, তাহা কোন মনুষ্য-কর্ত্তৃক কৃত নহে। তবে বলিতে পার, বৈদিক ঋষিগণ কি? বেদে যে ঋষিগণের ধ্বনি আছে, মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, সে সকল নামের আধ্যাত্মিক অর্থ আছে।

তিনি সেইরূপ অর্থও প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন *। সেইরূপ অর্থ-পূর্ণ নামধারী ঋষিগণ বৈদিক গুরু বা প্রচারকরূপে এক এক বৈদিক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা মাত্র। পাণিনির অনুশাসনে প্রকাশিত যে, বৈদিক ঋষি-কর্ত্তৃক বেদ উক্ত এবং উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র—এইরূপ সমাখ্যাই দৃষ্ট হয়; তাঁহারা যে বেদের কর্ত্তা ছিলেন, এমত বাক্য কোথাও নাই। নহিলে বেদ চিরকালই শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার কর্ত্তা কেহই নাই। কর্ত্তা না থাকাতে, কর্ত্তার ঈশ্বরত্বও স্থাপন করা আবশ্যক হয় নাই। তবে বেদ-বাক্যের সত্যতা কিরূপ প্রমাণে সিদ্ধ হইয়াছে? সে প্রমাণ পরে আলোচিত হইবে।

জ্ঞানিগণের নিকট অপৌরুষেয় বেদ যে প্রমাণে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য, পুরাণোক্ত অবতারবাদ এবং দেবলীলা সমুদায়ও সেই প্রমাণেই প্রামাণ্য ও সত্য। কারণ, পুরাণাদি বৈদিক সূক্ষ্মতত্ত্ব-সমুদায়ের স্থূলরূপ ও বিরাটাকার মাত্র। সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব-সকল স্থূলাবয়ব ধারণ করিয়া স্থূলবুদ্ধি, সামান্য জনগণের বিশ্বাসের ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়াতে তাহাদের নিকট সেই স্থূলাবয়ব অবতারগণ এবং তাঁহাদের লীলাদি বরং অটল ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছে। সূক্ষ্মতত্ত্ব-সকল সূক্ষ্মাকারে থাকিলে সামান্য জনগণের গ্রহণীয় হইবে কেন? তাই তাহাদের স্থূলরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকার দ্বিবিধ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্মীয় ঈশ্বরাবতারগণ এবং পুরাণাদির বিবরণ কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, উভয়েরই নিকট প্রামাণ্য হইয়াছে। এরূপ প্রমাণ কি খৃষ্টীয় প্রভৃতি উৎপন্ন

---

* ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-স্থলে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় এ কথার আলোচনা করিয়া ভগবান্ জৈমিনির মীমাংসা প্রদর্শন করিয়াছেন। জৈঃ সূঃ পা ১। সূ ৫ শবর মুনির ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মাদির আছে? সুতরাং সে সমস্ত ধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণ হইতে হিন্দুধর্ম্মীয় পরতঃ-প্রমাণের বিস্তর প্রভেদ।

অতএব, এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে অদ্ভুত লীলা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ, হিন্দুধর্ম্মে তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মে লীলার প্রমাণ ঈশ্বর। স্থূলদর্শী হিন্দু অগ্রে শাস্ত্র-প্রমাণ স্বীকার করে যে, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবাবতার; তার পর কাজেই স্বীকার্য্য যে, তাঁহাদের লীলা-সকল দেবলীলা বলিয়া অদ্ভুত এবং অলৌকিক।

অনেক স্থূলদর্শী হিন্দু আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মত ইহার বিপরীত পক্ষও অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন যে, অদ্ভুত এবং অলৌকিক লীলা করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরাবতার।

তীক্ষ্ণ দার্শনিক বলেন, এ প্রত্যয় যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি এক মুখে বলিতেছ যে, অদ্ভুত লীলা-জন্য শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরাবতার। আবার সেই মুখেই বলিতেছ—শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরাবতার বলিয়া অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন। তবেই, একবার কারণের প্রমাণ কার্য্য হইল, আবার কার্য্যের প্রমাণ কারণ হইল। কারণ-রূপ শ্রীকৃষ্ণাদি কার্য্য-রূপ লীলাদির প্রমাণ; আবার কার্য্য-রূপ লীলাদি, কারণ-রূপ শ্রীকৃষ্ণাদির ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। এ যুক্তি পরস্পরাশ্রয়-দোষাশ্রিত; এ জন্য অগ্রাহ্য। অবতার-তত্ত্বের অন্য প্রমাণ আছে। সে প্রমাণের পরিচয় আমরা দিয়াছি।

পণ্ডিতগণের কাছে পরতঃ-প্রমাণ অগ্রাহ্য হউক না কেন, সাধারণ জনগণ তত বুঝেন না। সাধারণ জনগণের নিকট ঠিক এই যুক্তিপথ ধৃত হয় নাই। সাধারণ জনগণের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস করেন যে, রাম-কৃষ্ণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ ও মহাজনোক্ত ঈশ্বরাবতার বলিয়াই তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অদ্ভুত ও অলৌকিক দেবলীলা,

তাহারা অপর পক্ষ অবলম্বন করেন না। তাহারাই আবার ঘুরিয়া বলেন না যে, অদ্ভুত লীলাকারী বলিয়া রামাদি ঈশ্বরাবতার। সে পক্ষ অন্য দলের আশ্রয়ভূমি। তাহারা এই লীলাসমুদায় যে প্রকৃত-পক্ষে ঘটিয়াছিল, এ কথা বিনা ঐতিহাসিক প্রমাণে বিশ্বাস করেন। পুরাণ মহাজনোক্তি বলিয়া বিশ্বাস্য; সুতরাং সেই বিশ্বাসহেতু কাজে কাজেই স্বীকার করেন যে, সেই লীলাকারী দেবগণ ঈশ্বরাবতার। যাহারা এ যুক্তি ও বিশ্বাস অবলম্বন করেন, তাহারা অপর পক্ষের প্রতি বড় দৃষ্টিপাত করেন না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণ কেমন দোষাশ্রিত ও দুর্ব্বল, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যদি দুর্ব্বল ও অসিদ্ধ না হইত, তবে সেই প্রমাণই যথেষ্ট হইত। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়াই সেই ধর্ম্মের স্বতঃ-প্রমাণ আবশ্যক হইয়াছে। স্বতঃ-প্রমাণ থাকাতেই পরতঃ-প্রমাণের অকৃতকার্য্যতা সপ্রমাণ হইতেছে। যদি বল, তাহা নাও হইতে পারে, ঐ উভয়বিধ প্রমাণ-দ্বারা সেই ধর্ম্মের প্রমাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে; তাহা হইলেও দাঁড়াইল কি? দাঁড়াইল, ঐ উভয়বিধ প্রমাণের প্রতি প্রমাণই নিজে নিজে অসম্পূর্ণ, তাই পরস্পর সহায়তায় দণ্ডায়মান হইয়াছে। সুতরাং উহার স্বতঃ-প্রমাণও দুর্ব্বল। যাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রমাণ-সম্বন্ধে উক্ত হইল, তাহা অপরাপর উৎপন্ন ও আধুনিক ধর্ম্ম, যাহাদিগের প্রমাণ-পরিচয় আছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রমাণ-সম্বন্ধেও উক্ত হইতে পারে।

বলিতে পার, সনাতন ধর্ম্মেরও ত পরতঃ এবং স্বতঃ ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ-পরিচয় আছে; তবে সেই প্রমাণ-সম্বন্ধেও উক্ত আপত্তি খাটিতে পারে। কিন্তু তাহা খাটিতে পারে না; যে হেতু সনাতন ধর্ম্মের প্রমাণ নামমাত্র দ্বিবিধ; নহিলে বলিতে গেলে,

স্বতঃ-প্রমাণই উহার একমাত্র প্রমাণ। স্বতঃ-প্রমাণের স্থূল অবয়বই পরতঃ-প্রমাণ। হিন্দু জ্ঞানিগণের নিকট কি স্বতঃ কি পরতঃ—উভয়ই সমান। তাঁহারা পরতঃ-প্রমাণকে স্বতঃ-প্রমাণের রূপান্তর বলিয়াই গ্রহণ করেন। তাঁহারাই নিম্নাধিকারী জনগণের জন্য স্বতঃ-প্রমাণকে সেই প্রকার রূপান্তরিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নহিলে, উহাদিগের নিকট স্বতঃ-প্রমাণের সূক্ষ্ম কথা গ্রহণীয় হইবে কেন? উহাদিগের স্থূলবুদ্ধিতে স্থূলকথাই গ্রহণীয়। এ জন্য সনাতন ধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণের প্রয়োজন। সেই স্বতঃ-প্রমাণের পরিচয় আমরা পরে দিতেছি। সেই পরিচয়ে প্রতীত হইবে যে, স্বতঃ-প্রমাণই সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ এবং সেই প্রমাণই যথেষ্ট।

যে কারণে স্বতঃ-প্রমাণ হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ, সেই কারণে পরতঃ-প্রমাণও একমাত্র প্রমাণ। উচ্চাধিকারী জনগণের পক্ষে যেমন স্বতঃ-প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ, তেমনি নিম্নাধিকারী জনগণের পক্ষে পরতঃ-প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। খৃষ্টীয় প্রভৃতি উৎপন্ন ধর্ম্মে অধিকারভেদ স্বীকৃত নাই; এ জন্য উৎপন্ন ধর্ম্মমাত্রেরই স্বতঃ এবং পরতঃ প্রমাণ সেই ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সেই প্রমাণদ্বয় উচ্চাধিকারী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সংশয়ী জনগণের পক্ষে এত দুর্ব্বলযুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ, যাহা অজ্ঞানিগণের পক্ষে খাটে, তাহা জ্ঞানিগণের পক্ষে খাটে না। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের রীতি স্বতন্ত্র। এ ধর্ম্মে অজ্ঞ জনগণের জন্য স্বতন্ত্র শাস্ত্রের ও ধর্ম্ম-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই শাস্ত্রের ও ধর্ম্ম-পদ্ধতির সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণেরও সৃষ্টি হইয়াছে। যে নিম্নাধিকারী জনগণের জন্য বৈদিক অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি ও পুরাণ-তন্ত্রাদির সৃষ্টি, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি

ও বিশ্বাস-সম্পন্ন জনগণের জন্য প্রমাণ-পদ্ধতিকেও সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। যাহাদিগের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্মের প্রবৃত্তিমূলক নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি, তাহাদিগেরই নিমিত্ত সেই ধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণের বিশাল সৃষ্টিস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের স্থূল দেবদেবী এবং অবতারগণের সৃষ্টি। এই সমস্ত অবতার এবং উহাদের লীলা ঐতিহাসিক ব্যাপার বটে, কিন্তু নিম্নাধিকারী জনগণের নিকট সেই ইতিহাসের প্রমাণান্তর—শ্রদ্ধের ঋষিবাক্য; সেই ঋষিবাক্য আবার সম্ভব-যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঋষিরা অযৌক্তিক কিছু বলেন নাই। তাই এই সম্ভবযুক্তিও শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাপূর্ণ জনগণের নিকট অকাট্য। অকাট্য বলিয়া তাহারা সেই পরতঃ-প্রমাণেই সন্তুষ্ট। তাহারা অন্য প্রমাণ চাহে না; অন্য প্রমাণ দিলেও তাহা গ্রহণ করে না। তাহাদিগের নিকট সনাতন ধর্ম্মের স্বতঃ-প্রমাণ নাস্তিকবাদ। আমরা যেমন দেখাইয়াছি, তাহাদিগের নিকট মায়াবাদ প্রকারান্তরে নাস্তিকবাদ, এ জন্য অগ্রাহ্য; তেমনি হিন্দুধর্ম্মের স্বতঃ-প্রমাণও নাস্তিকবাদের প্রকারান্তর মাত্র, এ জন্য অগ্রাহ্য। সুতরাং পরতঃ-প্রমাণই তাহাদিগের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ এবং সেই প্রমাণই যথেষ্ট। যেরূপ সম্ভবযুক্তির উপর হিন্দু অবতারবাদ স্থাপিত, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি।

অতএব, বলিতে গেলে স্থূলদর্শী সাধারণ জনগণের নিকট যুক্তি পরাস্ত। দুর্ব্বল সম্ভবযুক্তিই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন ও সম্পত্তি—বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাভক্তি। স্বভাবতই যাহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি অচলা ভক্তি, ঋষিবাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা, দেবদেবীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং যাহারা সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা সংসারধর্ম্মে ও ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে চালিত হইয়া

তাহা সুনির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগের ঠিক উপযোগিতা বুঝিয়াই জ্ঞানী শাস্ত্রকারগণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভক্তিসাধক পারমার্থিক ঐতিহাসিক কাব্যরসে আপ্লুত করিয়া পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাহারাও সেই পুরাণাদি দ্বিরুক্তি না করিয়া অতি আগ্রহ-সহকারে পড়িয়া থাকে এবং তৎপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম ও অবতারবাদ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া থাকে। যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভক্তি সাধারণ জনগণে এত প্রবল এবং ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান প্রবৃত্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই শ্রদ্ধাভক্তি বরং যাহাতে আরও বলবতী ও প্রগাঢ় হয়, তজ্জন্যই আমরা সম্ভবযুক্তি খ্যাপন করিয়াছি। এক্ষণে এই শ্রদ্ধাভক্তির উচ্চাঙ্গ সকল কি প্রকার, তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তদ্দ্বারা বরং সেই ভক্তি প্রবর্দ্ধিতা হইয়া অধিকতর গৌরব লাভ করিবে।



ভক্তি-মীমাংসা।

প্রকৃত ভক্তি কি, একথা লইয়া প্রাচীন বৈদিককালে মহা বাগ্-বিতণ্ডা চলিত। এ জন্য ভক্তিমীমাংসা-শাস্ত্রের আবশ্যকতা হইয়াছিল। যে ত্রিবিধ বিষয় লইয়া বেদ সম্পূর্ণ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সেই ত্রিবিধ বিষয়েরই মীমাংসাশাস্ত্র আছে। কে বলে হিন্দুধর্ম্মের কিছু মীমাংসা নাই? জ্ঞান লইয়া উত্তর-মীমাংসা, কর্ম্ম লইয়া পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং ভক্তি লইয়া শাণ্ডিল্য বিদ্যা। যেমন বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে যে সমস্ত সংশয় ও বাদানুবাদ উত্থাপিত হইত, তাহা পূর্ব্ব ও উত্তর-মীমাংসায় সমাধান করা হইয়াছে, তেমনি ভক্তি-সম্বন্ধে যে বিচার ও তর্ক উপস্থিত হইত, শাণ্ডিল্য-বিদ্যায় বা ভক্তিসূত্রে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। অতএব, ভক্তিমীমাংসা, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার ন্যায়, ভক্তির দার্শনিক তত্ত্ব।

ভক্তি যদি বৈদিক তত্ত্ব হয়, তবে ত তাহা অলৌকিক তত্ত্ব। বেদে লৌকিক তত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু ভক্তিমীমাংসা-শাস্ত্রে ভক্তির যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে ভক্তিকেও একটি অলৌকিক তত্ত্ব বলিয়াই গণনা করিতে হয়। ভক্তি সামান্য লোকে দৃষ্ট হয় না এবং সামান্য সাধনেও ভক্তির উদয় হয় না। সামান্য লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তির বিকাশ দেখা যায় বটে, * কিন্তু মুখ্য ভক্তি দেখা যায় না। মুখ্যভক্তি

---

* হিন্দু ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে ভক্তি দ্বিবিধ—লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক ভক্তিই গৌণী ভক্তি এবং অলৌকিক ভক্তিই মুখ্যভক্তি। মুখ্যভক্তি এই জন্য যে, তদ্দারাই সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয়। অন্যবিধ ভক্তি অসাক্ষাৎ মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া গৌণ। এই মুখ্যভক্তিই প্রধানতঃ মীমাংসা-শাস্ত্রে বিচার্য্য হইয়াছে। এই মুখ্যভক্তির প্রকৃতি বিচার্য্য হওয়াতে তৎসঙ্গে গৌণী ভক্তিও

অনেক সাধনার ফল। মানব গৌণী ভক্তির সাধনা দ্বারা দেবত্বে উঠিলে তবে মুখ্যভক্তির অধিকারী হয়। গৌণী ভক্তির সাধনা-পথ গীতায় এবং ভক্তিশাস্ত্রে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। মানব দেবত্বে না উঠিলে যদি ভক্তির অধিকারী না হইল, তবে ভক্তি দার্শনিক বিচারে আসিল কিরূপে? দর্শন ত প্রত্যক্ষ এবং অনুমানসিদ্ধ বিচার। ভক্তি সামান্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কারণ, ভক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে মানবকে দেবত্বে উঠিতে হয়; যখন দেবত্বে উঠিবে, তখন সামান্য প্রত্যক্ষ আর নাই, সুতরাং ভক্তি প্রত্যক্ষী-ভূত হইল না। ভক্তিকে অনুভূত করিবার নিমিত্ত তবে অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রয়োজন। ভক্তি যদি সামান্য প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়, তবে তাহা অনুমান-গ্রাহ্য হইবে কিরূপে? কারণ, অনুমান প্রত্যক্ষ লইয়াই কার্য্য করে, অনুমান ত প্রত্যক্ষের অতীত নহে।

কিয়দংশে বিচারিত হইয়াছে। কারণ গৌণী ভক্তিই মুখ্যভক্তির সোপান-স্বরূপ। এই গৌণী ভক্তিরও দ্বিবিধ অঙ্গ—শ্রদ্ধা এবং ভগবদ্ভক্তি। পিতা, মাতা, আচার্য্য শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তির নাম শ্রদ্ধা এবং দেবদেবী ও ভগবানের প্রতি ভক্তির নামই ভগবদ্ভক্তি। অতএব, ভক্তির এই ত্রিবিধ অঙ্গ—শ্রদ্ধা, ভগবদ্ভক্তি এবং মুখ্যভক্তি। এই ত্রিবিধ ভক্তিকেই সামান্যতঃ শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং পরাভক্তি কহে। শ্রদ্ধাই ভক্তির সোপান এবং ভক্তিই পরাভক্তির সোপান। কিন্তু এই ত্রিবিধ ভক্তি একই ভক্তির প্রকারভেদ। যাহা সচরাচর লোকে দৃষ্ট হয়, তাহাই লৌকিক ভক্তি, যাহা সচরাচর লোকে দৃষ্ট নহে, তাহাই অলৌকিক ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি সাতিশয় প্রগাঢ় হইলেই লোকের পরম বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-হেতু নৈষ্কর্ম্ম্য উপস্থিত হয়; তখন যে প্রগাঢ় আত্মরতির উদয় হয়, সেই প্রগাঢ় পারমার্থিক প্রেমানুরাগই অলৌকিক ভক্তি; তাহাই সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ। তাহা সচরাচর লোকে দৃষ্ট হয় না। এ প্রস্তাবে ভক্তি-শব্দ এই ত্রিবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কেবল স্থানবিশেষে উহার প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু হিন্দুদর্শনে যে অনুমান-প্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সামান্য অনুমান নহে। বহির্বিষয়ক যে অনুমান, তাহা বাহ্য-জগতের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানমূলক, এ জন্য সেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে ব্যাপ্তিরূপে ধরিয়া অনুমান কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু অলৌকিক তত্ত্ব-বিচারে সেরূপ ঐন্দ্রিয়িক ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। তবে অলৌকিক বিষয়ে অনুমান কিরূপে সম্ভব? দার্শনিক অনুমান এরূপ সামান্য অনুমান নহে। দর্শনশাস্ত্রে অনুমানকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রের অনুমান বৈদিক অলৌকিক তত্ত্বমূলক আপ্তবাক্যানুগামী অনুমান। আপ্তগণ এবং সিদ্ধগণ অলৌকিক প্রত্যক্ষে যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, দার্শনিক অনুমান সেই সমস্ত তত্ত্বমূলক বিচার। সে সমস্ত তত্ত্ব ছাড়িয়া দিলে, দার্শনিক অনুমান কোন কার্য্যেই আইসে না। অতএব, দার্শনিক অনুমান আপ্তবাক্যের অনুগামী। ভক্তিও অলৌকিক বিষয় হইয়া সেইরূপ অনুমানে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দার্শনিক অনুমান যদি এইরূপ আপ্তবাক্যের অনুগামী হইল, তাহা হইলেও কি ভক্তি অনুমানসিদ্ধ? প্রতিবাদী বলিবেন—ভক্তি যে রসস্বরূপ, ভক্তি যে রাগ, তাহা ত জ্ঞান নহে যে, তোমার অনুমানে আসিবে? যাহা রাগ, তাহা যখন অন্তরে প্রতিবোধিত হয়, তখনই অনুভূত হইতে পারে। সন্দেশের মিষ্টতা কেহ কখন বুঝাইয়া দিতে পারে না; দ্বেষ কি হিংসা কিরূপ, তাহা জ্ঞানগোচর নহে। যাহার হৃদয়ে হিংসার উদয় হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, হিংসা কি; অন্যে কি বুঝিবে? ভক্তি তদ্রূপ যদি রসস্বরূপ এবং অনুরাগ হয়, তবে তাহা জ্ঞানগোচর কিরূপে হইবে? যদি জ্ঞান-গোচর না হয়, তবে তাহা দার্শনিক অনুমানমূলক মীমাংসাশাস্ত্রের বিচার্য্য কিরূপে হইবে?

রস ও রাগের বিচার যেরূপে সম্ভব, ভক্তির বিচারও সেইরূপে সম্ভব। অন্য রস ও অন্য রাগ হইতে ভক্তিরসকে ও ভক্তিরাগকে পৃথক্ করাই, তাহার বিচার। যাহা ভক্তি নয়, তাহাকে ভক্তিরাগ হইতে পৃথক্ করাই ভক্তির দার্শনিক বিচার। ভক্তিরাগকে পৃথক্ করিতে হইলে দুইরূপে পৃথক্ করিতে হয়।

(১) ভক্তিকে অন্যবিধ রাগ হইতে পৃথক্ করা। অন্যবিধ রাগ হইতে পৃথক্ করিতে হইলে ভক্তি কোন্ শ্রেণীর রাগ, তাহা নির্ণয় করা চাই। দ্বেষ এক শ্রেণীর রাগ, ক্রোধ অন্য এক শ্রেণীর রাগ। দয়া এক শ্রেণীর রাগ এবং প্রীতি অন্য এক শ্রেণীর রাগ। রাগ ও রস এইরূপ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক—ভক্তি কোন্ শ্রেণীর রাগ। ভক্তিকে এইরূপে পৃথক্ করা তাহার দার্শনিক বিচার।

(২) ভক্তি যে শ্রেণীর রাগ, সেই শ্রেণী-মধ্যেও আবার নানা অবান্তর ভেদ আছে। ভক্তি প্রীতি-শ্রেণীর রাগ। কিন্তু বিষয়-প্রেম, স্নেহ, মমতা, দাম্পত্যানুরাগ, পিতৃভক্তি, সখ্য প্রভৃতি সকলই প্রীতির অন্তর্গত। ভক্তিকে এই সমুদায় হইতে পৃথক্ করা ভক্তির দার্শনিক বিচার।

ভক্তিকে এইরূপে পৃথক্ করিলেই ভক্তির বিচার শেষ হইল না। ভক্তি যেরূপ প্রীতি, তাহার উপলব্ধি কিরূপে হইতে পারে; কিরূপে ভক্তি সঞ্চারিত হয়; সঞ্চারিত হইয়া কিরূপে তাহা বর্দ্ধিত হয়, এই সমস্ত ক্রম ও পর্য্যায় দেখাইয়া ভক্তির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাও ভক্তির দার্শনিক বিচার। প্রীতি যে রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়, তাহার সাধন-পথ নির্দ্দেশ না করিয়া দিলে ভক্তির সঞ্চার উপলব্ধি হইতে পারে না। এ জন্য, এই সমস্ত পন্থা নির্দ্দেশ

করাও ভক্তিমীমাংসার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক, ভক্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারিত করাই ভক্তির দার্শনিক তত্ত্ব।

ভক্তির ধর্ম্মকে এই প্রকার তন্ন তন্ন রূপে বিচার করিয়া দেখাইয়া না দিলে তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের সাধনা-প্রণালী যে প্রকার ক্লেশকর, সংযম-মূলক, অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক পথ, সেই সুদীর্ঘ পথে বরাবর প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ়ব্রত করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়—ভক্তি। এই ভক্তি গৌণী ভক্তি শ্রদ্ধামাত্র হইতে ক্রমশঃ প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া পরা-ভক্তিতে উপনীত হইয়াছে। পাছে গৌণী ভক্তি পরাভক্তিতে উপনীত না হয়, তাই ভক্তি-শাস্ত্রে সেই ভক্তির ক্রমসকল একে একে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত ভক্তগণ যে সমস্ত ভক্তিপথ দিয়া একে একে পরাভক্তিতে উপনীত হইয়াছেন, ভক্তি-মীমাংসা-শাস্ত্রে সেই সমস্ত বাস্তবিক ভক্তিক্রম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং সে সকল ভক্তি-নিদর্শনের আর ভুল হইবার যো নাই। নারদ, গর্গ, শাণ্ডিল্য, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ যে ভক্তিপথের শিক্ষাগুরু, সে ভক্তিপথ কখনই অলীক নহে; তাহা প্রকৃত মুক্তি-সাধক পথ। লোকে কুতর্ক-জালে ভক্তিকে এরূপ আচ্ছন্ন করিতে পারে যে, প্রকৃত ভক্তিকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। যাহা বাস্তবিক ভক্তি, লোকে তাহাকে ভক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে। ভক্তি এরূপ নহে, এরূপ ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী নহে, এইরূপ নানা প্রকার কুতর্ক-জাল দ্বারা ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিলে, লোকের প্রকৃত ভক্তিপথ হইতে নিবৃত্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই সমস্ত আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই ভক্তিমীমাংসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি।

কুতর্ক-দ্বারা যে অনেকে প্রকৃত ভক্তিপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়,

এ কথার প্রমাণ আমরা প্রহ্লাদের উক্তিতে দেখিতে পাই। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন :—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"—বিষ্ণুপুরাণ, ১অং। ২০অ ১৮।

হে নাথ! আমি যে সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই যেন তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে।

তাঁহার প্রার্থনার অভিপ্রায় এই যে, যেন কোন জন্মে তাঁহাকে কেহ ভক্তি হইতে বিচলিত করিতে না পারে। তিনি বলিতেছেন, লোকে হাজার আমাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করুক না কেন, আমি যেন সে পথ চিনিয়া তাহাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তাহা অবলম্বন করিয়া জন্মজন্মান্তর, হে হরি, তোমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকি। এই উদ্দেশে ভক্তিমীমাংসার অবতারণা। মীমাংসা-শাস্ত্রমাত্রই তিন অংশে বিভক্ত (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ, (৩) পরীক্ষা।

যে জন্য যে মীমাংসাশাস্ত্রের অবতারণা, তাহার ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ। এইরূপে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে বিষয়ের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎপরে সেই লক্ষণ ঠিক কি না, তাহার বিচারের নাম পরীক্ষা। ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত, ত্রিবিধ দর্শনশাস্ত্রই এইরূপ বিষয়-বিভাগ করিয়া বেদের মীমাংসা করিয়াছেন। ভক্তিমীমাংসা শাস্ত্রও এই পন্থাবলম্বন করিয়া ভক্তির বিচার সম্পন্ন করিয়াছেন। তাই, কি শাণ্ডিল্য, কি নারদ, উভয়েই ভক্তিশাস্ত্রের উদ্দেশ খ্যাপনার্থ প্রথমেই বলিয়াছেন :—

"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা।"—শাণ্ডিল্য।

"অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।"—নারদ।

যে উদ্দেশে ভক্তিশাস্ত্রের অবতারণা, তাহা আমরা উপরেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই উদ্দেশ এই সূত্রদ্বয়ে কিরূপ নিহিত আছে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

এই সূত্রের তিনটি বিভিন্ন অর্থ তিনটি বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। (১) অথ (২) অতঃ (৩) ভক্তিজিজ্ঞাসা বা ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বাদরায়ণ, জৈমিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতি দর্শনকার যে অর্থে অথ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এ স্থলে সে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই। এ স্থলে অধিকারী-ভেদার্থই "অথ"-শব্দের প্রয়োগ। জৈমিনি বলেন, যিনি সম্পূর্ণরূপে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়াছেন, তিনি আমার মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নে সমর্থ। অতএব, কর্ম্ম-মীমাংসার অধ্যয়ন-পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। যেহেতু, সম্পূর্ণ বেদজ্ঞান না হইলে তাহার মীমাংসাজ্ঞান হইবে কিরূপে? এরূপ প্রতিবন্ধক ভক্তি-মীমাংসা-পাঠে নাই। মুক্তিকামী মাত্রই ভক্তি-মীমাংসা-পাঠের অধিকারী। এই শাস্ত্র মধ্যে দেখা যায় যে, কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রাহ্মণেতর জাতি, সকলেই এই শাস্ত্রাধ্যয়নের পাত্র। সুতরাং জৈমিনি যেরূপ বাধা উত্থাপিত করিয়াছেন, সেরূপ বাধা ভক্তিসূত্র-পাঠে নাই। সমগ্র বেদাধ্যয়ন না করিলেও ভক্তিসূত্র সবাই পড়িতে পারেন।

বৈদিক কর্ম্ম-মীমাংসার্থীর যেমন সমগ্র বেদজ্ঞান আবশ্যক, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপযোগী হইবার জন্য বিশেষ অধিকার চাই। এ অধিকার বড় সামান্য নহে। (১) যে ব্যক্তি অধ্যয়ন-বিধি অনুসারে বেদ-বেদান্তের এক প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্দ্বারা নিত্য বস্তু-নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন, (২) ইহলোকের সুখ-ভোগ এবং পরলোকের স্বর্গাদিরূপ অনিত্য সুখের প্রতি যাঁহার

বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, (৩) নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যাঁহার চিত্তশুদ্ধি ও আত্ম-সংযম হইয়াছে এবং এইরূপে যিনি একান্ত (৪) মুক্তিপিপাসু হইয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী। এইরূপ সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে বেদান্তদর্শন-পাঠের ফললাভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসুর এই সমস্ত বাধা ভক্তিলাভার্থীর নাই। তবে কি ভক্তিকামীর কোনরূপ অধিকারের আবশ্যকতা নাই? যিনি ভক্তিপথের পথিক হইতে চাহেন, তাঁহার চিত্তাবস্থা ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হওয়া চাই। গৌণী ভক্তির সাধনা দ্বারা পরমেশ্বরে একান্ত আসক্তি না হইলে কেহ মুখ্য ভক্তির অধিকারী হইতে পারে না। কিরূপ চিত্তাবস্থা হইলে ভক্তির অধিকার জন্মে, তাহা বেদান্তে এইরূপ বর্ণিত আছেঃ—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

—শ্বেতাশ্বতরে ৬ অঃ ১৮ শ্রু।

যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া বেদপ্রদান করিয়াছেন, যিনি আত্মস্থ বুদ্ধির প্রকাশ করেন, মুক্তিকামী ব্যক্তি সকল সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম দেবের শরণাপন্ন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন। সেই পরম পিতা প্রসন্ন হইলেই জীবের বিশুদ্ধ বুদ্ধি পরমেশ্বরে আসক্ত হয়।

ভক্তি-জিজ্ঞাসার অর্থ কি? ভক্তি কি জিজ্ঞাস্য বিষয়? ভক্তি কি জ্ঞাতব্য? বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানগম্য, ভক্তি সেরূপ জ্ঞানের বিষয় নহে। পূর্ব্ব-মীমাংসায় ধর্ম্ম যেমন কৃতিসাধ্য, ভক্তি তেমন কৃতিসাধ্যও নহে; তথাপি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে, গৌণী

ভক্তির সঞ্চার হইলে, সেই ভক্তি যখন সাধনা-ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিণত হয়, নানা কুতর্ক-জালে তখন তাহার নিবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকাতে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। অতএব ভক্তির প্রকৃতি ও ধর্ম্ম নিরূপণার্থ ভক্তি-তত্ত্বের বিচার করা উচিত। সেই অর্থে ভক্তি জিজ্ঞাস্য, এবং সেই প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যই অতঃ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, কি জৈমিনির কর্ম্ম-মীমাংসা, কি ব্যাসের জ্ঞান-মীমাংসা, কি শাণ্ডিল্যের ভক্তি-মীমাংসা, সমস্ত মীমাংসা-দর্শনই বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী। যিনি ধর্ম্ম-পথে যেমন উন্নত হইতে থাকেন, তাঁহার অধিকারও তেমনি উৎকর্ষ লাভ করে। একান্ত নিম্নাধিকারীর জন্য সাধনভক্তি-পথ। কিন্তু ভক্তি-পথেরও ক্রম আছে। ভক্তি-পথে লোক যেমন উন্নত হইতে থাকেন, তেমনি তিনি ক্রমে ক্রমে জৈমিনির কর্ম্ম-মীমাংসা, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র এবং বেদান্তীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হয়েন। তাই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ-প্রকাশস্থলে গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥"—১২।

অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু সর্ব্ব কর্ম্মফল-ত্যাগ দ্বারা সংসার-নিবৃত্তি হইলে মুক্তি লব্ধ হয়। অতএব ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-সন্ন্যাসই প্রশস্ততর।

সুতরাং এই ভক্তিপথেই ঐ সমস্ত ক্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। নিম্নাধিকারীই ক্রমে মধ্য এবং শ্রেষ্ঠাধিকারী হইয়া উঠেন। ভক্তি যেমন ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তাহা এই সমস্ত আসক্তিতে পরিণত হয় ঃ—

"(১) গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, (২) রূপাসক্তি (৩) পূজাসক্তি

(৪) স্মরণাসক্তি (৫) দাস্যাসক্তি (৬) সখ্যাসক্তি (৭) কান্তাসক্তি (৮) বাৎসল্যাসক্তি (৯) আত্ম-নিবেদনাসক্তি, (১০) তন্ময়তাসক্তি (১১) পরমবিরহাসক্তি-রূপৈকধাপ্যেকাদশধা ভবতি।”
—নারদীয় ভক্তি-সূত্র। ৮২।

ভক্তি এক হইয়াও এইরূপ নানাবিধ আসক্তিতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমে ভগবানের গুণে এবং মাহাত্ম্যে আসক্তি জন্মে; পরে তাঁহার রূপে ভক্ত মুগ্ধ এবং সেইরূপ দেখিতেই সর্ব্বদা অভিলাষী হয়েন। যিনি তাঁহার সূক্ষ্মরূপে মোহিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে সেই সূক্ষ্মরূপের স্থূলাবয়ব দিয়া সর্ব্বদা সেইরূপ দেখিতে ভালবাসেন।

স্থূলরূপ মানসিক সূক্ষ্মরূপেরই অবয়বী মূর্ত্তি। সগুণ অনন্ত ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপ ও বিভূতি অশেষ মূর্ত্তিতে ভক্তের হৃদয়-মন্দির শোভিত করে। এই রূপাসক্তি, পূজা এবং স্মরণাসক্তি-দ্বয়কে ক্রমে সঞ্চারিত করে। ভক্ত, রূপে মোহিত হইয়া সর্ব্বদাই ভগবান্‌কে পূজা এবং স্মরণ করিতে থাকেন। এই আসক্তি-চতুষ্টয় ক্রমশঃ তৎপরবর্ত্তী আসক্তি-চতুষ্টয়কে আনিয়া দেয়। তখন ভক্ত ভগবানের একান্ত দাস ও সেবক হইয়া তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে উদ্যত হয়েন। দাস্যাসক্তি ক্রমশঃ সখ্যভাবে পরিণত হয়। তখন ভগবান্ হৃদয়ের সখা; ভগবানের সহিত তখন আপনা আপনি সখ্যভাব আইসে; সখ্যভাব আরও ঘনিষ্ঠতর হইলে বাৎসল্যের ঘন স্নেহে ভগবান্‌কে ভক্ত আবদ্ধ করেন। কিন্তু এ স্নেহেও ভগবান্ তত সমীপবর্ত্তী নহেন, যত কান্তাভাবে তিনি ভক্তের হৃদয়ে অহর্নিশ মিলিত থাকেন। এই কান্তাভাবে (পতিপত্নীর ভাব) উপনীত হইলে ভক্ত আত্মসমর্পণ করেন। তখন ভগবান্

হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন। তাঁহাতে হৃদয় সমর্পিত হয়। এই প্রগাঢ় ভাবই আত্মনিবেদনাসক্তি। যখন সমস্ত হৃদয়-মন ভগবানে সমর্পিত হয়, ভগবান্ ভিন্ন ভক্ত আর কিছুই জানে না, তখন তন্ময়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্ময়তায় ক্ষণকালও বিরহ অসহ্য। যখন তন্ময়তা ক্ষণকালমাত্র ভঙ্গ হয়, অমনি ভক্ত অস্থির হইয়া পড়েন। সেই তন্ময়ভাব পুনরুদয় হইলে ভক্ত তবে শান্তিলাভ করেন। ভগবান্ ক্রমশঃ এইরূপে ভক্তের সমীপস্থ হইতে থাকেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ভগবান্ ও ভক্তে দূরত্ব রহিয়াছে। সামীপ্য যতই নিকটস্থ হউক না কেন, তথাপি যেন কিঞ্চিৎ অন্তর থাকে। কিন্তু এই সামীপ্য যখন সারূপ্য লাভ করে, তখন ভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। তখন জীব, ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া পড়েন।

ভক্তির এত প্রকার স্ফূর্ত্তি। এই স্ফূর্ত্তিভেদেই ভক্তের অধিকার। সকলেই সমান ভক্ত নহেন। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির যেরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তিনি সেইরূপ অধিকারী। সগুণ ভগবানের ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভক্ত তাঁহার সারূপ্য-লাভ করিয়াও ক্ষান্ত নহেন। এই সারূপ্য কিরূপে লব্ধ হয়? জীবের সামীপ্য লাভ হইলে তিনি ঈশ্বর-সম্ভোগী হইতে পারেন। কিন্তু তখনও জীবের অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না। যখন এই অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয়, তখন জীবের অবিদ্যার বিনাশ হয়। অবিদ্যার বিনাশের অর্থ, তাহা মহত্তত্ত্বরূপা নিরহঙ্কৃতা মায়ায় লীন হয়। কারণ, অবিদ্যা অহঙ্কৃতা মায়া, মহত্তত্ত্ব নিরহঙ্কৃতা শুদ্ধসত্ত্ব-মায়া। অবিদ্যার বিনাশ হইলেই জীবাত্মা ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। কারণ, জীবাত্মা এখন মহত্তত্ত্বরূপা মায়াধিষ্ঠিত হয়েন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, (ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদ দেখ) এই মায়া ঈশ্বরের শরীর বা ঐশ্বর্য্য; এই

মায়া নির্ম্মল জ্ঞানময়, এ জন্য আনন্দময় কোষ। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির নিরোধ হইতে এই নির্ম্মল জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞানে অণিমাদি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীব আত্মাতেই তৃপ্ত থাকেন। জীবের এই ঐশ্বর্য্য-লাভেই সারূপ্য মুক্তি হয়। কিন্তু এই সারূপ্য একেবারে গুণাতীত নহে; কারণ, মহত্তত্ত্বে সত্ত্বগুণ প্রবল। ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেও গুণাতীত না হইতে পারিলে কখন আবার পতনের সম্ভাবনা থাকে, আবার অবিদ্যার আবির্ভাব হইতে পারে। এই যোগীরা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইলেও সমাধিস্থ থাকিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য সাধন দ্বারা নির্ব্বীজ হয়েন। এ জন্য এই সমাধির নাম নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধি দ্বারা সমস্ত সগুণ ভাবের লয়সাধন হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আত্মা ও পরমাত্মায় এক হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তির পূর্ণতা হয় না কিরূপে? এই পূর্ণতার জন্য যে নির্ম্মল জ্ঞানের আবশ্যকতা, সারূপ্য লাভ করিয়া জীব সেই নির্ম্মলজ্ঞানে উপনীত হইয়া ঈশ্বর-তন্ময়তা লাভ করেন। সেই তন্ময়-তায় জীব সমাধিস্থ থাকেন। সেই সমাধি দ্বারা আত্মা যখন চিন্ময়-রূপ পরমাত্মার সহিত একতায় উপনীত হন, তখন জীবের মুক্তি—তখন জীব সচ্চিদানন্দময় হয়েন। জীব-ব্রহ্মে অভেদ হইয়া যায়। ভক্তের মুক্তিকামনা তখন পূর্ণ হয়। তখন তাঁহার সগুণ জীবত্ব ঘুচিয়া গিয়া নির্গুণ ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। পরাভক্তিই যে জীবের এইরূপ মোক্ষের হেতু, গীতা তাহা উপদেশ দিয়াছেন :—

> "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
>
> ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"—১৮।৫৪।৫৫।

"ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না এবং আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সেই সর্ব্বভূতে সমদর্শী জ্ঞানী অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ করেন। সেই পরা-ভক্তি দ্বারা স্বরূপতঃ আমাকে জানিয়া যখন সেই তত্ত্বজ্ঞানেরও উপরম হয়, তখন ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষ আমাতে প্রবেশ করেন।"

ভক্তের মুক্তিপথ এত দুর সুবিস্তৃত। কোথায় ভক্তি সামান্য ঈশ্বরানুরাগে প্রথমে ঈষৎ আভাসিত, কোথায় সাযুজ্য মুক্তি! এই সমস্ত স্তরের মধ্যে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পথ। এই সমস্ত যোগ-সাধন না করিলে জীবের মুক্তিলাভ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই সুবিস্তৃত ভক্তিযোগ শিক্ষা দেন। শাণ্ডিল্যও ভগবদ্গীতার অনুগামী হইয়া ভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভক্তির অন্যান্য আচার্য্যগণ এক এক স্তরের উপদেশমাত্র দিয়া গিয়াছেন। ভক্তের অধিকার যখন বিভিন্ন, তখন সেই ভক্তাচার্য্যগণের উপদেশও সুতরাং বিভিন্ন হইয়াছে। তাই নারদীয় ভক্তিসূত্রে ভক্তির নানাবিধ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল লক্ষণ ভক্তি-রসের প্রগাঢ়তা অনুসারে বিভিন্ন হইয়াছে। নানা ভক্তিস্তরের যে যে বিভিন্নতা, আচার্য্যগণের উপদেশেও সেই সেই বিভিন্নতা। নহিলে ভক্তির বাস্তবিক বিভিন্নতা নাই। একই গঙ্গা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামমাত্র লাভ করিয়াছে।

ভক্তির এই প্রকার বিভিন্ন স্তর লইয়া পুরাণের বিশাল দেহ নির্ম্মিত। পুরাণের এক এক দেহে ভক্তির এক এক অঙ্গ পরিদৃশ্য-মান। রাজা পরীক্ষিৎ, হনুমান্ এবং পৃথুরাজায় আমরা গুণ-মাহাত্ম্যাসক্তির পরিচয় পাই। পৃথুরাজা পূজাসক্ত, প্রহ্লাদ স্মরণা-সক্ত এবং হনুমান্, বিভীষণ, অক্রূর, বিদুর প্রভৃতি দাস্যাসক্ত ভক্ত ছিলেন। অর্জ্জুন, সুগ্রীব, উদ্ধব, কুবের এবং ব্রজরাখালগণ

সখ্যাসক্ত ভক্তের দৃষ্টান্ত। নন্দোপনন্দ, দশরথ, কশ্যপ, অদিতি, কৌশল্যা, যশোদা এবং মেনকা প্রভৃতি বাৎসল্যের পরিচয়। ব্রজগোপীগণ কান্তাভাবে উন্মত্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বলিরাজের আত্মনিবেদনাসক্তি সকলেরই পরিচিত। নারদ, শুক, কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অহরহঃ ভগবানের গুণকীর্ত্তনেই মত্ত থাকিতেন। গোপীগণের ক্ষণেক বিরহ কত কষ্টকর, শ্রীরাধিকায় তাহা বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই নারদীয় ভক্তিলক্ষণের দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত ভক্ত ভক্তিপথের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁহারা পুরাণে আমাদিগকে ভক্তিপথ শিক্ষা দিতেছেন।



গীতার ও হিন্দুধর্ম্মের স্বতঃ-প্রমাণ।

অবতার-তত্ত্ব।

সগুণ ব্রহ্ম কেমন স্থূলরূপে উপাস্য, তাহা আমরা গীতার ও হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ-প্রমাণ নামক প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি; এইরূপে তিনি সম্ভজনীয়। সগুণের সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতত্ত্ব এক্ষণে সূচিত হইতেছে।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। "সম্ভবামি যুগে যুগে" বলিলে যে কেবল স্থূল যুগাবতার বুঝায়, এমত নহে, শ্রীধর বলেনঃ—

"যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ।"

যুগে যুগে শব্দের অর্থ—সেই সেই অবসরে বা কালে। কোন্ কালে? যে কালে পাপের বিনাশ-সাধন হয় এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হয়, সেই অবসরেই ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। এ কথায় ভগবানের আবির্ভাবের কাল মাত্র নির্ণীত হইল। সে কাল প্রতি জীবে সম্ভব, প্রতি দেশে সম্ভব এবং প্রতি বৎসরে বা দিনে সম্ভব।

কিন্তু তিনি কিরূপ শরীর ধারণ করেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের ন্যায় পাপপুণ্যের ভোগ-জন্য যাহার প্রাকৃত শরীরের সম্ভাবনা নাই; এবং সেই জন্য যিনি জন্ম-রহিত—"অজ" তাঁহার কিরূপ শরীর হইবে? গীতা বলিতেছেন, তিনি যদিও অজ এবং অব্যয়, তথাচ তিনি বলিয়াছেন যে, আমিঃ—

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

শ্রীধর এইরূপ অর্থ করেনঃ—

"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।"

"তিনি সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তিতে স্ব-ইচ্ছায় আবির্ভূত হয়েন।"

শ্রীধর বলিলেন যে, তিনি সত্ত্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। যদি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিতা কোন মূর্ত্তি থাকে, তবে সেই মূর্ত্তি ভগবানের। সে মূর্ত্তি কোথায় অধিষ্ঠিত? না, সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্যের বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রকৃতিতে তিনি আবির্ভূত হয়েন। আবির্ভূত হইয়া পাপের বিনাশসাধন পূর্ব্বক ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ধরিয়া মহাজনগণ অবতীর্ণ হয়েন। বুদ্ধদেব, ঈশা, শঙ্কর, মহম্মদ, মোসেস, নানক, কবীর, চৈতন্য-দেব, প্রভৃতি মহাজনগণ সবাই সমান সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন না হউন, তথাপি সকলেই ভগবানের শুদ্ধ সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া এক এক ধর্ম্মপন্থা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সামান্য সাংসারিক ব্যাপারেও এক এক জন সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন লোক নিমিত্তকারণরূপে দেখা দিয়া কখন পাপীর বিনাশসাধন করেন, কখন বা কোন সাধ্বী-স্ত্রীর অথবা বিপন্ন সাধুর ধর্ম্মরক্ষা করিতে দেখা দিয়া থাকেন। সূক্ষ্মদর্শী লোকে বলে, তিনি ভগবানের রূপ ধারণ করিয়া ঐ কার্য্যোদ্ধার করিয়া গেলেন। মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারে অর্জ্জুন সেইরূপ নিমিত্তকারণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এ জন্য আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভগবান্ জগতের নিমিত্তকারণরূপে উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ যদি সাত্ত্বিকরূপ পরিগ্রহ করিয়া জগতের কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন, তবে সেই শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি কিরূপ, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার মানুষের প্রকৃতি আলোচনা করা যাইতেছে।

মনুষ্যের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যু।

আমরা পূর্ব্বে "মায়াবাদে" দেখাইয়াছি যে, অবিদ্যা অনন্ত

আকারে আকারিত হইয়া এই বিশ্বকে অনন্ত জীব-পূর্ণ করিয়াছে। এই জীব সমস্তই ত্রিগুণান্বিত। ত্রিগুণান্বিত বলিয়া সেই জীবরূপ-সকল কি সমভাবে ত্রিগুণান্বিত? সে সমস্ত সমান ত্রিগুণান্বিত নহে। এক এক জাতীয় জীবে ত্রিগুণের মিলন-মিশ্রণ স্বতন্ত্র। মনুষ্য-জাতিতে যেরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিমাণ ও পরিচয়, পশুতে তাহা নহে; পশু জাতিতে সত্ত্ব ত রজোগুণ অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু তমোগুণ অধিকতর। মনুষ্য এবং পশু-জাতিতে বাল্যে ও জরায় তমোগুণেরই প্রাবল্য। আবার পশু অপেক্ষা কীটাদিতে তমোগুণাংশ আরও অধিক এবং রজোগুণ আরও অনধিক। উদ্ভিদ্ জাতীয় জীবে তমঃ ও রজোগুণের আধিক্য এবং অনাধিক্য আরও বেশী। উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা প্রবালে, প্রবাল অপেক্ষা জড়ে তমোগুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। জড়ে তমোগুণ অপর দ্বিবিধ গুণকে একেবারে অভিভূত করিয়াছে। সুতরাং এই রজঃ এবং তমো-গুণের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ জীব-সমূহ স্থাবর-জঙ্গমে পরিণত হইয়াছে। যাহাদের রজোগুণ অধিক, তাহারাই জঙ্গম জীব এবং যাহাদিগের তমোগুণ অধিক, তাহারাই স্থাবর।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের এমত পরিমাণ আছে, যে পরিমাণে আসিলে মনুষ্যরূপ জীবের উৎপত্তি হয়। এই পরিমাণের ভঙ্গ হইলেই মনুষ্যেতর জীবের সম্ভব হয়। মনুষ্যের রজোগুণ তমঃ অপেক্ষা প্রবলতর। এ কথার মর্ম্ম এই যে, মনুষ্যেতর সমুদায় জীব-জাতি অপেক্ষা মনুষ্যের সত্ত্ব এবং রজোগুণ অধিকতর; কিন্তু আবার এই মনুষ্য-জাতীয় সকল ব্যক্তিতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমভাবে বিভক্ত নাই। কোন ব্যক্তির তমোগুণ কিছু অধিক, তেমনি অন্য লোকের রজঃ বা সত্ত্বগুণ কিছু অধিক। শুধু মনুষ্যজাতি

মধ্যে যে ত্রিগুণের এইরূপ অবান্তর ভেদ আছে এমত নহে, সর্ব্ব জাতীয় জীবেই এইরূপ অবান্তর ভেদ আছে। এমন কি, যে জড়ে তমোগুণই প্রধান, সেই জড়জাতীয় জীব-মধ্যেও তমোগুণের অবান্তর ভেদ আছে। তজ্জন্য জড় পদার্থ সকল পাষাণ, মৃত্তিকা, খনিজ দ্রব্যাদিতে বিভক্ত হইয়া সকলে সমান কাঠিন্য-সম্পন্ন হয় নাই। উদ্ভিদ্‌জাতীয় সকল বৃক্ষ কি সমান কঠিন ও তমোগুণসম্পন্ন? তদ্রূপ পশুজাতীয় সকল জীব কি সমান স্নেহমমতা-সম্পন্ন, না সমান জড়তাসম্পন্ন? গুণের অবান্তর ভেদ যেমন অবিদ্যাময় সর্ব্বজাতীয় জীবে আছে, মনুষ্যেও তদ্রূপ আছে। কিন্তু মনুষ্যে ঐ ত্রিগুণের এমত এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, যাহা মনুষ্যেতর জাতিতে নাই। এই পরিমাণ-সম্পন্ন হইয়া মনুষ্য সত্ত্ব ও রজোগুণপ্রধান।

মানবের রজোগুণ মানবেতর জীবসংঘের ঐ গুণ অপেক্ষা সমধিক প্রবল হওয়াতে সেই রজোগুণই তাহার কর্ত্তৃত্বহেতুক পুরুষকারের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, রজোগুণই সৃষ্টি করে; যাহা সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহারই কর্ত্তৃত্ব; সেই কর্ত্তৃত্ব-হেতুই পুরুষকার। মানবের এই রজোগুণ এত প্রবল যে, তাহা সত্ত্বগুণকে সহসা বলবান হইতে দেয় না। যে মানুষ নিজ সাধনাবলে নিরহঙ্কার হইয়া রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ-সাধন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণান্বিত হইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারেন। কারণ, ঈশ্বরই নিরহঙ্কৃত শুদ্ধসত্ত্ব-শরীর ধারণ করিয়া আছেন। এ জন্য মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বান্তর্গত দ্বিশত-সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে :—

"রজঃ ও তমোগুণনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ।"

কিন্তু মৃত্যুকালে যাহার রজোগুণ সমধিক প্রবল হয়, গীতা বলিয়াছেন যে, তাহাকে পরকালে মনুষ্যলোক লাভ করিতে হয়।

এবং যে ব্যক্তি ইহকালে তমোগুণকে প্রবল করিয়া সত্ত্ব ও রজোগুণকে ক্রমশঃ হ্রস্বতেজ করিতে যান, পরজন্মে তাহার মানবেতর পশুযোনি লব্ধ হয়। আবার যাহার তমোগুণ এত প্রবল হয় যে, সত্ত্ব ও রজোগুণকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, পরকালে তাহার জড়ত্ব প্রাপ্তি হয়।

"যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥"—১৪—১৪।১৫।

এই রজোগুণ-বহুল মনুষ্যের অহঙ্কার স্বভাবতই সঞ্জাত হয়। এই অহঙ্কার হইতে তাহার যে কর্ত্তৃত্ব সঞ্জাত হয়, তাহা স্বভাবতই তাহাকে নানা কামনাজাত কর্ম্মে অহর্নিশ প্রবর্ত্তিত করে। তাহা মায়াধীন কর্ত্তৃত্ব মাত্র। কারণ, জীব মায়াধীন। কেবল ঈশ্বরই মায়াধীন নহেন। জীব মায়াধীন হইয়া কেবল কর্ত্তৃত্বের অভিমানী হইয়াছে। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানী মনুষ্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি যদি এত প্রবল, তবে ভগবান্ কি সেই প্রকৃতিকে ফিরাইবার জন্য কোন উপায় করেন নাই। জীব কি চিরকালই পতিত থাকিয়া ক্রমাগতই ঘোর পাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে? সেই সংসার-সমুদ্রে তিনি ভেলা-স্বরূপ তাহাকে শাস্ত্রাবলম্ব দিয়াছেন। তিনি বিধিনিষেধবাক্য-পূর্ণ শাস্ত্রাদেশ দিয়া মানবকে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন।

তিনি আরও কি করিয়াছেন? যে লোক যেরূপ অদৃষ্ট লাভ করিতেছে, তদনুরূপ কুলে তিনি তাহার জন্ম-বিধান করিতেছেন। মানুষের জন্ম-মৃত্যু সমুদায় ভগবানেরই হাতে। কিরূপে ভগবান্‌কর্ত্তৃক

মানুষের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা আমরা "সমাজতত্ত্ব"-গ্রন্থের "বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর-পরিণাম"-নামক প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি। আবার, শূদ্রই হউক, ব্রাহ্মণই হউক, মানুষ যে কুলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেই কুলোচিত তপস্যাও বিহিত হইয়াছে। ধর্ম্মকর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার। সেই তপস্যা অবলম্বন করিলেই মানুষ অনায়াসে নিজ অদৃষ্টের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। উৎকর্ষ ত সামান্য কথা, মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন।

শুধু এই মাত্রই কি ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলা? আমরা আরও দেখাইয়াছি যে, লোক-সমাজে যখন ধর্ম্মের গ্লানি অথবা সাধুগণের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তিনি কোন না কোন মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া ধর্ম্মসাধন-পন্থা পরিষ্কৃত করিয়া দিয়া সেই সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়াছেন। ভগবান্ এইরূপ লীলায় লোকালয়ে চিরদিনই ব্যাপৃত আছেন। মানবদেহও যে তাঁহার সেইরূপ লীলাক্ষেত্র, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

মানবদেহে দেবলীলা।

এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে ভগবানের ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার প্রয়োজন, আয়োজন এবং নিয়োজন-শক্তি। এই শক্তিত্রয়-সম্পন্ন হইয়া ভগবান্ এ বিশ্বের বিধাতা, কর্ত্তা এবং সর্ব্বনিয়ন্তা-স্বরূপ। এই বিশ্ব-ব্যাপার সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, ভগবানের ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহা সিদ্ধ করেন। ইন্দ্র যথা-সময়ে বারিবর্ষণ করেন; বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও তদ্রূপ যথা-সময়ে নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্বের প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। আবার সেই বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যের ভোগায়তন-শরীর মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে

কর্ম্মভোগ করাইতেছেন। বায়ু প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্য-শরীরে থাকিয়া কিরূপে সেই শরীর রক্ষা করিতেছেন, তাহা আমরা "ব্রহ্ম-বাদে" প্রদর্শন করিয়াছি। এই ভোগশরীর না থাকিলে মনুষ্যের কর্ম্মভোগ ও অদৃষ্ট-সঞ্চয় কিরূপে হইত? শুদ্ধ কি অদৃষ্ট-সঞ্চয়? সেই ভোগশরীরে দেবগণ আছেন বলিয়া মানুষের সাধ্য কি যে, তিনি একেবারে ঘোর যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হইতে পারেন? অমনি রোগ ও নানা অস্বস্তি আসিয়া মানুষকে ঘোর পাপ-পথ হইতে নিবৃত্ত করে। মানব যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হইয়া যত কেন দুর্দ্দমনীয় হউন না, তথাপি তাঁহার দেহভূত মহাবলী বলরাম সঙ্কর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে তাঁহাকে হয় শয্যাগত পীড়ায় পাড়িয়া ফেলিবেন, না:হয় ঘোর বিপাকে বিপদাপন্ন করিয়া অশক্ত করিয়া আনিবেন। বলরাম এইরূপ আয়োজন করিয়া দিলে তখন দেহস্থিত সত্ত্বাত্মিকা কৃষ্ণশক্তি আস্তে আস্তে তাঁহাকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতে থাকেন? এইরূপে যিনি ধর্ম্মকর্ম্মে আকর্ষণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের অর্থই তাই। তিনি তখন অন্তর্যামী-রূপে সেই অনুতপ্ত পাপীকে ধর্ম্ম-পথে নিয়োজিত করিতে থাকেন। মানুষ এই দেবাধিষ্ঠিত বাসে থাকিয়া রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ-সাধন পূর্ব্বক অনায়াসে জীবন্মুক্ত পর্য্যন্ত হইতে পারেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাপার মনুষ্য-শরীরে নিত্যলীলা রূপে অহরহঃ ঘটিতেছে। এই দেহাভ্যন্তরে কি হইতেছে, তাহা কি মানুষ কিছু জানিতে পারে? অথচ মানুষ মায়ামুগ্ধ হইয়া এই দেহ আমার আমার বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে কি সেই দেহ দৈবাধীন নহে? ইন্দ্রাদি দেবগণ অনন্ত আকাশে থাকিয়া যেমন বিশ্বের প্রয়োজন সাধন করিতেছেন, মানবের দেহাকাশেও থাকিয়া তেমনি সেই দেহের প্রয়োজন-সাধন

পূর্ব্বক মানুষের পাপ-তাপ, সুখ-দুঃখ ও রোগাদি ভোগ করাইয়া যৌবন-জরাশেষে অথবা তৎপূর্ব্বেই যথাসময়ে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে আনিতেছেন। মানুষ এইরূপে দৈবাধীন হইয়া আছেন। তাহার শরীরে দেবলীলা অহরহঃ সম্পন্ন হইতেছে।

মানবের দেহাভ্যন্তরে যে দেবলীলা সম্পন্ন হইতেছে, সেই লীলায় ভগবানের তামসী, রাজসী এবং সাত্ত্বিকী, এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিরই পরিচয় হইতেছে। তাঁহার তামসী মূর্ত্তি কি? যে মূর্ত্তিতে ভগবান্ অসুরের ধ্বংস করেন, সেই মূর্ত্তিই তাঁহার তামসী মূর্ত্তি। মনুষ্য-শরীরে অসুর কে? মানবে যে অসুর সমস্ত অধিষ্ঠিত আছে, তাহা গীতার ষোড়শাধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যখন মানব সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রসাদে ঘোর তমোরূপে নিজ আসুরী প্রকৃতির সমস্ত পশুভাব সংহার করেন, তখন তাঁহার দেহে ভগবানের তামসী লীলা সম্পন্ন হয়। সেই লীলায় ব্যাপৃত হইয়া মানুষ নিজ ইন্দ্রিয় এবং রিপুগণের সংযম সাধন করিবার নিমিত্ত শম, দম, নিয়মাদির আচরণ করিতে থাকেন। সেই সমস্ত অস্ত্রদ্বারা মানুষ নিজ শরীরাশ্রিত অসুরগণকে বধ করিয়া চিত্তশুদ্ধি সাধন করেন। চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইলে মানুষ ক্রমে জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইয়া ভগবৎ-জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকেন। সেই জ্ঞানীই কেবল ভগবানের আত্মস্বরূপ লাভে সমর্থ হইতে পারেন। গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥"—৭।১৮।

এইরূপ জ্ঞানযোগীই মহাদেব-প্রতিম এবং সেই জ্ঞানযোগীর মানসপুরই কৈলাসধাম-তুল্য। মানুষ যখন জ্ঞানারূঢ় হইয়া সংসারের

সর্ব্ব মায়ামোহ কাটাইয়া উঠেন; তখন তাহার তমঃ ও রজঃ এই উভয় গুণেরই বিনাশ-সাধন হয়। এই উভয় গুণকে ধ্বংস করাই মানুষের যোগসিদ্ধি। মানব যখন এই রাজসিক অসৎ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তখন তিনি অসত্য লোক হইতে সত্যলোকে আসেন। সেই সত্যলোকে দিব্য জ্ঞানের তেজঃ-পূর্ণ রাজসী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই রাজসী মূর্ত্তি ভগবানের মহা তেজোময় রূপ। এই সত্য-লোকেই মানব আত্ম-তৃপ্ত হইযা পরম শান্তিময় আনন্দ-সম্ভোগ করেন। এই রূপ এ জন্য আনন্দময়। যখন মানব স্বকীয় প্রকৃতির তমঃ এবং রজোগুণের বিনাশ সাধন করিয়া সম্পূর্ণরূপে মায়ামোহ (অবিদ্যা) কাটাইয়া উঠেন, তখন তিনি সম্যক্ শুদ্ধ-সত্ত্ব-অন্তরে ভগবানের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পান। কারণ, এইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকৃতিতেই ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন এবং কেবল মনুষ্যই সাধনাবলে এইরূপ প্রকৃতি লাভ করিতে সমর্থ।

ভগবানের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি।

শ্রুতি ভগবানের তামসী এবং রাজসী মূর্ত্তির আভাস-মাত্র দিয়া সাত্ত্বিকী মূর্ত্তির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

আবির্ভাবাতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী মানুষী বিজ্ঞানঘনানন্দঘনসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥"—গোপালতাপনী, উত্তরভাগ। ৭৯।

যাঁহার আবির্ভাব আছে অথচ তিরোভাব নাই, সেই মূর্ত্তিই স্বপদানুগা। তামসী মূর্ত্তি বিজ্ঞানঘন, রাজসী মূর্ত্তি আনন্দঘন এবং সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, শ্রুতি অনুসারে সত্ত্বমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ। টীকাকার বিশ্বেশ্বর বলেন যে, উক্ত তামসী মূর্ত্তি স্বপদে কৈলাসে, রাজস রূপ সত্যলোকে

এবং সাত্ত্বিক রূপ বৈকুণ্ঠে বিদ্যমান আছে *। বৈকুণ্ঠে তাঁহার গোপালমূর্ত্তিই বর্ত্তমান। তবে, সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিই গোপাল মূর্ত্তি। গোপালমূর্ত্তি কি ? শ্রুতিতে গোপালমূর্ত্তি এইরূপ বিবৃত হইয়াছে ঃ—

"যো গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেনাসৃষ্টিপর্য্যন্তমালাতি স গোপালো ভবতি ওঁ তৎ যৎ সোঽহং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সোঽহমোন্তদ্ গোপাল এব পরং সত্যমবাধিতং সোঽহমিত্যাত্মানমাদায় মনসৈক্যং কুর্য্যাৎ আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি স এব ব্যক্তোঽনন্তো নিত্যো গোপালঃ।"—গোপালতাপনী, উত্তরভাগ—৪৪।

যিনি গোপগণ, অর্থাৎ জীব সকলকে আত্মস্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই গোপাল বলা যায়। "ওঁ ও তৎ" এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য যে পরব্রহ্ম "তাহাই আমি" এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া "নিত্যানন্দরূপী কৃষ্ণই আমি" এইপ্রকার ভাবনা করিবে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং তিনিই গোপাল।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দ গোপালই মানুষী সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি। সেই গোপালই "গোপীজনবল্লভ" শ্রীকৃষ্ণ। গোপীজনবল্লভ কি ? শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি।"—গোপালতাপনী, পূর্ব্বভাগ—৮।

যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই পালনী শক্তি গোপী। সেই পালনী শক্তিরূপী অবিদ্যাকলার যিনি বল্লভ, তিনিই অবিদ্যার প্রেরক ঈশ্বর এবং অনন্ত জগতের অধিষ্ঠান। সুতরাং তাঁহাকেই গোপীজনবল্লভ বলিয়া জানিতে হইবে। টীকাকার বিশ্বেশ্বর এইরূপ অর্থ

* যাহা তামসী, রাজসী এবং সাত্ত্বিকী প্রকৃতির কার্য্য, তাহা ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া এস্থলে ঈশ্বরেরই রূপ বা মূর্ত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কারণ, সগুণ বিদ্যার অধিকারে শরীর ও শরীরী এক ও অভিন্ন। গীতা বলিয়াছেন, বিবেকজ্ঞান উদয় না হইলে এই ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয় না।

করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বা মায়া হইতে এই প্রপঞ্চ জগৎ জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত গোপীজন-শব্দে জগৎ জানা যায়। সেই জগতের স্বামীই গোপীজনবল্লভ। তাঁহাকে জানিলেই জগৎ জানা যায়।' সেই গোপীজনবল্লভের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি কিরূপ, তাহা উপনিষৎ বলিতেছেন ঃ—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং॥

গোপালতাপনী *। পূর্ব্বভাগ-১৩ শ্লোক।

"সৎ পুণ্ডরীকনয়নং" কি? টীকাকার অর্থ করেন ঃ—

"সৎ নির্ম্মলং পুণ্ডরীকং হৃৎকমলং নয়নং প্রাপকং যস্য তং।"

যাঁহাকে নির্ম্মল হৃৎকমলে লাভ করা যায়।

"মেঘাভং" কি? টীকাকার বিশ্বেশ্বর অর্থ করেন ঃ—

"মেঘা উপতপ্তমনসি সচ্চিদানন্দস্বরূপা আভা যস্য তং।"

সচ্চিদানন্দস্বরূপ বৈদ্যুতিক আভাবিশিষ্ট হইয়া তিনি উত্তপ্তমনে শান্তি প্রদান করিতেছেন। কৃষ্ণ-শব্দের ধাত্বর্থই সচ্চিদানন্দ—'কৃষ' সত্তা, 'ন' আনন্দ। সেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দীপ্তি পাইতেছেন। সাত্ত্বিক আনন্দ যে কি অমৃতময় পদার্থ, তাহা কেবল ধর্ম্মশীলেরাই বিশেষরূপে জানেন। যিনি সেইরূপে দীপ্তি পান, তাঁহার উজ্জ্বলতা বিদ্যুৎ-সমান। সেইজন্য তিনি পীতাম্বর। টীকাকার বলেন ঃ—

"বিদ্যুদেব বৈদ্যুতম্ তাদৃশম্ অম্বরং স্বপ্রকাশচিদাকাশমিত্যর্থঃ।"

তিনি স্বপ্রকাশ ও চিদাকাশ-স্বরূপ। যাঁহাকে প্রকাশ করিতে

* শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষদে" গোপালতাপনীর প্রামাণ্য দৃষ্ট হইবে। সেই উপনিষৎ যে ১০৮ খানি প্রধান উপনিষদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোপাল-তাপনী গণনীয়।

কিছুরই আবশ্যকতা হয় না, যিনি নিজ চিৎস্বরূপে আপনিই বিদ্যুৎ সম প্রকাশিত হইয়া আছেন, তিনিই পীতাম্বর। তাঁহার উজ্জ্বল পীতাম্বর সেই বিদ্যুৎ-সমান। "দ্বিভুজং" কি? বিশ্বেশ্বর বলিতেছেন :—

"দ্বৌ হিরণ্যগর্ভবিরাড়াত্মানৌ ভুজৌ মৌক্তিকশিল্পহেতুভূতৌ হস্তৌ যস্য তং দ্বিভুজং।"

হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌পুরুষ তাঁহার দুই হস্ত। তাঁহারাই জগৎ-সৃষ্টির কারণ এবং জগতের মূর্ত্তির হেতু। একজন জগতের সূক্ষ্ম উপাদান দিতেছেন, অন্য জন ব্যক্তিজীবের মূর্ত্তি দিতেছেন। ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তে এই হিরণ্যগর্ভের ও বিরাট্‌পুরুষের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

"জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং" কি? যিনি "তত্ত্বমসি"-রূপে সচ্চিদানন্দৈক-রসাকার মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, তিনি জ্ঞানমুদ্রাঢ্য। বিশ্বেশ্বরের অর্থ এই :—

"জ্ঞানমুদ্রা তৎ ত্বমসীতি সচ্চিদানন্দৈকরসাকারা বৃত্তিঃ তত্র আঢ্যং প্রকাশমানং।"

আর "বনমালিনমীশ্বরং" কি? তিনি শুধু জ্ঞানমুদ্রাধারী নয়, তিনি বনমালীরূপে সকলের ঈশ্বর। বনমালীর ব্যাখ্যা বিশ্বেশ্বর এইরূপ করেন :—

"বনে বিবিক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে।"

তিনি নির্জ্জন প্রদেশে স্বীয় ভক্তগণের নিকট প্রকাশমান।

আর "ঈশ্বরং" কি? না, "ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্" তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সকলেরই নিয়ন্তা।

এই সত্ত্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ "নির্ম্মল পুণ্ডরীকনয়ন, জলধরকান্তি, পীতবসন, দ্বিভুজমূর্ত্তি, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর যোগরূপ জ্ঞান-মুদ্রাধারী, বনমালাবিভূষিত, সকলের ঈশ্বর।"

এই তাঁহার সত্ত্বমূর্ত্তি। গোপালতাপনী এবং ব্রহ্মসংহিতায় এই মূর্ত্তির পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতে তিনি কেবল নির্ম্মল ও পবিত্র হৃদয়ে প্রকাশিত হ'ন। এই শরীর ও মূর্ত্তি মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষে প্রকাশিত নহে। মনুষ্যের স্থূলদৃষ্টিতে প্রাকৃত শরীরই প্রকাশিত হয়, কিন্তু সত্ত্বশরীর সেরূপ প্রকাশিত নহে। ভগবানের এই শরীর কেবল জ্ঞানী ভক্তেরাই দেখিতে পান। যিনি বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে ধ্যানযোগে জগতের পালনকর্ত্তৃরূপে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই ভক্তই কেবল তাঁহাকে গোপালরূপে দেখিতে পান। এইজন্য তাঁহার নাম গোবিন্দ। বিশ্বেশ্বর বৈদিক গোপাল-বিদ্যায় গোবিন্দ-শব্দের এইরূপ অর্থ করেন :—

"গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ।"

গো-শব্দের অর্থ বেদ বা তত্ত্বজ্ঞান। যিনি সেই বেদ বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ, তিনিই গোবিন্দ। অতএব, এই জ্ঞানচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত না হইলে সেই গোপালরূপ গোবিন্দকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি গোপবেশেই জগতের পালন করিতেছেন। তাহাই তাঁহার মধুর সত্ত্বমূর্ত্তি।

তিনি এই গোপালবেশে ধর্ম্মের পালন করেন, অন্য বেশে পাপের বিনাশ সাধন করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। সে বেশ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি * নারায়ণ। সেই বেশে তিনি পূর্ণশক্তিসম্পন্ন হইয়া রাজসিক করে শঙ্খ (পঞ্চভূত), সাত্ত্বিক করে চক্র (বালস্বরূপ মন), তামসিক

* গোপালতাপনী শ্রুতিতে চতুর্ভুজের ব্যাখ্যা এই :—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহংকারশ্চতুর্ভুজঃ।"

'দেবসুন্দরী'তে এই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

করে গদা (আদ্যা মায়া) এবং অহঙ্কার-করে পদ্ম-(বিশ্ব) ধারী হয়েন। তখন শ্রীধরের মতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমি :—

"সম্যক্‌প্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি"।

"সম্যগ্‌জ্ঞান ও বলবীর্য্যাদি শক্তি-সহকারে অবতীর্ণ হই।"

এই মূর্ত্তিরও সমুদায় রূপকময় ব্যাখ্যা বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার দশমে ভগবানের যে সমস্ত বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তদ্দ্বারাই জগতের শাসন ও পালন করিতেছেন। তিনি এই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিতে সহস্র-হস্ত। সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান ও বল-বীর্য্য-শক্তি। তাহাতেই তিনি জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্ব পার্থিব বলকে দৈববলে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন, পৃথিবীর পাপবল ধ্বংস করিতেছেন এবং অসুর-সকলের বিনাশ সাধন করিতেছেন। যাহা মনুষ্যের অদৃষ্ট, তাহা ভগবানের সুদর্শন-চক্র। সেই সুদর্শন-চক্র-বলে সমস্ত আসুরিক বলের ধ্বংসসাধন হয়। মহাভারতে এই লীলার বিকাশ। এই দেববল ও আসুরিক বল গীতার চতুর্দ্দশে বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি কিরূপ, তাহা তিনি নিজে অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সে মূর্ত্তি সহস্র বিভূতিপূর্ণ সহস্রবদন। অর্জ্জুন সেই সহস্রবদনযুক্ত ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া তাহা উপসংহার করিতে বলিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তিতে জগতের সমস্ত বিভূতি-বলই দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা ভগবানের অনন্ত বা শেষমূর্ত্তি। অগণ্য জগদ্দেশ যাঁহার অনন্তদেশে ব্যাপ্ত, সেই তাঁহার শেষ-মূর্ত্তি। সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহগণই অনন্ত নাগের ফণাস্থিত মণিস্বরূপ দীপ্তি পাই-তেছে। কিন্তু এ মূর্ত্তিও চর্ম্ম-চক্ষে পরিদৃশ্যমান নহে। যাঁহার দিব্য-চক্ষু আছে, তিনিই তাহা দেখিতে পান। সগুণ ঈশ্বরের

সকল দেবদেবীর মূর্ত্তিই ধ্যানজ। সুতরাং ভগবান্ যেরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট ও আবির্ভূত হয়েন, সেই অবতীর্ণ মূর্ত্তি সমস্ত কেবল স্বতঃ-প্রমাণেই সিদ্ধ। তাঁহার দিব্য শরীর স্থূলদর্শী অজ্ঞজনগণের নিকট সম্ভব-যুক্তিতে প্রামাণ্য এবং সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার।

বাসুদেব।

ভগবানের মূর্ত্তির কথা শেষ হইল। এক্ষণে শ্রীধরোক্ত শুদ্ধ-সত্বাত্মিকা প্রকৃতির কথা। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র। এই বসুদেব কি, তাহা পুরাণই বলিতেছেন :—

"সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হৃধোক্ষজো মে মনসা বিধীযতে॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত। ৪স্ক—৩অ।

"বসুদেব-শব্দে বিশুদ্ধ সত্বগুণ বুঝায়। কারণ, নির্ম্মল সত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশিত হন। এই নিমিত্ত সেই সত্ত্ব-স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মনোদ্বারা সতত নমস্কার-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করি।"

তন্ত্রেও ঐ কথা :—

"তুরীয়ং ব্রহ্মনির্ব্বাণং মহাবিষ্ণু শুচিস্মিতে।
সদা জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং কার্য্যকারণবর্জ্জিতং॥
নিরীহং নিশ্চলং দেবি সততং বিষ্ণুরূপধৃক্।
বসুদেবোঽপি দেবেশি বিষ্ণোরংশাত্মকঃ সদা॥"

"যোগশাস্ত্রে যাহাকে তুরীয় নির্ব্বাণ-অবস্থা বলে, সেই অবস্থাই মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু নির্গুণ ও অক্ষয় ব্রহ্ম। এই মহাবিষ্ণু আবার সগুণ এবং অন্তর্য্যামীরূপে পরমাত্মতত্ব। সেই বিষ্ণুরই অংশ আত্মরূপী বসুদেব।"

ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে যাহাই হউক, মানবীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বসুদেব আত্মার সাত্বিক অবস্থাসম্ভূত বিশেষ অবস্থা মাত্র। সেই সাত্বিক অবস্থার সহিত যখন পরমা ভক্তিরূপিণী দেবকীর সম্মিলন

হয়—সম্মিলন হয় যেমন পতির সহিত প্রগাঢ় অনুরাগে পত্নীর সম্মিলন—তখন তাহার ফল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মের আবির্ভাব। তাই শ্রীধর বলিয়াছেন যে, তিনি সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তাই তাঁহার নাম বাসুদেব। আমরা "মায়াবাদে" দেখাইয়াছি যে, শ্রীমদ্ভাগবত বাসুদেবকে মহত্তত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়াছেন। এই মহত্তত্ত্বই নির্ম্মল জ্ঞানময় শুদ্ধসত্ত্ব। যাহা নির্ম্মল জ্ঞানময়, তাহাই বিবেক-জ্ঞান। এই বিবেক-জ্ঞান উদয় হইলেই আত্মদর্শন হয়। সুতরাং সেই মহত্তত্ত্বই সাত্ত্বিক বসুদেব, সেই বসুদেব হইতেই বাসুদেবের উদয় হয়।

কৃষ্ণলীলা।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা। পুরাণে আমরা কৃষ্ণলীলা এই প্রকারে বিভক্ত দেখিতে পাই,—ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকা-লীলা এবং কুরুক্ষেত্রলীলা। জ্ঞানিগণ এই লীলাদিও আত্মার সাত্ত্বিক অবস্থাবিশেষরূপে প্রতীত করেন। সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যখন চিত্ত আধ্যাত্মিক যোগ-পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার আরাধনার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়। এই সমস্ত সাত্ত্বিক অবস্থার প্রতীতি একাদিক্রমে কৃষ্ণলীলারূপে পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। গীতার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগও তাহাই। নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন :—

"পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।"—৫মী, বল্লী।

জন্মরহিত ও অবক্রচেতা (অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশস্বরূপ) আত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। যে সত্ত্বগুণ দেহকেই আশ্রয়

করিয়া রহিয়াছে, তাহাই দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন-ভেদে নানা অবস্থায় প্রকটিত হয়। কোন লেখক বলেন :—

"মথুরা জীবের সুষুপ্তি, বৃন্দাবন স্বপ্নাবস্থা এবং দ্বারকা জাগ্রদবস্থা। স্বয়ং ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থা। সুষুপ্তি মনোবুদ্ধ্যাদির জড়াবস্থা। বাহ্যত্যাগ ও অন্তঃক্রিয়াবান্ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। ভোগ-চৈতন্যাদিগত অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলে।"

দ্বারকালীলায় আত্মা সমস্ত পাপাসুরকে দমন এবং রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সত্ত্বগুণের (বসুদেবের) আধিপত্য পরিস্থাপন করেন। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মবীরত্ব, শক্তি ও আন্তরিক বল-বীর্য্যের পরিচয় হয়। পৌরাণিক দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও বল-বীর্য্যের প্রকাশস্থান। রিপুকুলকে পরাজয় করিয়া তিনি দ্বারকাসংস্কার করিয়াছিলেন। এই দ্বারকা-সংস্কারই চিত্তসংস্কার। এই দ্বারকাবস্থায় আত্মা কর্ম্মবীর। কর্ম্মবীরত্ব লাভ করিয়া যখন জ্ঞানাধিকারী হয়, তখনও তাঁহার সংসারাসক্তি সমুদয় বিনষ্ট হয় না। তথাপি কংসরূপ ক্রূর পাপাসুর সংসারাসক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণকে সংহার করিতে চাহে। জ্ঞানযোগ দ্বারা সংসারাসক্তি একেবারে সংহার করিতে পারিলে চিত্তের অক্রূরতা-হেতু ব্রহ্মদর্শন ঘটে। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন সূর্য্যের দর্শন হয়, আত্মাতে তেমনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। জল মধ্যে অক্রূর সেইরূপ অনন্ত দেবকে দেখিয়াছিলেন। ধ্যানযোগের এই একনিষ্ঠ উৎকট চেষ্টার নাম মথুরালীলা। মথুরা-শব্দের অর্থে উপনিষৎ বলেন :—

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎ সারভূতং বদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥"—গোপালতাপনী।

"ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসার-মন্থন করিয়া যে স্থানে সংসারের সারভূত কৃষ্ণ লব্ধ হইয়াছেন, সেই ধামকে মথুরা কহে।"

আর কুরুক্ষেত্র কি? কর্ম্মযোগ দ্বারা সংসারের পুণ্য কর্ম্মক্ষেত্রে

ধর্ম্মাত্মার সাত্ত্বিকতা-সাধন দ্বারা বিজয় লাভ করাই কুরুক্ষেত্র-লীলা। এই কুরুক্ষেত্র-লীলায় কর্ম্মসন্ন্যাস-দ্বারা জ্ঞানলব্ধ মোক্ষ-প্রাপ্তি ঘটে। এই কুরুক্ষেত্র-লীলায় নরনারায়ণের একত্র মিলন ও কুরুক্ষেত্রের সমরে দুর্য্যোধনরূপ ধর্ম্মবৈরীর নিপাতসাধন হইয়াছিল। শ্রুতি কুরুক্ষেত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।
—রামতাপনী। উত্তরভাগ। ১ম খণ্ড। ১।

কুরুক্ষেত্র সর্ব্বক্ষেত্রোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কুরুক্ষেত্রই অবিমুক্ত স্থান। ইহাই দেবতাদিগের দেবপূজা-স্থান এবং সর্ব্বপ্রাণীর ব্রহ্মলোকতুল্য।"

আর হৃদয়ের সেই ধামই ব্রজপুর, যে স্থানে ভগবান্ রমণ করেন। ব্রজ-শব্দের অর্থই বিহার। জীবের সাত্ত্বিক প্রেমানন্দে মাতিয়া আনন্দময় ভগবান্ এই ব্রজধামে সাক্ষাৎ রমণ করেন। জীবের সেই আনন্দরূপিণী হ্লাদিনী শক্তিই রাধিকা। তাঁহার সহচরী গোপীগণ সেই প্রেমানন্দের অষ্ট সঞ্চারিণী-শক্তিরূপা। গো সকল সেই বেদজ্ঞানরূপ, যাহাতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে। গোপালগণ সেই গোগণে পরিবৃত হইয়া সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত সখ্যলীলা করে। আর নন্দ, যশোদা বাৎসল্যরসে ভগবান্‌কে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহার সহিত বাল্যলীলা করেন। ব্রজলীলা সমস্তই বাল্যভাবের লীলা। এই বাল্যভাব কি? শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।"
"ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে স্থিতি করিবেন।"

এই পাণ্ডিত্য কিরূপে লব্ধ হয়, গীতা তাহা বলিয়াছেন ঃ—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"—৪।১৯।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—৫। ১৮।

তবেই গীতা বলিলেন, যখন ভক্ত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মফল ভস্মীভূত করিতে পারিয়াছেন, যখন সেই জ্ঞান সমদর্শিতায় উপনীত হইয়া গো-ব্রাহ্মণ, বিড়াল-কুকুর প্রভৃতি সর্ব্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারেন, তখন ভক্ত পাণ্ডিত্যরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সেই জ্ঞান উপজাত হইলেই চিত্ত বাল্যভাব ধারণ করে। সেই বাল্যভাবে বালকৃষ্ণ গোপালরূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে রমণ করেন। এই বাল্যভাব ব্রজলীলায় ত্রিবিধ আকারে ব্যক্ত হইয়াছে—বালসখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাবে বালকৃষ্ণের সহিত ভক্তগণ ষড়্রসে রমণ করিতেছে। বালবাৎসল্য কিরূপ? মা-বাপ, শিশুসন্তান বৈ আর কিছু জানে না, সন্তানও মা-বাপ্ ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। বালসখাগণ আহারাদি ভুলিয়া কেবলই খেলায় মত্ত। যদি সখ্য কখন সম্ভব হয়, তবে বুঝি বাল্যকালেই সম্ভব। আর বালপত্নী হাজার কাজকর্ম্ম করুক না কেন, তাহার মন পড়িয়া রহিয়াছে সেই বালপতির প্রতি, যাহার সহিত নির্জ্জন-বাসে রাত্রিকালে তাহার অকপট ও মনখোলা প্রণয়ালাপ ও সম্ভাষণ। গোপীগণ এইরূপ কান্তাভাবে পরিপূর্ণ। ব্রজধামে এই বালক-বালিকাগণের সরল ভাবের অকপট প্রেমলীলা—ভগবানের সহিত ভক্তের ঐকান্তিকী ভক্তির লীলা—প্রত্যক্ষীভূত ভগবানের সহিত যোগিগণের আধ্যাত্মিক লীলা স্থূল অবয়বে প্রকটিত। এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম লীলা কি মিথ্যা? না, তাহা রূপময় রূপক বলিয়া অসত্য। যিনি তাঁহাকে সখাভাবে ভাবেন, তিনি তাঁহাকে

ব্রজরাখালগণের মত এবং অর্জ্জুনের মত সখারূপেই সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিতে অনুভব করেন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।"

"তাঁহাকে যে যে-ভাবে ভাবে, তাঁহার নিকট তিনি সেইরূপই হন।"

তবেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যিনি ভগবানের যে ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি ভাবেন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপে অনুভব করেন। যিনি ঐশ্বর্য্য-শালী তিনিই ঈশ্বর ; এই ঈশ্বরই অপর ব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। যিনি অপর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। সুতরাং নিস্ত্রৈগুণ্য-সাধন না করিলে পরব্রহ্মপদ লাভ করা যায় না। এইজন্য গীতা বলিয়াছেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

ভগবানের জন্মকর্ম্ম জানিলে কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা পর শ্লোকেই সেই উপায় বলিয়া দিয়াছেন :—

"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥"—৪।১০।

যাঁহাদের অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ—সমস্তই অপগত হয় এবং সেই হেতু চিত্ত-স্থির হয়, সেই শুদ্ধ ও স্থিরচিত্তে যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাই সেই আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সারূপ্য লাভ করেন।"

গীতা এই স্থানে সেই ত্রিবিধ উপায় বলিয়া গেলেন—দ্বারকা, মথুরা ও কুরুক্ষেত্র এবং ব্রজভাব। রাগ, ভয়, ক্রোধাদি অপগত হইয়া চিত্ত-শুদ্ধি ও স্থৈর্য্য জন্মিলেই দ্বারকালীলা জানিতে পারা যায়। আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা মথুরা ও কুরুক্ষেত্র উপলব্ধ হয়।

আর সামীপ্য-লাভই মদ্ভাব-প্রাপ্তি ব্রজরমণ। গীতা বলিতেছেন, এই সমস্ত লীলা যিনি প্রকৃতপক্ষে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হয়েন। স্বপ্নেশ্বর বলেন, তাঁহার লীলাদির জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয় না। কারণ, যাঁহারা স্থূলদর্শী এবং পুরাণের স্থূল অবতারবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে লীলাদির জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু নহে। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী এবং বৈদিক শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মদর্শন ঘটে। তাঁহারা আত্ম-হৃদয়েই কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বিকাশ দেখিতে থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মের দিব্যজ্ঞান বশতঃ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে এবং সারূপ্য মুক্তিলাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"—১৪।২৭।

শ্রীধর এইরূপ অর্থ করেন ঃ—

যেমন ঘনীভূত প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল, তেমনি আমি ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি ; এবং নিত্যমুক্তত্ব-হেতু আমিই নিত্য-মোক্ষের প্রতিষ্ঠা ; শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকত্ব-হেতু আমিই মোক্ষসাধন সনাতন ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি ; পরমানন্দ-স্বরূপত্ব হেতু আমিই ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা। অতএব, মৎসেবক পুরুষ অবশ্যই মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যেরূপ, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। শ্রীরাম-চন্দ্রের এবং অপরাপর দেব-দেবীর তত্ত্বও এইরূপ। এই সূক্ষ্ম কৃষ্ণ-তত্ত্বের সহিত পৌরাণিক স্থূল অবতারবাদের যেরূপ সামান্য বিভিন্নতা, তাহা বোধ হয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এই বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী রূপে সকলের অন্তরেই বর্ত্তমান। সাধকের হৃদয়ে তিনি সাধনা-প্রভাবে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েন। তাঁহার সেই

আবির্ভাবই জন্ম এবং তাঁহার লীলাদি সাত্ত্বিক ভাবের বিরাট্ বিকাশ। এই সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ সমস্ত একাদিক্রমে স্থূল-লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই, গীতার যে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সে স্থলে ব্যাস অর্জ্জুনের মুখ দিয়া তাঁহার জন্ম-কর্ম্মের সহিত মানুষ জন্ম-কর্ম্মের যে আকাশ-পাতাল-ভেদ, তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। যখন ব্যক্ত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্ম সমস্তই দিব্য, তখন অর্জ্জুন সে কথার বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তবে নিরস্ত হইলেন। স্বপ্নেশ্বর সামান্য-বুদ্ধি ভক্তজনগণের জন্য বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ দিব্য শরীর গ্রহণ করেন এবং সেই শরীরের চেষ্টিত-সকল দিব্য কর্ম্ম। এ কথা সূক্ষ্ম-তত্ত্বদর্শিগণের নিকট তখন অর্থপূর্ণ হয়, যখন তাহা বৈদিক সূক্ষ্ম কৃষ্ণ-তত্ত্বের সহিত সমঞ্জসীভূত করা হয়। নহিলে, উহার প্রকৃত অর্থ সামান্য বুদ্ধিতে সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। ব্যাস এই কৌশলে দুই দিক্ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবান্ সূক্ষ্ম শক্তিময় দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই মনুষ্যলোকে আধ্যাত্মিক লীলায় নিরত থাকিয়া ভোক্তৃরূপে ভূতগণকে সংসারলীলা করাইতেছেন। ভোগ্যরূপে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং আবার যোগরূপ ধারণ করিয়া যোগী-রূপে সেই জীবকে মুক্তিপথে আনিতেছেন। তাঁহার এই লীলা এবং জন্মকর্ম্ম এইরূপে দিব্য; শুদ্ধ দিব্য নহে, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের নিত্য নিয়ম; এ জন্য সেই লীলা নিত্য। পুরাণাদির অব-তারবাদ এই নিত্য আধ্যাত্মিক লীলার বিরাট্-বিকাশ। রামায়ণ, মহাভারতাদিতে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিত্য-লীলা। কিরূপ নিত্যলীলা তাহা "কাব্যচিন্তা"য় কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবানের এই অনন্ত লীলা অতি সূক্ষ্ম ; যেহেতু ভগবানের অনন্ত শরীরই সূক্ষ্ম শক্তিময়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মহত্তত্ত্বরূপা মহামায়া সর্ব্বশক্তির আধার হইয়া অনন্ত ঈশ্বরের শাক্তশরীর। এই মহত্তত্ত্বরূপা মহামায়া শুদ্ধ-সত্ত্ব, নির্ম্মল জ্ঞানপূর্ণ, সর্ব্ববিৎ এবং আনন্দময় কোষ। এ জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—ভগবানের সত্ত্বমূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দ-রসস্বরূপ। তাঁহার রাজসী মূর্ত্তি আনন্দঘন এবং তামসী মূর্ত্তি বিজ্ঞানঘন। সেই বিজ্ঞান ঘন ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া এই বিশ্বরূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। পুরুষপ্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে নিত্যকাল অভিন্ন থাকিয়া এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। গীতা সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—৭—৫।৭।

"হে মহাবাহো! এই আট প্রকার প্রকৃতি কিন্তু অপরা (নিকৃষ্টা), ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার যে অন্য একটী জীবস্বরূপ, চেতনময়ী প্রকৃতি আছে, তাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।

এই পরা প্রকৃতিই ভগবানের অনন্ত শাক্ত শরীর ; আর অপরা প্রকৃতি এই জগতের অনন্ত জীবময় শরীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভগবান্ এই শাক্তশরীর দ্বারা কিরূপ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহাও গীতায় বর্ণিত হইয়াছে :—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥"—৭।২৪।

"আমি অব্যক্ত কিন্তু অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য, সর্ব্বোত্তম, পরম অব্যয়-স্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্মাদি জ্ঞান করিয়া থাকে।"

এই স্থানে তাঁহার অবতারতত্ত্বের সমুদায় রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ভগবান্ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, শক্তিময়রূপে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন। এই অব্যক্তরূপই গীতোক্ত বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি। তিনি স্বকীয় পরা প্রকৃতির শক্তি-বলে অন্তর্যামী হইয়া যথানিয়মে এই বিশ্বের পাপ-তাপের বিনাশ-সাধন করিয়া যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতেছেন। তাহাই তাঁহার অধিদৈবত নিয়ন্তৃশক্তি। সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিই দেবদেবী ; সেই নিয়ন্তৃশক্তিতে তিনি নিত্য-কাল এই জগৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টিকালে এই শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং কেবল মহাপ্রলয়ে তাহার লয়সাধন হইবে। নহিলে নিখিল স্থিতিকাল ব্যাপিয়া সেই শক্তি নিত্যরূপে বর্ত্তমান আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাঁহার আবির্ভাব আছে, কিন্তু তিরোভাব নাই। সুতরাং সেই শক্তিবলেই তিনি নিত্য-কাল স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কখন তামসী, কখন রাজসী, কখন সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিতে এই জগতের শাসন ও লালনপালন করিতেছেন। তিনি নিমিত্ত-কারণরূপে যখন যখন জগতে আবির্ভূত হয়েন, তখনই লোকে তাঁহার দেবশক্তির অবতরণ দেখিতে পায়। জ্ঞানিগণ তাঁহার হস্ত সততই দেখিতে পাইতেছেন, অল্পবুদ্ধি মায়ামুগ্ধ জনগণের মধ্যে যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পায়। নহিলে ভগবান্ অনন্তরূপে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বাত্মারূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা, বিধাতা ও নিয়ন্তা হইয়া বিশ্বধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাই বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভগবদ্বাক্য।

এখন কথা এই, গীতার কৃষ্ণতত্ত্ব যে সূক্ষ্মদর্শিগণের নিকট স্থূল অবতারবাদ বলিয়া স্বীকার্য্য নহে, যাহা বৈদিক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন, সেই সূক্ষ্মদর্শিগণ গীতাকে ভগবদ্বাক্য বলিবেন কিরূপে? ব্যাস বলিয়াছেন, গীতা উপনিষদ্বাক্য; শাণ্ডিল্য বলেন, গীতা ভগবদ্বাক্য। গীতা ভগবদ্বাক্য বলিয়া তাহা বেদবৎ প্রামাণ্য। শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্তর্যামী ভগবান্ হয়েন, তবে গীতোপদেশ সকল ভগবানের উপদেশ কি রূপে হয়? এ কথার প্রমাণ গীতা নিজেই দিয়াছেন। ভগবান্ বলিতেছেন:—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"—গীতা—১৫।১৫।

আমিই সর্ব্ববেদ-দ্বারা জ্ঞাতব্য, আমিই বেদান্তকৃৎ এবং বেদার্থবেত্তা। সর্ব্ববেদ দ্বারা আমি জ্ঞাতব্য কিরূপে? শ্রীধর অর্থ করেন:—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব বেদ্যঃ।"

বেদদ্বারা তত্তদ্দেবতারূপে আমি বেদ্য। তবেই শ্রীধর বলেন, বেদের দেবতা সকলকে যিনি ভালরূপে বুঝিয়াছেন, তিনিই পরমাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। বৈদিক দেবতা-সমস্ত পরমেশ্বরেরই অভেদ মূর্ত্তি মাত্র। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ২১ ও ২২ শ্লোকদ্বয় এবং নবমের ২০ ও ২১ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীধরের টীকার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার অভিপ্রায় আরও বিশদ হইয়া যায়। গীতাও এ কথার অর্থ ক্রমে খুলিতেছেন। গীতা বলিতেছেন, ভগবান্ বেদান্তকৃৎ এবং বেদবিৎ। ভগবান্ বেদান্তকৃৎ কিরূপে? শ্রীধর বলেন:—

তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকো জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ।

বেদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরুরূপে ভগবান্ বেদান্তকৃৎ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাণিনির অনুশাসনে প্রকাশিত যে, বৈদিক ঋষিগণ-কর্ত্তৃক বেদ উক্ত হইয়াছে মাত্র, তাঁহারা বেদের প্রণেতা নহেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ঋষি-শব্দের অর্থই মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে পরিদৃষ্ট হয় যে, এই ঋষিগণের মানসযজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র-সকল এবং সাম-সঙ্গীত সকল প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা হইতেই ছন্দঃ সকল এবং তাহা হইতেই যজুর্মন্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইল। বেদের এ সমস্তই রূপক কথা মাত্র। যতিগণ সিদ্ধ হইয়া যখন ব্রহ্মভাব লাভ করেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা বেদার্থ সকল সুস্পষ্ট দর্শন করিতে থাকেন। জীব কখন ব্রহ্মত্বলাভ করেন? গীতা বলিতেছেন :—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥—১৪।১৯।

জীব যখন প্রকৃত দ্রষ্টা অর্থাৎ বিবেকী হইয়া ঠিক বুঝিতে পারেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণ দ্বারাই সমস্ত জগৎ চলিতেছে, এই গুণত্রয় ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাই, আত্মা সেই গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র এবং কিছুতেই লিপ্ত নহেন, জীব যখন এইরূপ দর্শন করেন, তখন তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্বলাভ করেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে :—

"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।—১০ অ-২।

আমিই সর্ব্বপ্রকারেই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ অর্থাৎ তাঁহাদিগের উৎপাদক এবং বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তক।

এই মহর্ষি ও যতিগণ যখন সিদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহারা সর্ব্ববিৎ হয়েন :—

"যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥"—১৫ অ—১৯।

"হে ভারত! যিনি নিশ্চিতমতি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বপ্রকারে আমায় ভজনা করেন এবং তিনিই সর্ব্ববিৎ হয়েন।"

দেবৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া যতিগণ সমাধিবলে বেদোক্ত সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত করিয়া জানিতে পারেন। যখন তাঁহারা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া সর্ব্ববিৎ হয়েন, তখন তাঁহাদের অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। অধ্যাত্ম-জগতের সমুদায় নিয়মাবলী, যাহা চিরকাল প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং যাহা বৈদিক নিত্য নিয়ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা বেদের গুরু ও বেদার্থবেত্তা হয়েন।

গীতার এই সাক্ষ্যদ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হইতেছে এবং বেদ ও গীতা যে কিরূপ ভগবদ্বাক্য, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে জীবের আত্মাতেই বিরাজ করিতেছেন। যখন জীবের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং যখন জীব সেই চিত্তে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হন, তখন তিনি ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সেই শুদ্ধচিত্তে প্রতিবিম্বিত দেখেন; তিনি তাঁহার সত্ত্ব-মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জীবের মায়া এবং মায়াসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। জীব যখন সাধনা-বলে এই মায়া হইতে বিমুক্ত হয়েন, তখন তাঁহার আত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ প্রভাসিত হইয়া পড়ে। গগন পরিষ্কৃত হইলে যেমন সূর্য্যের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ মায়ার ঘোর যতদিন না কাটিয়া যায়, ততদিন আত্মস্বরূপে ভগবান্ দেখা দেন না। আত্মস্বরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হইলেই সমস্ত অধ্যাত্ম-জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মজ্ঞানে সমস্ত বেদ ও বেদজ্ঞান উপলব্ধ হয়। ব্যাস সেই আত্মজ্ঞান গীতা মধ্যেই নিহিত করিয়াছেন; এবং এই জন্য গীতাকে উপনিষদ্বাক্য বলিয়া

অভিহিত করিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতায় বলিয়াছিলেন, আমি যোগারূঢ় হইয়া যে গীতোপদেশ দিয়াছি, হে অর্জ্জুন, সে সমুদায় কথা সামান্য অবস্থায় সম্যক্ উপলব্ধ হইবার নহে। আত্মাতেই সমস্ত অধ্যাত্ম-জ্ঞান নিহিত আছে, কিন্তু সে অধ্যাত্মজ্ঞান বিকাশ হইতে গেলে অবস্থা-বিশেষের অপেক্ষা করে। জীব যতদিন না সেই অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন, ততদিন তাহার গীতোপদেশ-সমস্ত আত্মানুভূতিরূপে প্রতীত হয় না। এ জ্ঞান সর্ব্ব মানবে ও সর্ব্বকালে সমান; উহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু এই আভ্যন্তরিক (Intuitive) নির্ম্মল জ্ঞান বিকাশ হইবার জন্য বিশেষ যোগ-সাধনা চাই। সিদ্ধ ব্যক্তির অন্তরে ভগবানের বাক্য শ্রুত হয়। তাই সেই শ্রুতি-পরম্পরায় বেদ চলিয়া আসিতেছে। তাই গীতাও বেদবৎ ভগবদ্বাক্য।

শুদ্ধ ভগবদ্বাক্য হইলেই কি গীতার বেদত্ব প্রতিপন্ন হইল? শাণ্ডিল্য বলেন, যাহা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য, তাহাই বেদ। অতএব আমাদের এখনও প্রমাণ করা চাই যে, গীতা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য। আমরা ইহার পর গীতার সেই প্রমাণে প্রবৃত্ত হইব।



গীতার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ।

অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য কি ?

বিগত প্রস্তাবে আমরা যে স্বতঃ-প্রমাণের কথা বলিয়াছি, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তাহারই স্পষ্টাভিধান মাত্র, তাহা প্রমাণান্তর নহে। যাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, স্বপ্নেশ্বর দুই কারণে ভগবদ্গীতার বেদত্ব স্থাপন করিতে চান। প্রথমতঃ তাহা পৌরাণিক এবং বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ শ্রীকৃষ্ণোক্তি-রূপে ভগবদ্বাক্য। দ্বিতীয়তঃ তাহা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্যরূপে বেদবৎ প্রামাণ্য। ন্যায়শাস্ত্রমতে শব্দ-প্রমাণ দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ সামান্য প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাকে দৃষ্টার্থক এবং যাহার অর্থ তদ্রূপ নহে, কিন্তু অন্য প্রকারে দৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক কহে। যাহা বেদ-প্রতিপাদ্য, তাহা যে শুদ্ধ দৃষ্টার্থক বিষয় এমত নহে, বেদ অলৌকিক দৃষ্টি-বিষয়ক অর্থেরও প্রমাণ। গীতোক্ত বিষয়ও যে তদ্রূপ অলৌকিক দৃষ্টির বিষয় হইয়া বেদবৎ স্বতঃ-প্রমাণ হইয়াছে, তাহাই এই প্রস্তাবে আলোচিত হইতেছে।

E. B. Cowell সাহেবও ন্যায়ানুসারেই শাণ্ডিল্যের "অদৃষ্টার্থক"-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

"We however affirm that what constitutes a Veda is the fact of its being uttered by a Divine Person and relating to an *unseen object*, and this character is not wanting in the Gita."

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যে ভগবদ্বাক্যার্থ মনুষ্যের সামান্য প্রত্যক্ষগোচর নহে, তাহাই অদৃষ্টার্থক। কিন্তু গীতা বলিয়াছেন, জীব

যখন পুরুষোত্তমকে জানেন, তখন তিনি সর্ব্ববিৎ হয়েন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মানুসারে ভগবচ্ছক্তি লাভ করিয়া অদৃষ্ট বিষয় জানা মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে। উপনিষদে আছে :—

"বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥"—প্রশ্নোপনিষৎ।

"হে সৌম্য, যাঁহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করেন।"

অদৃষ্টকে স্বতঃ-প্রমাণে সুদৃষ্ট করিতে হইলে মনুষ্যকে দেবত্বে উঠিতে হয়। বেদ অদৃষ্ট বিষয়-সমুদয় জ্ঞানগোচর করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বেদত্ব ঘটিয়াছে। গীতাও তদ্রূপ। গীতাও এই সমস্ত অলৌকিক এবং অদৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন :—(১) আত্মার সত্তা, নিত্যত্ব ও স্বরূপ-তত্ত্ব ; (২) আত্মার ঐহিক এবং পারলৌকিক নানাবিধ গতি ; (৩) আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ; (৪) আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ ; (৫) সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ; (৬) ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ বা পুরুষ-প্রকৃতি-জ্ঞান ; (৭) জগতের স্বরূপতত্ত্ব এবং (৮) জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের সাধনোপায় বা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ।

গীতোক্ত এই বিষয়-সমুদায় যে অদৃষ্টার্থক, আমরা গীতার আত্ম-তত্ত্ব হইতে তাহা প্রদর্শন করিব।

আত্মা ও পরলোক।

যদি আপ্তবাক্য ছাড়িয়া দাও, তবে হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে আত্মা ও পরকালের সত্তা প্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় সম্ভব-যুক্তি। তর্ক-দ্বারা আত্মা এবং পরকালের কেবল সম্ভাবনা

মাত্র অনুমেয় হয়, কিন্তু উহাদের সত্তা স্থাপন করা যায় না। গীতা সেই কথা বলিতেছেন :—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥"—১৫ অ—১১।

শ্রীধর অর্থ করিতেছেন :—

ধ্যান দ্বারা প্রযতমান বিশুদ্ধ যোগিগণই আত্মাকে দেহে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে দেখিতে পান, কিন্তু যাঁহারা অবিশুদ্ধচিত্ত সুতরাং মন্দমতি, তাঁহারা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মার দর্শন পান না। বেদেও এই কথা :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"—কঠ, দ্বিতীয়া বল্লী—২৩।

এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা (গ্রন্থার্থধারণাশক্তি) বা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"—ঐ—২৪।

দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও (সামান্য জ্ঞান) আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"—ঐ—৯।

"তুমি যে আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্য নহে।"

গীতা ও বেদ এই কথায় সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিরস্ত করিয়া দিতেছেন। এ কথা না মানিয়া যাঁহারা আত্মার সত্তা তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে যান, তাঁহারা অবশেষে হতাশ হইয়া গীতা এবং বেদের উক্ত কথাই সপ্রমাণ করেন। সামান্য বুদ্ধিতে আত্মার উপলব্ধি হইবার বিষয় নহে। সামান্য জ্ঞানে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা চিত্ত হইতে পারে, দেহ বা মন হইতে পারে, কিন্তু তাহা

আত্মা নহে। আত্মা প্রাণ নহে, মন নহে। যদি বল, আত্মা প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য :—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং" ।—তলবকারোপনিষৎ।

তাহা হইলেও সামান্য বুদ্ধিতে "মনের মন" বলিলে কিছুই উপলব্ধি হয় না। বাস্তবিক, ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক পরিমিত জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে জানিবার যো নাই। আত্মা যে কি পদার্থ, তাহা কেবল সিদ্ধ যতিগণই উপলব্ধি করিয়াছেন; উপলব্ধি করিয়া আত্মার স্বরূপতত্ত্ব ও প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় এবং অষ্টম অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপতত্ত্ব অনেক-পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। মনের সহিত আত্মার বিভিন্নতা সেই স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়।

অজ্ঞান ও মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট আত্মা প্রকাশিত হ'ন না। যাঁহারা ব্যাবহারিক জ্ঞানে মহাজ্ঞানী বলিয়া অভিমানী, যাঁহারা লোকে পণ্ডিত বা মহা বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিখ্যাত অথচ যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা পরম জ্ঞানী নহেন। আত্মজ্ঞানিগণের নিকট তাঁহারা পণ্ডিত-মূর্খ। বেদান্ত বলিতেছেন :—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥" কঠ—দ্বি-বল্লী ৫।

"যাঁহারা অজ্ঞান, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অতিশয় কুটিল ভাবে নানা পথে চালিত হইয়া অন্ধ-কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন।"

সম্যক্ আত্মজ্ঞান অভাবে বিদ্বদ্গণও আত্মাকে কিরূপ বোধ করিতে থাকেন, গীতা তাহা বলিতেছেন :—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"—২।২৯।

"কেহ বা শাস্ত্র ও গুরূপদেশ দ্বারা আত্মাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত

দর্শন করেন। সর্ব্বগত, নিত্য, জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মার অলৌকিকত্ব হেতু তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিকবদ্‌ঘটমান দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন। সুতরাং আত্মবাদকে আশ্চর্য্যবাদ বলিয়া প্রতীত করেন। কেহ বা ঐরূপ আশ্চর্য্যবৎ, অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া বর্ণন করেন। কেহ বা অন্যের নিকট হইতে আত্মাকে ঐরূপ আশ্চর্য্য ভাবান্বিত বলিয়া শ্রবণ করেন। কিন্তু ঐরূপ দেখিয়া, বলিয়া ও শ্রবণ করিয়া কেহই আত্মার স্বরূপতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

বেদান্তেও এই কথা ঃ—

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥" কঠ - দ্বি, বল্লী—৮।

ইনি (আত্মা) হীনমনুষ্য-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে সুবিজ্ঞেয় হয়েন না। যেহেতু অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারে ভাবে। শ্রেষ্ঠাচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে আত্মাকে জানা যায় না। যেহেতু আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা আত্মতত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন নাই, যাঁহারা কেবল অনুমানের বা তর্কের আশ্রয়ে আত্মতত্ত্বনির্ণয়ে উদ্যোগী হয়েন, কিংবা যাঁহারা হীনাচার্য্য-কর্ত্তৃক পরকাল এবং আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে উপদিষ্ট হয়েন, তাঁহারা হয় ত ঘোর জড়বাদে, না হয় আশ্চর্য্যবাদে, না হয় দেহাত্মবাদে উপনীত হয়েন। তাঁহারা গীতা এবং উপনিষৎ-মতে আত্মঘাতী।

গীতা বলিতেছেনঃ—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"—১৩।২৮।

যিনি ভূতমাত্রেই পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুতভাবে অবস্থিত দর্শন

করেন, তিনি আপনা-দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না, তজ্জন্য শ্রেষ্ঠগতি লাভ করেন।

এই শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ খুলিয়া শ্রীধর বলিতেছেন :—

"যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি।"

যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুতভাবে না দেখেন, সেই দেহাত্মদর্শী দেহের সহিত আত্মার বিনাশ দর্শন করেন।

শ্রুতি বলেন :—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।"—ঈশোপনিষৎ।

যাঁহারা অবিদ্যা-বশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাঁহারা আত্মঘাতী। তাঁহারা দেহান্তে আলোকহীন এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত অসুরলোকে গমন করে।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে।"—কঠ—২।৬।

"চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন বালকসদৃশ অবিবেকীর নিকট পরলোকে প্রয়োজনীয় উপায় প্রকাশিত হয় না; কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।"

বেদ-মতে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন অবিবেকী, তাঁহারা হাজার বিদ্যাবুদ্ধি (ব্যাবহারিক) সম্পন্ন হউক না কেন, তাঁহারা আত্মা এবং পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে ঘোর অন্ধ। সুতরাং তাঁহাদের দেহাত্মবাদে আসিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তবে যাঁহারা না আসেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠাচার্য্য (জ্ঞানিগণের) উপদেশে আস্থাস্থাপন করিয়া ঐ দুই তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া লয়েন। বিশ্বাস-স্থাপন পূর্ব্বক, ইহলোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সাংদৃষ্টিক-ন্যায়ে পরলোক এবং আত্ম-অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করিতে যান। সেই অনুমান ও তর্ক-

দ্বারা কেবল সম্ভাবনা-মাত্রই প্রতিপন্ন হয়। আত্মা এবং পরলোকের নিশ্চিত জ্ঞান হয় না। শ্রেষ্ঠাচার্য্যগণ আত্মজ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই উপদেশ-মত সাধনা করিলেই আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। উপনিষৎ বলিতেছেন :—

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"—কঠ—২বল্লী—১২।

সেই দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, প্রতিবিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম (ইন্দ্রিয়াতীত, সূক্ষ্ম, পরম-জ্ঞান-মাত্র-গ্রাহ্য) স্থানে অবস্থিত, পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগ-দ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ-শোকের অতীত হয়েন।

এই অধ্যাত্ম-যোগই অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক পন্থা।

গীতা বলিতেছেন :—

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥"—১৫—১০।

"যাঁহারা আত্মজ্ঞানবিমূঢ়, তাঁহারা আত্মাকে কোন অবস্থাতেই দেখিতে পান না। আত্মা যখন এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন, তখন দেখিতে পান না; যখন তিনি সুখ-দুঃখ-মোহাদি গুণযুক্ত হয়েন, তখনও দেখিতে পান না। এইরূপ আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও আত্মজ্ঞানাভাবে তাঁহারা আত্মদর্শনে সমর্থ নহেন। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুঃ বিবেকিগণ আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারেন।"

এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কেবল অধ্যাত্মযোগ-দ্বারা পুরাতন আত্মাকে—যিনি হিরণ্ময় হৃদয়কোষে অবস্থিত, * যিনি দিব্য-জ্যোতিতে নিজ গৃহরূপ হৃদয়কে হিরণ্ময় করিয়াছেন,—সেই দিব্য-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন নির্ম্মল আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম-যোগেই জ্ঞানচক্ষুঃ লাভ হয়। এই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা আত্মদর্শন ঘটে। সেই জ্ঞানচক্ষুঃ যাহাদের নাই, তাহারা কাজে-কাজেই জড়বাদী,

---

* হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।—মুণ্ডক শ্রুতি।

না হয় দেহাত্মবাদী হইয়া পড়েন। এই জ্ঞানচক্ষুঃ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিগণের উপদেশ-বাক্যে যাঁহারা আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই কিয়দংশে আত্মজ্ঞান-লাভ এবং পরলোকে বিশ্বাস-স্থাপন হয়। নহিলে সামান্য বুদ্ধিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা বিবেক লাভ হয়। বিবেক-লাভেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

হিন্দুধর্ম্ম, আত্মা ও পরলোকের সত্তা এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম বলেন, লৌকিক জ্ঞানে অলৌকিক বিষয় প্রতিপন্ন হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অলৌকিক বিষয় জানিবার জন্য অলৌকিক দৃষ্টি চাই। সেই অলৌকিক দৃষ্টি-প্রভাবে বৈদিক ঋষিগণ এবং সিদ্ধ যতিগণ, আত্মা এবং সেই আত্মার পরকালের গতি-সমস্ত বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাসই পরলোকের প্রমাণ। এই বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম হইতে জগতে ঐ দুই মহান্ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুই মহান্ তত্ত্বই সর্ব্বধর্ম্মের মূল-ভিত্তি। সুতরাং যে দুই মূলতত্ত্ব সর্ব্ব ধর্ম্মপ্রণালীর মূল, কেবল বৈদিক ধর্ম্মই তাহা সুপ্রণালীসিদ্ধ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অতএব, এই সনাতন ধর্ম্মই অপর সমস্ত ধর্ম্মপ্রণালীর মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা।

যে জ্ঞান অলৌকিক বিষয়ে লইয়া যাইতে পারে, তাহাই হিন্দু জ্ঞানিগণের গণনায় প্রকৃত বিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বিবিধ—পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা। বেদবাক্য এই :—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।"

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

"ব্রহ্মবিদেরা বলেন, দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য—পরা ও অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই সমস্ত অপরা বিদ্যা। যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই উপনিষদুক্ত পরা বিদ্যা।"

পরা বিদ্যা মোক্ষের হেতু, অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যাতে লইয়া যায়। অপরা বিদ্যা দ্বারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সেই জ্ঞানলাভ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান কেবল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই; নহিলে সে জ্ঞান কিছুই নহে। কার্য্যে পরিণত করিলে তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং বাসনা হইতে চিত্তকে ফিরাইয়া তাহা ঈশ্বরে সন্ন্যস্ত করিতে পারা যায়। এরূপ করিতে পারিলে তখন আত্মা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়। অপরাবিদ্যা এইরূপে পরাবিদ্যাতে চিত্তকে লইয়া যায়।

গীতা উপদেশ দিয়াছেন, কর্ম্মযোগে জীব পরিশুদ্ধ হইয়া মায়া-ময় (বা অবিদ্যাময়) সংসারধাম হইতে পরমার্থধামে প্রবেশ করেন। কর্ম্মযোগ তাহাকে জ্ঞানযোগের জন্য প্রস্তুত করে। কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানবীজ-রোপণের জন্য ভূমি পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ হয়। জীবের চিত্ত হইতে সংসার অপসৃত হয়, মায়াকণ্টক ছেদিত হয় এবং যে হৃদয়ে অগ্রে অসুরের প্রভুত্ব ছিল, তথায় ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কর্ম্মযোগের বিশুদ্ধ এবং পবিত্র পন্থা ধরিয়া যে সাংখ্যযোগে উপনীত হন, তথায় আসিয়া তাঁহার দিব্য জ্ঞানচক্ষুঃ ফুটে। সেই দিব্য জ্ঞানচক্ষুঃ-বলে তিনি অধ্যাত্ম-জগতের সমস্ত গূঢ় রহস্য দেখিতে পান—দেখিতে পান—আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগৎ, পুরুষ-প্রকৃতি, ইহলোক এবং পরলোক।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার যায়; আমি হর্ত্তা, আমি কর্ত্তা এই জ্ঞান বিনষ্ট হয়। এই অহঙ্কার গেলে প্রকৃত আমি যে আত্মা ও ব্রহ্ম, তত্ত্বজ্ঞানে সেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞান সর্ব্বজ্ঞানের মূল; সেই আত্মজ্ঞান হইতে অনাত্ম দেহ ও জগৎজ্ঞান জন্মে; এবং এই আত্মজ্ঞানে আত্মার নিত্যত্ব ও পরলোক প্রতিপন্ন হয়। যাঁহার প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিকট স্বয়ং ব্রহ্মও অপ্রত্যক্ষ থাকেন না। একে একে সমস্ত তত্ত্বই তাঁহার জ্ঞানগোচর হয়। তাই গীতা বলিতেছেন "যজ্‌-জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে—" যাহা জানিলে আর অন্য কিছু জানিবার বাকী থাকিবে না; এবং :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬অ—২৯।৩০।

"যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে এবং যিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করেন, সেই সমাহিতচিত্ত সমদর্শী যোগী ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সমস্ত ভূত দর্শন করেন। এরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা যিনি আমাকে (ভগবান্‌কে) সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতই আমাতে দর্শন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করি।"

এ বাক্যের শ্রুতি এই :—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা॥"

যে ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতে সকল

ভূত দর্শন করেন, তিনিই পরমব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। অন্য আর কোন কারণে পরমব্রহ্ম পাওয়া যায় না।

উপনিষৎ বলিতেছেন :—

"যথাদর্শে তথাত্মনি।"—কঠ—ষষ্ঠী বল্লী—৫।

"যেমন আদর্শের প্রতিবিম্বে লোক আপনাকে দর্শন করে, তেমনই আত্মাতে (আপনাতে) জ্ঞানী ব্রহ্মদর্শন করেন *।

আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে যে স্বয়ং ঈশ্বরও প্রত্যক্ষ হন, তাহার কারণ গীতা বলিতেছেন :—

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।" ৮ অ-৩।

যিনি পরম অক্ষর, তিনি পরমাত্মরূপে জগতের মূলকারণ-রূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মেরই যে স্বভাব বা স্বকীয় ভাব, যাহা জীব-রূপে প্রকাশ, সেই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম কহে। তাই অধ্যাত্ম-যোগ, আত্ম-প্রকাশক হইয়া ব্রহ্ম-প্রকাশক হইয়াছে।

অন্যত্র গীতা বলিতেছেন :—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"—১০।২০।

হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্মা।

উপনিষৎ বলিতেছেন :—

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।"—কঠ—২।২০।

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত।

"ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি।"—প্রশ্নোপনিষৎ—৬—২।

---

* ভেদবাদী শৈব নীলকণ্ঠ একথার যে পূর্ব্বপক্ষ তুলেন, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যকৃত 'শঙ্কর-বিজয়ে" সেই বিচার দৃষ্ট হইবে।

হে সৌম্য! যাঁহাতে এই ষোড়শকলা * উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অন্তঃশরীরে (হৃদয়ে) বিদ্যমান আছেন। গীতা যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মেরই অংশ জীব, এ কথা শুদ্ধ ভেদজ্ঞানীর সুবোধার্থ। যতদিন জীবের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে, যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততদিন সম্যক্ জ্ঞান উদয় হয় না; সুতরাং জীব অনন্তের অংশ-রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই ভেদজ্ঞান-বশতই জীবের জগৎ-সৃষ্টিজ্ঞান হইতেছে। এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে আর জীবজ্ঞান থাকে না, সুতরাং সৃষ্টিজ্ঞানও তিরোহিত হয়। তখন কেবল অনন্ত ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ হয়েন।

এই ভেদজ্ঞান পঞ্চবিধ ঃ—

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা ॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ। ইত্যাদি—শ্রুতি।

"জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জীবে ভেদ, এবং জড়ে জড়ে ভেদ, এই পঞ্চ ভেদের নাম প্রপঞ্চ।

---

* ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের চতুর্থ প্রপাঠকে এই ষোড়শকলা বর্ণিত হইয়াছে পূর্ব্বাদি চারিটি দিক্ চারিটি ব্রহ্মকলা, এই কলা-চতুষ্টয়ে ব্রহ্ম প্রকাশবান্। পৃথিবী, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র এই চারিটি অন্য চারি কলা, সেই চারি কলায় তিনি অনন্ত ব্রহ্ম। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ—এই চারি কলায় তিনি জ্যোতিষ্মান্; এবং প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্—এই চারি কলায় ব্রহ্ম আয়তবান্। এই ষোল কলায় বা পাদচতুষ্টয়ে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব। তিনি অজাত, স্বপ্রকাশ, জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি এবং সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ বা বিষ্ণু। তিনি "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম"—তৈঃ আঃ প্রং ৮ অং ১ম। তিনি সত্যরূপে প্রকাশবান্, জ্ঞানরূপে জ্যোতিষ্মান্, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডের সত্তারূপে ব্রহ্ম। তিনিই আত্মা-রূপে জীবশরীরে বিদ্যমান।

এই প্রপঞ্চ—মায়া বা অবিদ্যাজনিত। বিবেকোদয় হইলে মায়ার সহিত প্রপঞ্চজ্ঞান নষ্ট হয়। সুতরাং অদ্বৈতভাব * বিবেক-জ্ঞান-সাপেক্ষ।

সামান্য বুদ্ধিতে এবং ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে পরমেশ্বর উপলব্ধ নহেন কেন, গীতা তাহার কতিপয় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিতেছি। প্রথম কারণ—জীবের মায়া।

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥"—গীতা-৭।১৩।

"এই যে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ গুণময়ভাবেই সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমি যে এই ত্রিবিধ ভাবে অস্পৃষ্ট; এবং তাহাদের নিয়ন্তা, এজন্য নির্ব্বিকার এ কথা কেহই বুঝিতে পারে না।"

আমরা "মায়াবাদে" দেখাইয়াছি যে, মায়া দ্বিবিধ—জীবের মায়া—যাহার অন্য নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান—যদ্দ্বারা জীব প্রধানতঃ রজঃ এবং তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্যবিধ মায়া—বিশুদ্ধ ঐশ্বরিকশক্তি গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি—যে মায়াপ্রভাবে এই জগৎ সৃষ্ট, স্থিত ও সংহৃত হইতেছে। যাহা জীবের মায়া, তাহা গীতোক্ত

* "জগৎ ব্রহ্মময়"—অন্তঃকরণের এইরূপ স্থায়ী জ্ঞানকে অদ্বৈতভাব বলে। ব্রহ্ম এক বই দুই নহেন এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে,—যুক্তি ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা এ জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু এ জ্ঞান ক্ষণিকমাত্র। তাহাতে অদ্বৈত আভাসিত হয় বলিয়া তাহা দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান মাত্র। ভেদ-জ্ঞান এ জ্ঞানকে স্থায়িরূপে থাকিতে দেয় না। সুতরাং সাধনা-দ্বারা ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট না হইলে অন্তঃকরণে স্থায়ী অদ্বৈতভাবের উদয় হয় না। অদ্বৈত জ্ঞান বহু সাধনার ফল।

অপরাপ্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া জীবকে অন্ধ করিয়া ঈশ্বরকে জীবের সমক্ষে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। গীতা প্রথম প্রকার মায়ার কথা বলিয়া পরে দ্বিতীয় প্রকার মায়ার কথা বলিতেছেন। তাহাও ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানের মহা প্রতিবন্ধক।

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥"—গীতা-৭।২৫।

"আমি সকলের হৃদয়ে প্রকাশমান হই না। আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকি; সুতরাং লোকে মৎস্বরূপ-জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আমি যে অজ ও অব্যয়, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহারা আমার স্বরূপ বুঝিতে পারে।"

তৃতীয় কারণ—ঈশ্বর অনন্ত, অনাদি; এ জন্য ত্রিকালজ্ঞ। মানবের জ্ঞান পরিমিত; এ জন্য অনন্তকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।"—গীতা, ৭।২৬।

হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকাল-বর্ত্তী ভূত সকলকে জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।

যাঁহার জ্ঞান অনন্তকাল-ব্যাপ্ত, তাঁহার কাছে ভূত, ভবিষ্যৎ নাই, সকলই বর্ত্তমান। যে মানবের জ্ঞানে ভূত, ভবিষ্যৎ আছে, মানব সে জ্ঞানে তাঁহাকে কখনই জানিতে পারেন না। তজ্জন্য সমাধিলব্ধ পরমজ্ঞান আবশ্যক। যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীবও সর্ব্বজ্ঞ হয়, সেই পরমজ্ঞান লাভ হইলেই মানবও সর্ব্বজ্ঞকে জানিতে পারেন। সেই পরম জ্ঞান জীবে কখন উপনীত হয়, তাহা পূর্ব্বে গীতা এবং উপনিষদ্বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ কারণ—মানব স্থূলদেহধারী; এ জন্য তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছা শুধু কালে আবদ্ধ এমত নহে, পরিমিত দেশেও আবদ্ধ। পরিমিত

দেশাবদ্ধ জীবের জ্ঞানও পরিমিত দেশে আবদ্ধ থাকিবে। দেহযুক্ত মানবের ইচ্ছা পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ থাকাতে সে কিরূপে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে বুঝিতে পারিবে? যিনি দেহ-সম্পন্ন, তিনি "অদেহ"কে কিরূপে জানিতে পারিবেন? অথবা তাঁহার যদি দেহ থাকে, সে দেহ অনন্ত বিশ্ব ও সংসার। পরিমিত দেহধারী অনন্ত দেহীকে জানিতে বা বুঝিতে পারেন না। অবিদ্যা-সমুৎপন্ন দেহজাত জীব দেহানুকূল ইচ্ছাদির বশীভূত। ইচ্ছা, অভাব-হেতু সঞ্জাত। যেখানে অভাব নাই, সেখানে ইচ্ছা নাই। কিন্তু অভাবসম্পন্ন এবং দেহানুকূল ইচ্ছা-বিশিষ্ট মনুষ্য, অভাববিরহিত পূর্ণ-কাম ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারিবেন? সেই নিমিত্তই শাস্ত্রে পরম পুরুষকে "অবাঙ্-মনসগোচর" বলিয়াছে। তাই গীতা বলিতেছেন:—

"ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥" ৭ অ—২৭।

"হে ভারত! হে পরন্তপ! জীবের স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলেই সেই দেহানুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং দেহের প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। সেই ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুৎপন্ন শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি নিমিত্ত যে মোহ অথবা বিবেক-ভ্রংশ উপস্থিত হয়, সেই মোহ দ্বারাই ভূত-সকল বিমোহিত থাকে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান-অভাবে তাহারা আমাকে ভজনা করে না।"—শ্রীধর।

অতএব, গীতা সর্ব্বস্থলেই উপদেশ দিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে বিবেকোদয় হইবে না; বিবেকোদয় না হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্ভবে না। এই আত্মজ্ঞানই পরমাত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই প্রতীত হয় যে, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" *।

* এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই বেদান্তীর অদ্বৈতবাদের প্রমাণ। পরে দৃষ্ট হইবে, তাহা "অপরোক্ষানুভূতি"-সাপেক্ষ।

উপনিষদের সহিত গীতার ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এক্ষণে ইদানীন্তন কালের একজন প্রসিদ্ধ যতির বাক্যে সেই আত্মপ্রত্যক্ষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন সম্যগ্দর্শন *। তাহা সামান্য জ্ঞান বা বুদ্ধির উপলব্ধ নহে। তাহা আত্মার স্বপ্রকাশ-শক্তি। তাই শঙ্কর বলিতেছেন :—

"পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব ॥—আত্মবোধ—৪র্থ শ্লোক।

এই জ্ঞানদীপালোকে সম্যগ্দর্শন লব্ধ হয়। শঙ্কর বলেন :—

"সম্যগ্বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥" ঐ—৪৮।

যাঁহার সম্যক্ প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বিজ্ঞানবান্ যোগী জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এক আত্মাকেই সর্ব্বময় দর্শন করেন। তখন তাহার আর কোন বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান-চক্ষুব দীপালোক হইতে যে আত্মদর্শন হয়, সেই আত্মদর্শন হইতে ব্রহ্মদর্শন ঘটে। শঙ্কর বলিতেছেন :—

"সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ ॥" ঐ-৬৪।

জ্ঞানচক্ষু-বিশিষ্ট ব্যক্তিই সচ্চিদানন্দরূপ সর্ব্বগ পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি কখন সূর্য্য-দর্শন করিতে পার না, সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। এই কথারই রূপক অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষু-প্রাপ্তি এবং বিশ্বরূপ-দর্শন।

---

* এই "সম্যগ্দর্শন" কিরূপ, তাহা গীতার ১৩ অধ্যায়ের শেষভাগে দৃষ্ট হইবে।

অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥" —১১ অ, ৮।

গীতার এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ভক্তি-শাস্ত্রালোচনায়ও সমর্থিত হয়। শাণ্ডিল্য বলেন যে, ব্রহ্মদর্শন হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে পরাভক্তি হয়, পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। সুতরাং পরাভক্তি, জ্ঞান ও দর্শন-সাক্ষেপ। তাঁহার ভক্তিসূত্র এই ঃ—

"সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ।"

শুধু শাণ্ডিল্য নহেন, পরমভক্ত নারদও সেই কথা বলেন ঃ—

"সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।"—"ফলরূপত্বাৎ।"—ভক্তিসূত্র —২৫।২৬।

পরাভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানের ফলস্বরূপ। সেই জ্ঞান কিরূপ, তাহা নারদ বলিতেছেন ঃ—

অনুভাবয়তি ভক্তান্। ঐ—৮০।

তিনি ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া দেন। এই অনুভবই জ্ঞানচক্ষুলব্ধ "অনুভূতি"। শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপদেশ এই ঃ—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥—১১ স্কন্ধ ২০ অ—২৯।৩০।

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে (আমাকে লাভ করিয়া) তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বাত্মভূত আমি তাঁহার সাক্ষাৎকৃত হইলে হৃদয়গ্রন্থি-সমস্ত ছিন্ন হয়, সমুদায় সংশয় বিনষ্ট হয় এবং কর্ম্ম-সকল ধ্বংস হয়।

ভাগবতের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ভক্তিযোগ ধরিয়া আত্ম-জ্ঞানে উপনীত হন, তাঁহাদেরই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। যে অনুভূতি বা জ্ঞানদৃষ্টিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, সেই জ্ঞানে হৃদয়ের গ্রন্থি-সকল (সংসারাসক্তি বা মায়া) ছিন্ন হয়, ব্রহ্ম ও পরলোক সাক্ষাৎ হওয়াতে পরমার্থ তত্ত্ব-সম্বন্ধে সংশয়-সকলের ছেদন হয় এবং যাহাতে কর্ম্মফল সঞ্জাত হয়, এমত কর্ম্মবীজেরও বিনাশ হয় *। ভক্তি রাগ মাত্র। এই রাগই মানুষকে ব্রহ্মোপাসনাপথে বরাবরই প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে। জ্ঞান-লাভের জন্যই ভক্তি আবশ্যক।

ব্রহ্মসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি অব্যয় পুরুষ, তিনিই জ্ঞানগম্য গোবিন্দ। সেই গোবিন্দ কিরূপে উপাসিত হন?

"প্রকৃত্যাগুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতং।"

সেই গোবিন্দ গুণরূপিণী ও নির্গুণরূপিণী শক্তিদ্বয়-কর্ত্তৃক পরিষেবিত।

নন্দকুমার কবিরত্ন ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মানুষ যে শক্তিবলে নির্গুণ হন, সেই নির্গুণরূপিণী শক্তি রাধা এবং তাহার গুণরূপিণী শক্তি সকাম বিলাসিনী সগুণা চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সতত শতচন্দ্রের ন্যায় উদিত থাকিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সগুণ ভাবে দেখিতে ভালবাসিতেন এবং সেই সগুণ রূপেরই অহর্নিশ অর্চ্চনা ও ধ্যান করিতেন। কিন্তু

* ভক্তিযোগেও জ্ঞানের আবশ্যকতা দেখান আমাদের অভিপ্রায়। সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় জ্ঞানসিদ্ধি হয় এরূপ শ্রুত আছে বটে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎ নহে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা পরম্পরাক্রমে জ্ঞান লাভ হয়,—সাংখ্যকার এইরূপ মীমাংসা করেন। "অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব।—সাংখ্যদর্শন ৪ অ ২১ সূত্র।

রাধা সেরূপ ছিলেন না; রাধা ভক্তিযোগের প্রকৃত আরাধনা শক্তি। রাধা নিষ্কাম-ভাবে নির্গুণেরও আরাধনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি পাপহর হরিকে দর্শন পাইয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের রাসে এবং তৎপরে পুরুষোত্তমের মহারাসে মত্ত হইয়াছিলেন। শত বৎসর সমাধিতে রাধা নির্গুণা হইয়া প্রভাসের জ্ঞান-যজ্ঞের পর পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ শিবশঙ্করও অর্দ্ধাঙ্গে গিরিজাকে ধারণ করিয়া জ্ঞানগম্য মহেশ্বর :—

সর্ব্বাত্মনা গিরিজয়োপহিতস্বরূপঃ।—শঙ্কর-বিজয়, ৭ অ।

টীকাকার অর্থ করেন :—

সর্ব্বাত্মভাবেন গিরিজয়া বেদান্তবাচি জাতয়া ব্রহ্মবিদ্যালক্ষণযা পার্ব্বত্যা যুক্তং স্বরূপং যস্য।"

"গিরি-শব্দের অর্থ বেদান্তবাক্য; তজ্জন্য গিরিজা-শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝায়। বিশ্বাত্মা শঙ্কর সেই ব্রহ্মবিদ্যা-উপহিত হইয়া তদ্দারা জ্ঞানগম্য হইয়াছেন। তাই তিনি গিরিজা বা পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক যুক্ত হইয়া আছেন।"

সেই শঙ্কর কি? যিনি সর্ব্বসুখকর (শং—সুখ) তিনিই শঙ্কর। সেই শঙ্কর পঞ্চানন কেন?

'সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাং-স্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥
ইতি শ্বেতাশ্বতর্য্যায়ুঃ-স্বক্তমুক্তোপসংহৃতম্।
ততস্তেনাপি সর্ব্বাত্মা শিব এব নিরূপিতঃ॥" শঙ্কর-বিজয়, ১৫ অ।

মহাদেবের সকল দিকে মুখ, সকল দিকে মস্তক ও সকল দিকে গ্রীবা এবং সেই ভূতনাথ সর্ব্বভূতের হৃদয়-গুহায় অবস্থান করেন। অতএব শিবময় শঙ্কর সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে রুদ্রকে মৃত্যু-বিনাশক সূক্ষ্ম আয়ুঃ বা

অমৃত-স্বরূপ (মা রীরিষঃ) বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। এ জন্য শিবদাতা শঙ্কর সকলের আত্মা-স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছেন।

যে বাল্যভাবে আরাধনারূপিণী রাধা কৃষ্ণারাধনা করিয়া গোবিন্দকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পার্ব্বতীও উমারূপে সেই বাল্যভাবে তপস্যা করিয়া জ্ঞানগম্য বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বরের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছিলেন। গৌরীও ভোলানাথকে লইয়া নৃত্যরাসে রমণ করিতেন। দেবর্ষি নারদও তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া নৃত্য করিতেন। আর নৃত্য করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যদেব। ভগবান্‌কে পাইয়া যাঁহা-দের হৃদয় এইরূপ ভগবৎ-প্রেমে নৃত্য করে, তাঁহারাই ধন্য!

গোপীগণ এবং উমা যে জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, আত্মরতি এবং আত্মানন্দ না হইলে সে জ্ঞান সমুদয় হয় না। সেই আত্মরতিতে, আত্মক্রীড় হইলে তবে আত্মমিথুন উৎপন্ন হয়। আত্মমিথুনই আত্মার সহিত পরমাত্মার ক্রীড়া ও রমণ। এই রমণে যে আত্মানন্দ ঘটে, তাহাই আত্মানন্দ-স্বরূপ হ্লাদিনী শ্রীরাধা ও গৌরী। তাহাই দেবর্ষি নারদের এবং পরমর্ষি তিত্তিরের পরম ব্রহ্মানন্দ। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন :—

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥"—মুণ্ডক, ৩।১।৪।

"যিনি সর্ব্বভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই সর্ব্বভূতের প্রাণ-স্বরূপ; তাঁহাকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন এবং পরমাত্মাতেই আনন্দিত হয়েন। তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

ভক্তিবাদিগণ এই আত্মমিথুন-আনন্দজনিত আত্মানন্দকে পরা-ভক্তি বলিয়াছেন। আত্মার পরমাত্মদর্শন হইলেই এই আনন্দ

অনিবার্য্য। সেই জন্য জ্ঞানিগণ সেই আত্মরতিকে ভক্তি বলিয়া আর অভিহিত করেন নাই; তাহাকে কেবল আনন্দ বলিয়াছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার এইরূপ আত্মরমণ ঘটিলে জীব সর্ব্ববিৎ হয়েন এবং তখনই আত্মাতে অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য সমুদ্ভূত হয়। সেই জ্ঞানে বেদ শব্দ-ব্রহ্মরূপে উদিত হয়। সুতরাং এই নাদব্রহ্মরূপ প্রণব আত্মার অধরলগ্নপ্রায়। তাই, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অধরে বেণু-সংলগ্ন। সেই গোবিন্দের ধ্যানে ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন :—

"শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।"

ব্রহ্মসংহিতা আরও বলেন, এই বেণু-নাদই ত্রিগ্রামবিশিষ্টা গায়ত্রী এবং ত্রয়ীবেদ।

"অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।"

অতএব, গীতা কিরূপ অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। যে আত্মপ্রত্যক্ষ গীতার প্রমাণ, সেই প্রত্যক্ষ মানুষের অধ্যাত্মযোগ-সমুৎপন্ন। তমোগুণ মানুষের আবরণ-শক্তি এবং রজোগুণই অবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তি। এই বিক্ষেপ-শক্তি মানুষের মনকে অহর্নিশ বহির্মুখ করাইয়া বিষয়াসক্ত করিয়া রাখে। মানুষ যখন যোগসিদ্ধ হইয়া এই তমঃ এবং রজোগুণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক শুদ্ধ সত্ত্বময় হয়েন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে অন্তর্দ্দেশ আলোকময় করেন। কারণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ চিন্ময়; সেই চিন্ময় সত্ত্ব যখন রজঃ এবং তমোগুণের বাহ্য বিষয়ের মায়িক জ্ঞানোৎপন্ন আবরণ-বিমুক্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এ-জন্য সত্ত্বগুণ জ্ঞানময়ী প্রকাশ-শক্তি। তাই গীতা বলিয়াছেন :—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।"—১৪।৬।

"এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব-হেতু স্ফটিক-মণির ন্যায় প্রকাশক এবং বহির্বিষয়-জনিত সুখ দুঃখের উপদ্রব-রহিত হইয়া শান্তিময়।

সত্ত্বগুণের এই প্রকাশিকাশক্তি-প্রভাবে যোগিগণের আত্মপ্রত্যক্ষ ঘটে। এই আত্মপ্রত্যক্ষহেতু আত্মানুভূতিদ্বারা যে সকল অলৌকিক আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, আমরা এই প্রস্তাবে এক দিকে গীতার সাক্ষ্য এবং অন্য দিকে বেদান্ত-বাক্যের সাক্ষ্য দিয়া দেখাইয়াছি, সেই তত্ত্বাবলি উভয়বিধ সাক্ষ্যেই সমান ও অভিন্ন। সুতরাং বেদ-বাক্য যেরূপ অদৃষ্টার্থক, গীতাবাক্যাবলিও তদ্রূপ অদৃষ্টার্থক। বেদ-বেদান্ত যে কারণে ভগবদ্বাক্য, গীতাও সেই কারণে ভগবদ্বাক্য। অতএব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অদৃষ্টার্থক ভগবদ্বাক্য এবং বেদবৎ প্রামাণ্য।



হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ।

হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যক্ষবাদ।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে প্রত্যক্ষই মুখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম যে বেদমূলক, সেই বেদই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ। এ কথা আমরা এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"প্রত্যক্ষমেকঞ্চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

"প্রত্যক্ষই চার্ব্বাকদিগের একমাত্র প্রমাণ। কাণাদ এবং সৌগতগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। সাঙ্খ্যবাদিগণের প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। কোন কোন নৈয়ায়িকেরা সাঙ্খ্যমতেই মত দেন, অপর নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রভাকর-মতাবলম্বিগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি এই পঞ্চবিধ প্রমাণ মান্য করেন। ভট্টমতাবলম্বী এবং বেদান্তিগণ-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ স্বীকার্য্য। পৌরাণিকেরা ঐ ষড়্‌বিধ প্রমাণ এবং তদতিরিক্ত সম্ভব ও ঐতিহ্য, এই দ্বিবিধ প্রমাণও মান্য করিয়া থাকেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ দার্শনিক প্রস্থানে ও সাম্প্রদায়িক অধিকারে প্রত্যক্ষই প্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, হিন্দুর প্রধান ইষ্টার্থ যে ধর্ম্ম, তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণে সিদ্ধ করিয়া তবে হিন্দু পরিতুষ্ট হইয়াছেন। বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে বলিয়া আভ্যন্তরিক ও বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষই প্রধান প্রামাণ্য হইয়াছে। বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ধর্ম্মের অধ্যাত্ম ও অলৌকিক তত্ত্ব-সকল যে নির্ণীত হইতে পারে না, চার্ব্বাকদর্শন তাহা দেখাইয়াছে। এই চার্ব্বাকদর্শনে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ দ্বারা সেই সকল তত্ত্ববিচার করিতে গেলে, তৎপ্রতি ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। এ জন্য হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের অনেক অনুমান-যুক্তির সংশয়-মূলক পূর্ব্বপক্ষ এই চার্ব্বাকদর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে। অতএব চার্ব্বাকদর্শন অভাব-পক্ষে ধর্ম্মের প্রমাণ, ভাবপক্ষে নহে। শুদ্ধ চার্ব্বাকদর্শন কেন? চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ বা সৌগত এবং আর্হত দর্শনও এইরূপে অভাব-পক্ষে বৈদিক প্রত্যক্ষবাদের প্রমাণ। তাই, সেই সমস্ত নাস্তিক দর্শন, আস্তিক দর্শন-সমূহের মীমাংসা-মূলক পূর্ব্বপক্ষ দিয়াছে বলিয়া হিন্দু-দর্শন-ভুক্ত হইয়াছে।

যে আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষ হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ, তাহা দ্বিবিধ—বাহ্য বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ, যদ্দ্বারা বাহ্যজগতের সমুদায় সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মানস-চক্ষে জাজ্বল্যমান প্রতীত হয় এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ, যদ্দ্বারা অধ্যাত্ম-জগতের তত্ত্ব-সমুদায় মুনি-ঋষিগণের জ্ঞানচক্ষে দেদীপ্যমান হইয়াছে। এই উভয়বিধ সুস্পষ্ট জ্ঞানই হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান-রূপে অভিহিত হইয়াছে। এই দ্বিবিধ জ্ঞান পরস্পর বিরোধী নহে, বরং পরস্পরকে সমর্থন করিয়া থাকে; কিন্তু

ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ তদ্রূপ নহে। এ জন্য সেই ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ যে মন ও বুদ্ধি-সাপেক্ষ, সেই মন ও বুদ্ধির নিরোধ-সাধন হইলে তবে অধ্যাত্ম-জ্ঞানচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়। এই জ্ঞানচক্ষুঃ কি প্রকার, তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। বাহ্য বিজ্ঞানের অনুমান কেমন তত্ত্বজ্ঞানকে সমর্থন করে, তাহা আমরা পর-প্রস্তাবে প্রদর্শন করিব।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য-রূপ ও লীলা-সমস্ত হিন্দুধর্ম্মে যে স্থূল আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। "দেব-সুন্দরী"তেও তাহা অনেকাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ হয় নাই; কারণ, যাহা সূক্ষ্ম, তাহাকে স্থূল আকার দিলে, যে বস্তু যাহা তাহাই থাকে, কেবল স্থূলদর্শী জনগণের স্থূল জ্ঞান-গোচরার্থ তাহা স্থূল অবয়বে প্রকটিত হয় মাত্র। নহিলে তাহারা উহা গ্রহণ করিবে কেন? তদ্রূপ, সর্ব্ববিৎ জ্ঞানিগণের চক্ষে পার-লৌকিক তত্ত্ব-সমূহ যেরূপ সত্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীত, তাহা স্থূল অবয়বে প্রদর্শন করিলে তাহার যাথার্থ্যের কিছুই অপলাপ করা হয় না। তাই আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, এক একজন জন্ম-জন্মান্তরে যেরূপ সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতেছেন, তাহা ইতি-হাস আকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই ইতিহাসে লোকে প্রত্যক্ষ প্রতীত করিতেছেন যে, মৃগরূপের ভাবনা করিয়া ঈশ্বর-ভাবনা হইতে বিচ্যুত হওয়াতে, তাহার ফলভোগ-স্বরূপ পরজন্মে ভরতকে মৃগরূপ ধারণ করিতে হইল। বিষ্ণুপুরাণে শতধনু নামক রাজার ইতিহাস তদ্রূপ জন্মজন্মান্তরে নানা যোনিভ্রমণের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ।

প্রত্যক্ষবাদের শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

এক্ষণে কথা এই, পুরাণাদির স্থূল সাকারবাদ এবং প্রত্যক্ষ

ঐতিহাসিক রূপ-সকল যে এই উদ্দেশেই কল্পিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রমাণ আমরা একে একে দেখাইতেছি। বেদান্ত

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যঙ্গাস্ত্রাদিকল্পনা।
দ্বিচত্বারি ষড়ষ্টাস্যং দশ দ্বাদশ ষোড়শ॥
অষ্টাদশাপি কথিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিভির্যুতাঃ।
সহস্রান্তাস্তথা তাসাং বর্ণবাহনকল্পনা॥
শক্তিসেনাকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা।
কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাদি কল্পনা॥"

—রামতাপনী। পূর্ব্বভাগ। প্রথম খণ্ড। ৭—১০।

"ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অশরীরী হইলেও উপাসকদিগের কার্য্য-সাধনার্থ তাঁহার রূপকল্পনা হইয়া থাকে। যদি রূপ কল্পিত হইল, তবে তাঁহার অস্ত্রাদিও কাল্পনিক। যে সকল দেবতা রূপবান্, তাঁহাদের পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শঙ্খাদি, বর্ণ, বাহন, সেনাদি সমস্তই কল্পিত।"

তৎপরে শ্রুতি এই সমস্ত কল্পনার ব্যাখ্যা করিয়াও দিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তাপনীয় শ্রুতি হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপকল্পনার ব্যাখ্যাও কিয়দংশে প্রদর্শন করিয়াছি। আবার দর্শন কি বলিতেছেন দেখুন :—

"নিরাকারে ধ্যানপূজাদ্যসম্ভবেন ভক্তানুগ্রহকরণায় তত্তদাকারগ্রহণাবিরোধাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎপৌষ্করে—সাধকস্য তু রক্ষার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতমিতি।"

—শৈবদর্শন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

"নিরাকারের ধ্যানপূজাদির অসম্ভাবনা বশতঃ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণার্থ তত্তৎ আকার-স্বীকারে কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই। শ্রীমৎ পৌষ্করে তাহা বলিয়াছেন—সাধকের রক্ষণার্থই তাঁহার রূপকল্পনা হইয়া থাকে।"

হিন্দু দেবদেবীগণের স্থূল রূপকল্পনার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে। আবার দেখুন নিজে ব্যাস কি বলিতেছেন :—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

"তুমি রূপবর্জ্জিত ; তথাপি আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি। তুমি অখিল-গুরু এবং বাক্যের অতীত ; তথাপি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি। এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী ; অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটি বিকলতা-দোষ ক্ষমা করুন।"

অতএব হিন্দুধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষবাদ আমাদের কল্পিত কথা নহে, শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ। হিন্দুজ্ঞানীর নিকট দেবদেবী-সমস্ত যেমন ঈশ্বর-তত্ত্বের কল্পিত রূপ, তাঁহাদের লীলা-সকলও সুতরাং দেবত্বের তেমনি কল্পিত রূপ। কল্পিত রূপ বলিয়া সে সকল রূপ অসত্য নহে, কিন্তু সে সমস্তই প্রকৃত অধ্যাত্ম-জগতের প্রতিরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, যাহা মহত্তত্ত্ব রূপ মহামায়া, তাহাই ভগবচ্ছক্তি ভগবতী, তাহাই বিদ্যা-রূপা গিরিজা ও বেদজ্ঞানরূপিণী সরস্বতী ; তাহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-সমষ্টি লক্ষ্মী, তাহাই গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি, তাহাই ভগবানের নির্ম্মল জ্ঞানরূপ শুদ্ধসত্ত্ব চিৎশক্তি এবং ভগবানের শাক্তশরীর। এ সমস্ত একই কথা, কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইতে থাকে। হিন্দুধর্ম্ম এই কৌশলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের নিকট প্রামাণ্য সত্য।

হিন্দুধর্ম্ম দেখাইয়াছে, ভক্তের নিকট যাহা বাহ্য-জগতের পৌরাণিক ঘটনা বলিয়া প্রথিত, জ্ঞানিগণের নিকট তাহা অধ্যাত্ম-

জগতের সত্য বলিয়া উপলব্ধ। যাহা অজ্ঞানীর পরোক্ষজ্ঞান ও ভূতসাক্ষী, তাহা জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং বর্ত্তমান-প্রমাণ। হিন্দু-ধর্ম্মে সুতরাং যাহা অতীতকালের ঐতিহাসিক ঘটনারূপে নিম্নাধি-কারী অজ্ঞানী লোকের নিকট সম্ভব-যুক্তিতে এবং শাস্ত্রবাক্যরূপে প্রামাণ্য, জ্ঞানিগণের নিকট তাহা প্রামাণ্য করাইবার নিমিত্ত, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মত, সেই ঐতিহাসিক পরতঃ-প্রমাণকে নানারূপ সাক্ষ্য ও বন্ধন দ্বারা আরও বলবান করিবার প্রয়োজন হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত রাসলীলা-বর্ণনের এক স্থান তুলিয়া দিতেছি।

"অনন্তর কৃষ্ণ, নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সৌরভ-ভরে দিক্-সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্ল কুমুদিনী ও মধুকর-গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিন্যাস করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বনিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে নানা স্ত্রীস্বরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই মনোহর গীত-ধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক অনেক গোপী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মধুসূদন বিরাজমান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ শনৈঃ গান করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। কেহ বা তাহাতেই অবধান করিয়া মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কোন গোপী বারংবার কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-স্বরে ডাকিয়া লজ্জিতা হইল। আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। কোন গোপী বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিয়া নিমীলিত লোচনে তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল। অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাস-ভাবে পর-ব্রহ্মস্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল।"

বিষ্ণুপুরাণ এই মোক্ষের দুইটী কারণ দর্শাইতেছেন :—

প্রথম। ভগবানের চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদভোগে গোপীর অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়।

দ্বিতীয়। ভগবানের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন মহাদুঃখভোগে তাহার অশেষ পাপ ক্ষীণ হয়।

হিন্দুধর্ম্মের একটী সারকথা এই, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এ উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না; এই হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফলবাদ। এই কর্ম্মফলবাদই হিন্দু-ধর্ম্মের পাপের শাসন ও পুণ্যের উদ্বোধন। কর্ম্মফলবাদের তাৎপর্য্য এই যে, সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয়, এবং দুঃখভোগ হইলে তৎকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীর কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হইল এবং ভগবানের অপ্রাপ্তি-নিমিত্ত দারুণ দুঃখভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপও নষ্ট হইল। সুতরাং সংসার-স্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখ-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইল। *

বাস্তবিক, হিন্দুধর্ম্মে দ্বিবিধ জগৎ এককালেই প্রদর্শিত হইয়াছে—অজ্ঞানীর জন্য বাহ্যজগৎ এবং জ্ঞানীর জন্য অন্তর্জগৎ। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস ও নরকাদি সমস্ত অন্তর্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত। সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব তদ্রূপ স্থূল অবয়বে দেবদেবী-রূপে প্রতীয়মান।

---

* ভগবদ্দর্শনই যে মুক্তিলাভের কারণ, পুরাণ এই কথা বুঝাইবার জন্য অনেক স্থলে অনেক ঘটনা যোজনা করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। কোন স্থলে শত্রু-ভাবে, কোন স্থলে মিত্র-ভাবে ভগবদ্দর্শন ঘটিয়াছে। রামায়ণে ও মহাভারতে এইরূপ ঘটনা বিস্তর আছে। অহল্যা, শূদ্র-তপস্বী, বালি, তরণীসেন প্রভৃতি সমুদয় রাক্ষসকুলের উদ্ধার এইরূপে সাধিত হইয়াছিল। তদ্রূপ মহাভারতে শিশু-পালাদির উদ্ধার-সাধন হইয়াছিল। পরম ভক্ত বালিকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান্ তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। বালিবধ শ্রীরামচরিত্রের কলঙ্ক নহে, তাহা পরমভক্ত বালির উদ্ধার-সাধন মাত্র।



ভক্তিযোগের সমস্ত ব্যাপারই কৃষ্ণলীলা। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে গিয়াছেন, অথচ নামমাত্র সংসারে পদ্মপত্রে জলবৎ লিপ্ত আছেন, তাঁহারাই ব্রজধামে আসিয়াছেন। ব্রজপুর-শব্দের অর্থই তাহাই। ব্রজধামে গোপরূপ জীব আসিয়া দেখেন, সেখানে যখন সংসারের বিষময়ী চিন্তারূপী কালিয় এবং পাপ-প্রলোভনের ভীষণ প্রলম্বাসুর ব্রজের উৎপাত আরম্ভ করে, তখন জীবে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে উহাদের উচ্ছেদ সাধন করেন। যাঁহার হাতে গোবর্দ্ধনগিরি (গো—বেদজ্ঞান; গোবর্দ্ধন—জ্ঞানবর্দ্ধন; গিরি—বেদান্তবাক্য), তিনি ইন্দ্রক্রোধ-হেতু অনিষ্টাপাত নিবারণ করিয়া গিরি-যাজ্ঞিকগণকে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা অন্তর্জগতের নিত্য ব্যাপার। হিন্দুশাস্ত্রে অনেকগুলি রূপক ভাঙ্গা আছে; তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তজ্জাতীয় সমস্ত বিষয় সেই এক শ্রেণীর পদার্থ। নহিলে একটী হইবে বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা, অন্যটী হইবে রূপক, এমত যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

ব্যাসেরই সম্পাদিত সমুদায় পুরাণ। তিনি স্বকৃত পুরাণে যে কবিত্বের সৃষ্টি দেখাইয়াছেন, তাহা তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন। নিম্নাধিকারী জনগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি কাব্যাকারে জাজ্বল্যমানরূপে ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্য জনগণের ভক্তি-উদ্রেক করিবার জন্যই দেবদেবীর সৃষ্টি। যাহাতে সেই ভক্তি অপনীত না হয়, তজ্জন্য তিনি পৌরাণিক সৃষ্টি ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট গোপন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কারণ, গোপন না করিলে বিপরীত ফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। যখন লোকে অধিকারী হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্য-সমুদায় আপনিই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত

হইয়া পড়িবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তষষ্ঠি শ্লোক এই রূপ একটী উপদেশ-বাক্য। এই উপদেশ-বাক্যই পৌরাণিক রহস্যের আর একটী প্রমাণ।

ভগবানের অনন্ত প্রত্যক্ষ-রূপ।

যাঁহারা ঈশ্বরের স্থূল অবতারবাদ ও লীলা স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবান্ জৈমিনির সহিত একবাক্যে বলেন :—

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার শরীর-ধারণেরই বা প্রয়োজন কি? শরীব ধারণ করিলে বরং তাঁহার শক্তি পরিমিত হইয়াই যাইবে। অনন্ত কখন পরিমিত দেশে নিঃশেষিত হইতে পারেন না। অনন্ত যাঁহার শক্তি, বিশ্বরূপ দেহও তাঁহার অনন্ত। পরিমিত দেহধারণের কোন আবশ্যকতা নাই। তিনি ত অনন্ত দেহ ধারণ করিয়াই রহিয়াছেন।

বাস্তবিক, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কোন নিগূঢ় শক্তিরই বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। সেই শক্তিকে ব্রহ্ম বল, বা ঈশ্বর বল, বা অদৃষ্ট বল, বা পরাপ্রকৃতিই বল, সে সমস্ত একই কথা। হিন্দুধর্ম্মের এই "শক্তিবাদ" আমরা পরতঃ এবং স্বতঃপ্রমাণের প্রসঙ্গদ্বয়ে বিস্তারিত রূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। তদ্দ্বারা এই শক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ উভয়ই প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু সে সমুদায় রূপের দার্শনিক তত্ত্ব এই যে, যখন ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য-প্রণালী এই শক্তির অধীন হইয়া চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাতেই বিশ্ব সুনিয়মিত ও সুশাসিত হইয়া রহিয়াছে, তখন তদতীত একজন মাত্র দেশকালদ্বারা পরিমিত পুরুষ কি করিবেন? তাঁহার আবশ্যকতাই বা কি? গীতার অভিপ্রায় যাহা, তাহা মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির অতীত এই অদৃষ্ট শক্তি-দ্বারা সিদ্ধ হইবার বাধাই বা কি? তাহা যদি তদ্রূপে সিদ্ধ হয়, তবে কি তাহা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক ঘটিতেছে না? যদি ঘটে, তবে

গীতোক্ত বচন অপ্রামাণ্য নহে। যখনই বিশ্বে দৈবশক্তি ও সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ভগবান্ বলিতে পারেন :—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

স্থূল শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ না করিলে যে ধর্ম্ম-সংস্থাপন হইবে না, এ শ্লোকের এমত অভিপ্রায় নহে। সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব অথবা যে তমোগুণদ্বারা পাপনাশ হয়, তাহার আবির্ভাবই ঈশ্বরত্বের সম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান্ যদি শরীর-ধারণ না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে না পারেন, তবে তাঁহার নিজ নামের সার্থকতাই থাকে না। অতএব ঈশ্বরে সকলই সম্ভব।

ঈশ্বরাবির্ভাব।

ঈশ্বরাবির্ভাবের নামই যে ঈশ্বরের সম্ভব, পুরাণেও তাহা কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, দেখুন :—

"যৎকালে কাল সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং সাতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল ;—রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল ; দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল ; * * * * তৎকালে সাগরের সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল, পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায়, দেব-শক্তি রূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন :—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ ভাগবত। ১০-৩-৮।

এস্থলে বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, এই শব্দেরই প্রয়োগ আছে। বিষ্ণুর আবির্ভাব কোন্ সময়ে ঘটে? যখন সাত্ত্বিক ভাবে বিশ্ব আনন্দে ভাসিতে থাকে, সেই সময়েই বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। জগতের সেই সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব ভাগবত যে পৌরাণিক ভাষায় অতি

সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এইরূপ সাত্ত্বিক আবির্ভাবই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব। গীতা বলিয়াছেন :—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥—১০অ—২।৩।

স্বামী এইরূপ অর্থ করেন :—

"আমার প্রভব অর্থাৎ আমি জন্ম-রহিত হইলেও নানা বিভূতি দ্বারা আমার যে আবির্ভাব, তাহা দেবতা ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন। কারণ আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপাদক এবং তাঁহাদের বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তক। যে ব্যক্তি আমাকে অজ (জন্মরহিত) অনাদি এবং মহেশ্বররূপে জানেন, তিনি মায়া-মোহ ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন।"

তবেই দাঁড়াইতেছে, তিনি দেবতুল্য মহাজনগণের বুদ্ধ্যাদিতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর কার্য্যসাধনার্থ অবতীর্ণ হয়েন। কারণ, এ বিশ্বের সমস্তই তাঁহার শরীর।

প্রত্যক্ষ ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী।

শুধু যে মানুষ-শরীরে আবির্ভূত হইয়া তিনি বিশ্বলীলা করিতেছেন এমত নহে, এ বিশ্বের ঘটনাবলিতেও তাঁহার আবির্ভাব। কত সময় মনুষ্যের কত আয়োজিত ব্যাপার দৈবঘটনাবলে পর্য্যুদস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সেই সমস্ত ঘটনাতেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব। এই ঐশ্বরিক প্রকৃতি-শক্তি কখন বা আবরণ-স্বভাব-হেতু তমোরূপের শ্যামবর্ণে, কখন বা তেজঃপুঞ্জ রজোরূপের রক্তিম-রাগে এবং কখন বা সাত্ত্বিকগুণের প্রকাশ-স্বভাব-বশতঃ শ্বেত ও শান্তমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কারণ, শ্রুতিতে ঐ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ

অজা (প্রকৃতি) লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। তাই, সেই সেই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি-সকল সেই সেই বর্ণে প্রদর্শিত হওয়াতে হিন্দু দেবদেবী এবং দেবলীলা-সমুদায় অধ্যাত্ম-জ্ঞানের বর্ণমালা-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। "দেবসুন্দরী"তে এই বর্ণমালা বিবৃত হইয়াছে। হিন্দু উপাসকগণ এই বর্ণমালায় সুপরিচিত হইলে ক্রমে তাঁহারা তাহা পড়িতে ও বুঝিতে শিখেন। সেই রূপে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুসমাজে এই সকল দেবদেবী-পূজা নিম্নাধিকারী জনগণের শ্রদ্ধাভক্তিতে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালীর এরূপ বিরাট্ ব্যাপার হিন্দুসমাজ ভিন্ন আর কোন জনসমাজে পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, হিন্দুর নিকট ধর্ম্মই মানুষের প্রধান ইষ্টার্থ এবং সেই ধর্ম্মার্জ্জন করাই মানবজন্মের সার্থকতা।

ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় রূপ-সকলকে পূজার্হ করিবার নিমিত্ত হিন্দু-সমাজে আবার জীবিত পিতামাতা-প্রভৃতি গুরুজনের পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোককে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম দেবপূজায় আনাই ইহার উদ্দেশ্য। মহাভারত বলিয়াছেন :—

"মহাত্মারা অগ্রে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। অতএব, মানবগণ সর্ব্বদা বিবিধ যত্নসহকারে পিতৃগণের পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্যায় পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্য বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমুদায় তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন।"—অনুশাসন পর্ব্ব। ৮৭ অধ্যায়।

হিন্দু অগ্রে সাক্ষাৎ দেবতা—পিতামাতা ও অন্য গুরুজন এবং পরম ভক্তিভাজন ধর্ম্মগুরুগণকে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত পূজা করিতে শিখেন। সেই পূজা হইতে সূক্ষ্ম দেবপূজায় উত্থিত হওয়া সহজ

কথা। তদ্রূপ, যে পতি হিন্দুপত্নীর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ভক্তিভাজন, তাঁহাকে অগ্রে পূজা করিয়া তিনি সূক্ষ্ম দেবপূজায় উঠেন। যাঁহারা এই সাক্ষাৎ পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জনগণকে দেবজ্ঞানে পূজা করিতে না পারেন, তাঁহারা অসাক্ষাৎ ভক্তিভাজনকে কিরূপে পূজা করিবেন? এ বিষয় আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় এবং "সমাজ-তত্ত্বে" বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। জনক-জনকী প্রভৃতি গুরুজন শুদ্ধ কি জীবিতাবস্থায় পূজনীয়? মৃত্যু হইলেও তাঁহাদের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিক্রমে পূজা বিহিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি হিন্দুর দেব-ভক্তির উদ্দেশ্য সাধন করিবার বিশিষ্ট পন্থা।

প্রত্যক্ষ-দেবতা।

যদি বল, হিন্দুর সমক্ষে যে শিবদুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা বিদ্যমান, তাঁহাদিগকে হিন্দু কিরূপে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন? উহাঁরা ত বাস্তবিক জীবিত মূর্ত্তি নহেন। হিন্দু উপাসক সেই মৃণ্ময়ী বা দারুময়ী বা শিলাময়ী মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত দেবত্বেরই পূজা করেন। সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও পাষাণ উড়িয়া যায়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার সংস্কারে তাহাতে ভগবানের সূক্ষ্মরূপের আবির্ভাব হয়। স্পর্শমণি যেমন সর্ব্বত্র স্বর্ণময় করে, ভক্তি তেমনি সেই প্রতিমাকেও দেবত্ব দেয়। ভক্ত হিন্দু জানেন, ঐ সকল রূপে ভগবান্ এককালে পৃথিবীতে উদয় হইয়াছিলেন। সুতরাং সে সমস্তই দেবরূপ। যে প্রকৃতরূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই রূপ হিন্দুভক্তের নিকট অতি পবিত্র ও ভক্তি-উদ্রেকের কারণ। তাই সেই দেবরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সংস্কার দ্বারা ভগবানের আবির্ভাব জ্ঞান করিয়া হিন্দু অনায়াসে সেই দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন। যেরূপে তিনি একবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেরূপে তিনি এখনও আবির্ভূত

না হইতে পারেন কেন? তিনি ত সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র-বিরাজিত। তবে তাহাতে ভগবান্ নিশ্চয় বিরাজিত আছেন বলিয়া হিন্দু সেই পবিত্র রূপে ভগবানের পূজা করেন। পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার বর-প্রার্থনা করেন। সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ সততই হৃদয়-বাসী হইয়া হিন্দু ভক্তকে ধর্ম্মভীত করেন এবং নিয়তই আন্তরিক পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই মূর্ত্তিতে তিনি ভক্তের স্বপ্নেও উদয় হইয়া তাঁহাকে কতরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুর পরিবার-ক্ষেত্রের দেবাগারে ভগবান্ যেমন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার হৃদয়-মন্দিরেও তেমনি অধিষ্ঠিত। সর্ব্বদাই এইরূপ দেব-সেবা ও ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি-সাধন করিবার জন্য হিন্দু সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করেন। ভগবদ্ভক্তির এইরূপ প্রত্যক্ষ দেব-পূজার ফল কি মন্দ? যে মন্দ বলে, সে হিন্দুর সাক্ষাৎ দেব-দেবী-পূজার গভীর অর্থ কিছুই জানে না। *

দেবদেবী-পূজা পৌত্তলিকতা নহে।

তবে কেন বল, হিন্দু পুতুল-পূজা করে, হিন্দু পৌত্তলিক? কোন হিন্দু এ পর্য্যন্ত পুতুল-পূজা বা মূর্ত্তি-পূজা করে নাই। যখন মূর্ত্তি-পূজা করে, তখন ভক্ত সে মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-জ্ঞানেই পূজা করে। ইহাকে পৌত্তলিকতা না বলিয়া বরং আধ্যাত্মিক ভক্তির মোহ বলিতে পার—যে আধ্যাত্মিক মোহে উন্মত্ত-প্রায় ভক্ত এক সামান্য মূর্ত্তিকে অনন্ত দেবতাজ্ঞানে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এ উন্মত্ততা তাঁহার মহা ভগবদ্ভক্তির ফল। হিন্দু ঈশ্বরকে

---

* প্রতীকোপাসনায় অর্থাৎ নাম-রূপ-আলম্বন ধরিয়া উপাসনা করাতে সেই প্রতীক ঈশ্বরভাবনার বাধা হইতে পারে না। এ বিষয়ে বেদান্তদর্শনের ৪ অ. ৩ পা, ১৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

এত ভালবাসেন যে, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পান—সেই ক্ষুদ্র পাষাণ-মূর্ত্তিতেও দেখিতে পান। যিনি পরমাণুতেও বিদ্যমান, তিনি তত বড় শালগ্রাম-শিলায়—তত বড় দেববিগ্রহে বিদ্যমান না হইবেন কেন? তাই হিন্দু সেই বিন্দুবাসিনীকে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান জ্ঞান করিতে পারেন।* তবে কি ইহাকে উন্মত্ততা বলিতে চাও? না, ইহা হিন্দুর পরম আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ভগবৎ-প্রেমের অমোঘ নিদর্শন? তাঁহার শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কি মূর্ত্তি-পূজা? সেখানে পিতৃমূর্ত্তি বা মাতৃমূর্ত্তি এবং তদূর্দ্ধতন পুরুষগণের স্থূল মূর্ত্তি কোথায়? যদি পিতৃমূর্ত্তি বা মাতৃমূর্ত্তি থাকে, তবে তাহা হিন্দুর হৃদয়মন্দিরে আছে। তদ্রূপ, ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ-পূজায় যদি কোন মূর্ত্তি-পূজা থাকে, তবে তাহা হৃদয়স্থ ভগবৎ মূর্ত্তি-পূজা। সেই ভগবৎ-মূর্ত্তির প্রতিবিম্বই হিন্দুর প্রত্যক্ষ-দেবতা। বরং খৃষ্টানকে ও মুসলমানকে একদিন স্থূল পৌত্তলিক বলা যাইতে পারে, কারণ, উহারা পূজা করিবার নিমিত্ত কবর-স্থলে পিতামাতার স্থূল নিদর্শন গড়িয়া রাখেন, এবং সেই নিদর্শন-স্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করেন *। হিন্দুর শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সেরূপ স্থূল মূর্ত্তি-পূজা নহে। পিতামাতার পূজা হিন্দু বৎসরে-বৎসরে, বৎসরে-বৎসরে কি, নিত্য

---

* তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া প্রকারান্তরে সকল সভ্য সমাজেই প্রবর্ত্তিত আছে। হিন্দু ভিন্ন অপর জাতিতে দেবপূজা দূরে থাক্, আত্মপূজাও প্রবর্ত্তিত আছে। ইংরাজগণ আত্মমূর্ত্তি ও চিত্র গড়িয়া সর্ব্বদাই আপনাকে পূজা করেন। এবং বড় বড় লোককে পূজা করিবার জন্য, তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র রক্ষিত করিয়া থাকেন। হিন্দুজাতি মধ্যে এরূপ স্থূল পৌত্তলিকতা নাই। ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু আপনার প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করিতেন না; এক্ষণে ইংরাজগণের দেখাদেখি ইংরাজী কৃতবিদ্যগণ এইরূপ আত্মপূজা করিতে শিখিয়াছেন।

ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকালেও করিয়া থাকেন। শিশু-কালে যাহার পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে তাহার পিতৃমূর্ত্তি ত মানসপটে অঙ্কিত নাই, কিন্তু তিনি পিতৃদেবের এবং যাঁহাদিগকে কখনও দেখেন নাই, সেই ঊর্দ্ধতন পুরুষগণেরও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি-সূত্রে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। ভগবানেরও অর্চ্চনা হিন্দু তদ্রূপে করেন। কখন মানসিক ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি ধরিয়া অর্চ্চনা করেন, কখন তদ্রূপ মূর্ত্তির আলম্বন ব্যতীতও ঈশ্বরোপাসনা করেন। যিনি মানসিক ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি ধরিয়া ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করেন, তিনি কেবল ভগবানে চিত্ত স্থির করিবার নিমিত্ত সেরূপ প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই প্রতীক স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেহেতু, তাহা কেবল ধ্যান-ধারণার আলম্বন মাত্র। উপাসনা ও পূজা কেবল ভগবান্ ব্যতীত, আর কাহারই নহে। যিনি ভগবানের যে ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করেন, তিনি ভগবান্‌কে সেই রূপেই প্রাপ্ত হয়েন। এই ঐশ্বর্য্য-ভেদ লইয়াই হিন্দু উপাসকগণের প্রভেদ, নহিলে হিন্দু সর্ব্ববিধ প্রতিমা-পূজায় একই ঈশ্বরোপাসক।

প্রত্যক্ষ-পূজা।

হিন্দু কি শুদ্ধ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের পূজা করেন? তাঁহার পূজা পর্য্যন্ত লোকশিক্ষার্থ প্রত্যক্ষ অবয়ব ধারণ করিয়াছে। হিন্দু যে আধ্যাত্মিক সাধনাবলে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখেন, সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রত্যক্ষ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্গোৎসবে যে স্থূল পূজা হয়, তাহা আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম সাধনারই বাহ্য আকার। ভগবৎ-আরাধনায় অগ্রে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক; সেই শুদ্ধি-ব্যাপারের বাহ্য রূপই আসনশুদ্ধি, অঙ্গশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধি। এই শুদ্ধি-ব্যাপার দ্বারা সাধক পরিশুদ্ধ হইতে শিক্ষিত হয়েন। তৎপরে

আত্মনিবেদন-ব্যাপার। চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে কেহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। আত্ম-নিবেদন করিতে গেলে হৃদয়ের সমুদায় কামনা, প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেবমুখী হওয়া চাই। সেই আত্মনিবেদনের বাহ্য রূপই উৎ-কৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত নৈবেদ্য-দান। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলির সহিত ভগবান্‌কে এই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া-মোহ ও সংসারাসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথনই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয় না। যদি ইন্দ্রিয়পরতা এবং রিপুপরতন্ত্রতা কিছু-মাত্র থাকে, তবে আত্মনিবেদন হইতে পারে না। এই সংসারাসক্তি, ইন্দ্রিয় ও রিপুপরতন্ত্রতাই মানবের পশুত্ব; কারণ, ইতর পশুতেও তাহা বিদ্যমান। সুতরাং এই পশুত্বের একেবারে সংহার করা আবশ্যক। তাই আত্ম নিবেদন-রূপ নৈবেদ্যদানের পরই পশু বা ছাগ-বলি * আছে। যখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়বিজয় ও সমস্ত রিপুবশ

---

* যজ্ঞে পশুবলি দিলে জীবহিংসা হয় না। তবে যে স্থলে পারলৌকিক স্বর্গকামনা বা ঐহলৌকিক ভোগকামনা থাকে, সেই স্থলেই জীবহিংসা হয়। ভগবানের দ্রব্য ভগবান্‌কে নিষ্কাম-ভাবে দিলে হিংসা হইবে কেন? কিন্তু যেখানে নিজ ইষ্ট-সাধনার জন্য বলিদান হয়, সেইখানেই মানুষ সেই ইষ্টের নিমিত্ত প্রাণি-সংহার করেন। যাহাকে আহার করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকে দেবস্থলে কেন, যে কোন স্থানে সংহার করিলেই জীবহিংসা করা হয়। জীবহিংসা-নিবন্ধন মানবপ্রকৃতি ক্রমশঃ বিকৃতি-প্রাপ্ত হইতে থাকে। যদ্দারা প্রকৃতির মলিনতা জন্মে, তাহাই পাপ। উপর্য্যুপরি জীবহিংসা করিলে এই পাপ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্বর্গকামনা করিলেও যে জীবহিংসা-জন্য পাপ হয়, পুরাণ এ কথা সুরথ-রাজার দৃষ্টান্তে বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাই বলিদানেও নিষ্কামধর্ম্মের শিক্ষা। যাহাকে পূজায় বলি দিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আশয় ত্যাগ করিলেই ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, নহিলে নহে। কারণ, যাহার জন্য আশয়

হয়, যখন সংসারাসক্তির অবসান হয়, তখনই তাহার দেহস্থিত তমোগুণান্বিত পশুর (কৃষ্ণবর্ণ অজের) বলিদান হয়। তাই ভগবান্ অনুগীতায় বলিয়াছেন :—

"সামবেদেও অন্তর্যাগানুষ্ঠান-পূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুস্বরূপ রিপু-সমুদায়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে।"

সাধকের যখন এইরূপ পশুবলি হয়, তখনই তাঁহার ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে রতি ও একান্ত আসক্তি জন্মে। তৎপূর্ব্বে যাহা হয়, তাহা গৌণীভক্তি মাত্র। ঈশ্বরে পূর্ণাসক্তির নামই আরাত্রিক বা আরতি। এই আরতি-ব্যাপারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও কান্তাসক্তিতে হৃদয়ের ভগবদ্ভক্তির পূর্ণমাত্রা সম্পূর্ণ হওয়াতে ঈশ্বর-তন্ময়তা জন্মে। সেই ভক্তিপঞ্চের নিদর্শন—দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্রাদি এবং সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম।* এই পঞ্চরূপে আরাধনাই ঈশ্বরে আরতি-দান। সেই পঞ্চ ভক্তিদীপ জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে। যে ঐশ্বরিক জ্ঞানে দেবদর্শন হয়, সেই জ্ঞান ভক্তির পঞ্চ দীপাধারে জ্যোতিঃ স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। যখন সাধকের

থাকে, তাহাকে ত আর দান করা হয় না। দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নামই উৎসর্গ। সুতরাং যাহা দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়, তাহা দেবতাকে দান করা হয়। একবার দান করিয়া পুনরায় কোন অভিলাষ-সাধনার্থ তাহা গ্রহণ করিলে "দত্তাপহরণ"-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। শুধু দত্তাপহরণ নহে, ব্রহ্মস্ব-অপহরণের পাতক হয়। যাহার প্রতি ভোজনেচ্ছা থাকে, তাহা এক প্রকার উচ্ছিষ্ট সামগ্রী; তাহা কিরূপে উৎসর্গিত হইতে পারে? যাহা উৎসর্গিত হয়, তাহা দেবসামগ্রী বলিয়া ব্রাহ্মণ-ভোগ্য। সুতরাং যজ্ঞের বলি গুরু পুরোহিতেরই সম্পত্তি। তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সেই বলির অল্পাংশ মাত্র প্রসাদ দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কাহারই অধিকার নাই। নহিলে যাহাতে লোভ থাকে, তাহা আর দেবপ্রসাদ নহে। প্রসাদেও লোভ থাকিলে জীবহিংসা হয়। অতএব, যাহারা মাংসাশী, সেই শক্তি-উপাসকগণকে নির্লোভ ও নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই বলিদানের উদ্দেশ্য।

অন্তরে এই জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হয়, তখন তাঁহার অন্তরে ভগবৎ-শক্তি দশভুজার সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে দশদিক্ আলো করিয়া দেখা দেন। কিরূপ ঐশ্বর্য্যের (লক্ষ্মী) সহিত দিব্য (সরস্বতী) জ্ঞানালোকে দেখা দেন, তাহা "দেবসুন্দরী"তে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

সাধনাবলে ভগবান্ যেরূপ "সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদি শক্তি"র সহিত প্রত্যক্ষীভূত হন, সেই সত্ত্বমূর্ত্তি দুর্গাদির প্রতিমায় স্পষ্টীকৃত করিয়া হিন্দু শক্তির সহিত শক্তিমান্কে পূজা করেন। যথন সেই অব্যয় ও অক্ষয় শক্তিমান্কে প্রত্যক্ষ অনুভূত করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তথন উপাসক সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলেন; কারণ, সে প্রতিমা-গঠনের কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। এই নীরাজন বা প্রতিমা-বিসর্জ্জন-ব্যাপারই সপ্রমাণ করিতেছে যে, হিন্দু প্রতিমা পূজা করেন না*; সেই প্রতিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পূজা করেন। প্রতিমা গড়েন, কেবল ভগবান্কে প্রত্যক্ষে পূজা করিবার জন্য। তবেই, হিন্দুজ্ঞানীর নিকট ভগবান্ যে প্রকার প্রত্যক্ষরূপে দেখা দেন, দেখা দিয়া প্রত্যক্ষ লীলায় তাঁহার সহিত রমণ করেন, তিনি সেই রূপে সমুদায় প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তাহা দেবদেবীর বিরাটাকারে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর দেবদেবী, দেবপূজা ও দেবলীলা-সমুদায় এজন্য অলীক ব্যাপার নহে। দেবদেবী পুতুল নহে, দেবপূজা পৌত্তলিকতা নহে এবং দেবলীলা-সমুদায়ও সামান্য ব্যাপার নহে। সমুদায়ই অধ্যাত্ম-জগতের বিরাট্ প্রত্যক্ষ রূপ। তাই গীতা বলিয়াছেন ঃ—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"—৯।১১।

"আমি সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের বিনাশের নিমিত্ত,

স্ব-ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে মানবীতনু আশ্রয় করিয়া থাকি, কিন্তু আমি যে নিত্য-শুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর, অবিবেকি-মূঢ়জনগণ, আমার সেই পরমভাব বুঝিতে না পারিয়া আমাকে সামান্য মানবজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।"

বেদের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ।

আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ যে বেদবেদান্ত, সেই বেদবেদান্ত-প্রচারিত অলৌকিক তত্ত্বাবলির প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। বলিয়াছি ত হিন্দুদর্শন-সমূহ বেদবেদান্তের মীমাংসক শাস্ত্র ও চক্ষুস্বরূপ। এই দর্শন-সমস্ত সেই যোগমূলক আত্মপ্রত্যক্ষের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগিগণ এই যোগপথের নেতা। বৈশেষিক দর্শনকার এই প্রমাণপথ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। বেদমতে ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ—নিয়ম। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম-শব্দ এই বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত নিয়ম মানবকে পরমার্থপথে নিয়োজিত, শাসিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত নিয়মই ধর্ম্ম। ভগবান্ এই ধর্ম্মদ্বারাই বিশ্ব ধারণ ও রক্ষা করিতেছেন, এবং এই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থই কেমন তাঁহার যুগে যুগে আবির্ভাব হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। বৌদ্ধেরাও ধর্ম্মশব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন—The Eternal Law। সর্ব্ব বিধায়ে ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিয়মিত করে। নিয়মিত করে কি অভিপ্রায়ে? মনুষ্যকে নিঃশ্রেয়স-পথে আনিবার জন্য। তাই বৈশেষিক দর্শনকার বলিলেন :—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স সাধন হয়, তাহাই ধর্ম্ম। নিঃশ্রেয়স কি? নৈয়ায়িকদিগের মতে অপবর্গই নিঃশ্রেয়স। তবে অপবর্গ কি?

আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। ন্যায়দর্শনে তাহা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, মিথ্যাজ্ঞান-নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। প্রবৃত্তি-নাশে জন্ম নষ্ট হয়। জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয় এবং এই দুঃখের নাশেই অপবর্গ-লাভ। অপবর্গই নিঃশ্রেয়স এবং পরম পুরুষার্থ।"—বাৎস্যায়ন।

নৈয়ায়িকেরা নিঃশ্রেয়স কি, তাহা বলিয়া সেই নিঃশ্রেয়স-লাভের সাধন-প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কণাদ বলেন, এই নিঃশ্রেয়স লাভ করাই ধর্ম্ম। নৈয়ায়িকেরা বলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই ধর্ম্ম-লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান কি? তত্ত্বসকল নিরূপণ করাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব কি, তাহা দর্শনকারেরা বিবৃত করিয়াছেন। নৈয়ায়িকদিগের তত্ত্বজ্ঞান যাহা, তাহা সাংখ্যবাদিগণের তত্ত্বজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। স্থূলজ্ঞানকে সূক্ষ্মজ্ঞানে আনাই তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যথাক্রমে ধর্ম্মলাভ হয়। সুতরাং ধর্ম্মলাভ অনুষ্ঠানের ফল। তুমি মহর্ষিগণ-নির্দ্দিষ্ট যোগপথ অবলম্বন করিয়া অষ্টসাধন কর, বিজ্ঞান-সিদ্ধ হইবে; সিদ্ধ হইয়া বেদোক্ত বাক্যের সত্য উপলব্ধি করিবে এই জন্য ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, বেদ স্বতঃ-প্রমাণ।

"নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ-প্রামাণ্যম্।"—সাং, দ, ৫।৫১।

নিজ শক্তিতে বেদ অভিব্যক্ত হইয়া আপনাকে আপনি সপ্রমাণ করে। এই শক্তি যোগবল। যোগবলে বেদ স্বতই প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হয়। বেদের অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। এই যোগধর্ম্মে বেদের সত্যতা প্রতীয়মান বলিয়া কণাদ বলিতেছেন :—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

ধর্ম্মের বচন হইতে বেদের প্রামাণ্য। ধর্ম্মই বেদকে প্রমাণ

করিতেছে। যে ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়স সাধন করে, সেই ধর্ম্ম বেদকে প্রমাণ করে। শঙ্করমিশ্র এ সূত্রের এইরূপ অর্থ করেন। কারণ, তাহা ধর্ম্মব্যাখ্যার পরসূত্রেই কথিত হইয়াছে।

কিন্তু কেহ কেহ "তদ্বচনাৎ" পদের অর্থে "ঈশ্বরবচনাৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কারণ, দার্শনিক ভাষায় তদ্ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে ঈশ্বরকে বুঝায়। তদ্ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে ঈশ্বরবাচক হইলেও আমরা এস্থলে তাহার পক্ষপাতী নহি। কারণ, কণাদ তাঁহার দর্শনের অন্য কোন স্থলে ঈশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই। তিনি এক অদৃষ্টশক্তি স্বীকার করিতেন। যাহা মনুষ্যের সামান্য চক্ষে দৃষ্ট নহে, সেই অদৃষ্টশক্তি যিনি স্বীকার করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবাচক ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজনই বা কি? সুতরাং যিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন, তিনি ঐ তদ্ শব্দ ঈশ্বরকে বুঝাইবার জন্য যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এমত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, "তদ্বচনাৎ" এ কথা পূর্ব্ব সূত্রে লিখিত ধর্ম্মবচনের পরেই স্থাপিত হওয়াতে সেই ধর্ম্মবচনই বুঝাইবে। অতএব, শঙ্করমিশ্রের অর্থ গ্রহণ করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, কণাদ মোক্ষধর্ম্মকেই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া গিয়াছেন।

কৈবল্যদায়ক মোক্ষধর্ম্মই যে বেদের প্রামাণ্য, তাহা সাংখ্য এবং পাতঞ্জল যোগেও প্রতীয়মান। এই দুই যোগ-পথের প্রধান বিভিন্নতা "প্রণিধানের" অবলম্ব লইয়া। সাংখ্যযোগ বিনা ঈশ্বরাবলম্বে যোগ-সাধন করে, পাতঞ্জল-যোগের প্রধান অবলম্ব ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর কিরূপ? তিনি সর্ব্বজ্ঞাদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বর নহেন, সাংখ্যযোগের ঈশ্বর যোগের বিষয়ীভূত পুরুষ :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

"যিনি ক্লেশের হেতু অবিদ্যা এবং কর্ম্মফলের হেতু বাসনাসমূহের অতীত বা নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর।"

যে তত্ত্বের জন্য যোগের সাধনা, ঈশ্বর সেই তত্ত্ব। এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইলেই যোগসিদ্ধি হয়। তখন বেদ স্বতঃ সপ্রমাণ হইয়া যায়। বেদে যে মোক্ষপদের কথা লিখিত আছে, তাহার সমুদায় যাথার্থ্য তখন বিলক্ষণ প্রতীত হয়। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ-সাধনই সাংখ্যযোগ; তদ্রূপ নিরোধ-সাধন হইলে যে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, সেই জ্ঞানোদয়ে আত্মজ্ঞান লব্ধ হয়। অতএব তুমি যদি যোগসিদ্ধ হইতে পার, তবে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এবং বেদোক্ত মুক্তিলাভ করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত করিয়া তাঁহার স্বরূপ পূর্ণতা দর্শন করিতে পারিবে। সুতরাং আত্মপ্রত্যক্ষই যোগের প্রমাণ হইয়া বেদবাক্যেরও অকাট্য প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ বেদ, বেদের প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। অতএব হিন্দুধর্ম্ম আত্মপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি অজ্ঞানে, কি সংসারে, কি সন্ন্যাসে, কি ইহলোকে, কি পরলোকে, হিন্দু সর্ব্ব বিষয়েই প্রধানতঃ প্রত্যক্ষবাদী।

এখন কথা এই, যে আত্মপ্রত্যক্ষ হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ, অজ্ঞানী জনগণের নিকট সেই আত্ম-প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কোথায়? যাহারা যোগী নহে, যোগসিদ্ধ প্রামাণ্যে তাহারা বিশ্বাস করিবে কেন? তাহাদের বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। সেই বিশ্বাসের কারণ অনুমান। আমরা এক্ষণে সেই অনুমান-মূলক প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বাহ্য-বিজ্ঞানে অনুমান।

অনুমানের দ্বিবিধ প্রণালী।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কতিপয় মহামান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অপর কতকগুলি সমপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুধীশ্রেষ্ঠ সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কোপার্ণিকস, গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন, বয়েল, পাস্কেল, ড্যাল্টন প্রভৃতি মহাজনগণ গণনীয়; এবং লাপ্লাস, লাগ্রেঞ্জ, ইউলার, ক্লেবেল্ট, ড্যালাম্বার্ট প্রভৃতি বিখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় দলভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জনগণ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তনকালীন হওয়াতে এক্ষণে বিজ্ঞানের প্রতি এই অপযশ আসিয়াছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত নাস্তিকতার প্রচার হইতেছে। মানব যত প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, ততই বুঝিতেছেন যে, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের প্রমাণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রকৃতির কার্য্য ও কৌশল দেখিয়া লোকে কোথায় বিশ্বপতির যশোঘোষণা করিবে, না তাহার ঠিক বিপরীত করিতেছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আদৌ ঈশ্বর স্বীকার করিতে চান না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও গুণগৌরব প্রচার করা ত দূরের কথা। নাস্তিকতার এইরূপ বৃদ্ধি ও প্রচার দেখিয়া ঈশ্বরপরায়ণ পরম ভক্তিশীল পুণ্যবান্ জনগণ নিতান্ত কাতর ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে, একই বিজ্ঞান-পথ অনুসরণে কেহ বা নাস্তিকতায়, কেহ বা আস্তিকতায় উপনীত

হয়েন কেন ? তত্ত্ববিৎ ডাক্তার হুইয়েল এই সমস্যার যেরূপ রহস্যোভেদ করেন, তাহাই প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য *।

তিনি কহেন, এই সমস্যার নিরাকরণ করিতে হইলে, বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মানসিক প্রকৃতি ও অভ্যাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইদানীন্তন বিজ্ঞানপথে সত্যসন্ধান করিবার দ্বিবিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। এক প্রণালীক্রমে বহুদৃষ্টান্ত হইতে একটী সাধারণ সত্য ও নিয়ম অনুমিত হয়, অন্য সরণি অবলম্বন করিলে আবিষ্কৃত অথবা স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ সত্য এবং নিয়ম হইতে অপর সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যায়। প্রথমোক্ত ন্যায়ক্রমে স্যার আইসাক নিউটন পার্থিব সকল-পদার্থের আকর্ষণ-শক্তি অনুমান করেন। আমরা সকল ব্যক্তিকে মরিতে দেখিয়া অনুমান করি, মনুষ্যমাত্রই মরণশীল। অন্যবিধ ন্যায়-প্রণালী ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সুন্দর প্রদর্শিত আছে। তাহাতে কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ হইতে দ্বাদশ অধ্যায় প্রতিজ্ঞাবলি যথাক্রমে সিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা বিজ্ঞানে এই দুই ন্যায়প্রণালী যথারীতিক্রমে ন্যূনাধিকরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। যাঁহারা যে পদ্ধতির অতিশয় আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের মানসিক চিন্তাপ্রণালী সেইরূপ অভ্যস্ত হইয়া আইসে। অতএব, যে সমস্ত মহামহোপাধ্যায় প্রথমোক্ত অনুমান-প্রণালী অবলম্বন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সহকারে মহা মহা সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা যে তদ্রূপ মানসিক চিন্তাপ্রণালী ও অভ্যাসক্রমে একজন বিশ্বস্রষ্টা

* Astronomy and General Physics, considered with reference to Natural Theology. by W. Whewell. D. D. Book. III. chaps. V and VI.

চৈতন্যস্বরূপকে অনুমান করিতে পারিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি! কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে এ প্রণালী অতি অল্প লোকেই অনুসরণ করেন। কারণ, এ প্রণালী অতি প্রশস্ত হইলেও ইহাতে সকলে সমান ফললাভ করিতে পারেন না। জগতে নিউটনের মত কয় জন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কয়জন তাঁহার মত সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন? অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় প্রণালীই অবলম্বন করেন। এই প্রণালী-ক্রমে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন মহা মহা মৌলিক তত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্তে আনীত হয়েন, তাঁহাদিগের চিন্তাপ্রণালীও তেমনি ক্রমশঃ অভ্যাস-প্রভাবে সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। তাঁহারা ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে উঠিতে জানেন না, কিন্তু বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রে নামিতে জানেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টি সেই আবিষ্কৃত সাধারণ মৌলিকতত্ত্ব-দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁহাদিগের ন্যায়পদ্ধতি সে গণ্ডী কখন অতিক্রম করিতে জানে না। তাঁহারা প্রকৃতির কঠিন ত্বক্ উদ্ভেদ করিয়া তাহার গূঢ় রহস্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। অতএব, বিচিত্র কি, সেই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি অন্ধজনগণ কখন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন না! এই দুই প্রণালীর প্রকৃতি আমরা যতই অনুধাবন করিয়া দেখিব, ততই আমাদিগের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বিশদ হইয়া আসিবে।

বিশেষ হইতে সামান্য।

প্রাকৃতিক ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা এবং বহুদর্শন দ্বারা এমত অনেক প্রাকৃতিক কার্য্য দেখিতে পান, যাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না। কিন্তু যখন কোন চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত এই সমস্ত অনির্ণেয় কার্য্যের

রহস্যোদ্ভেদ করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত কারণ দৃষ্টিগোচর করেন, যাহা তৎপূর্ব্বে কাহারও জ্ঞানগোচর ছিল না, তখন তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার অপূর্ব্ব সত্যসন্ধানে সকলই বিশদ ও সুন্দররূপে পরিস্কৃত হইতেছে। যাহা পূর্ব্বে অপরিজ্ঞেয় ও দুর্ব্বোধ ছিল, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। তিনি সহসা যেন কি এক আলোক দেখিতে পাইলেন—যে আলোক সমুদায় অজ্ঞান-তিমির দূরীকৃত করিয়া প্রকৃতির মুখ প্রভাসিত করিয়া দিল। এইরূপ আলোক কেপ্‌লার দেখিয়াছিলেন, যখন তিনি গ্রহগণের ভ্রমণ-পথের ব্যাসের সহিত প্রদক্ষিণকালের সম্বন্ধনির্ণায়ক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। এইরূপ আলোক নিউটন্ দেখিয়াছিলেন, যখন তিনি এক আকর্ষণ-শক্তির সাধারণ নিয়মে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ও সৌরজগৎ—গ্রহ, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নক্ষত্র এবং এই পার্থিব বালুকাকণাকেও একসূত্রে আবদ্ধ করেন। এইরূপ আলোক কোপার্ণিকাস এবং গ্যালিলিও প্রভৃতি মৌলিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমুদায় প্রতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও বিশদ এবং পরিস্কৃতরূপে প্রমাণিত হইতে লাগিল। যাহা পূর্ব্বে অকারণ ও দুর্ব্বোধ বলিয়া জ্ঞান হইত, তাহা তখন তাঁহাদিগেরই আবিষ্কৃত তত্ত্বের প্রমাণ হইয়া উহারই দৃঢ়তর পৃষ্ঠ-পোষক হইল।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যখন কোন প্রাচীন লিখন-খণ্ড পৃথ্বীতল হইতে আবিষ্কার করিয়া দেখেন যে, তাহার এক বর্ণও বুঝা যায় না, তাহাতে যে অক্ষর আছে, তাহা কোন পরিচিত ভাষার অক্ষরের মত নহে, কেবল সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, তখন তাঁহারা সেই লিখন-খণ্ড লইয়া যেরূপ গোলযোগে পড়েন, বৈজ্ঞানিকেরাও

তদ্রূপ প্রকৃতির কোন জটিল কার্য্য, পরিচিত সাধারণ সত্য দ্বারা বুঝিতে না পারিলে মহা গোলযোগে নিপতিত হয়েন। কিন্তু সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রকৃত ভাষা ক্রমে যখন উদ্ভাবিত ও অনুমানিত হইতে থাকে, তখন একে একে যেমন সমুদায় লিখনের অর্থগ্রহ হইতে থাকে এবং তৎ-সঙ্গে সঙ্গে অপার আনন্দ সঞ্চারিত হয়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও যখন বিশাল প্রকৃতির জটিল গ্রন্থের এক এক অধ্যায়ের গূঢ় অক্ষরের অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহাদিগের মনেও ঠিক তদ্রূপ আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে। এই উল্লাস এত অধিক হয় যে, ইহা হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে এইরূপ উল্লাসের ও উন্মত্ততার বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মন কিরূপ কুজ্ঝটিকায় অনতি অন্ধকারে আবৃত থাকে, তাহা কেপ্‌লারের জীবনী-লেখক তাঁহার দৃষ্টান্তে সুন্দর প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কেপ্‌লার কত রূপ অনুমান করিতেন এবং কত অনুমানই অসিদ্ধ হইয়া যাইত। কখন সন্দেহে, কখন নৈরাশ্যে মন নিতান্ত অভিভূত ও কাতর হইয়া পড়িত, আবার কখন বা সত্যের ঈষৎ বিভায় তাহা প্রভাসিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কখন অন্তর্দ্দেশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন বোধ হইত; কখন সেই মেঘের মধ্য হইতে যেন ক্ষুদ্র আলোক তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইত। অবশেষে অটল অধ্যবসায়-সহকারে যখন তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপ্রভাবে প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম কেমন পরিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইল! নিউটন একদা নিজ হৃদয়ালোকের সহিত

ব্রহ্মাণ্ডের আলোক দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন ঃ—"ঐ দেখ সূর্য্যদেবের মহা-প্রদীপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে কেমন সুন্দর স্থাপিত রহিয়াছে। কে উহাকে সৌর-জগতের এমত স্থলে স্থাপিত ও জ্বালিত করিয়া দিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড একদা নিয়মিত, পরিচালিত এবং আলোকিত হইতে পারে!"

নিউটন এইরূপ নিজ আবিষ্কৃত সত্যের হৃদয়ালোকে প্রচালিত হইয়া আর একটী বৃহত্তর আলোকে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যখন একটী মাত্র চমৎকার নিয়মের সুন্দর কার্য্য ও কৌশল উন্নয়ন করিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই কৌশলের পরিস্থাপক বিশ্বপতির সর্ব্বশক্তিমান্ হস্তবল অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্বতই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। তিনি অমনি বিশ্বপতির যশোঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একদা পৃথিবী হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ড-পতির সুরলোকে উত্থিত হইলেন। মানিলেন, বিশ্ব-পতির কি চমৎকার কৌশলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ব্যাপার পরি-চালিত হইতেছে! একমাত্র শক্তি-কৌশলে নিখিল সংসার ভ্রাম্যমাণ হইতেছে!

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যখন প্রকৃতির এইরূপ অনন্ত কার্য্য-পরম্পরা দেখিয়া কারণ হইতে কারণে উন্নীত হন, তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব সমুদায় সেইরূপ অনুমান-প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া আইসে এবং এই অভ্যাস-প্রভাবে তাঁহারা ক্রমে এক আদি-কারণে অধিরোহণ করেন। আমাদিগের দার্শনিক ন্যায়শাস্ত্রেরও গতি এইরূপ ছিল। এই অনুমান-প্রণালীকে উন্নয়ন-(Inductive) প্রণালী কহে। এই প্রণালীতে আমাদিগের কল্পনার কিছু কার্য্য

আছে। কারণ, কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ না করিলে কোন উন্নয়ন-সিদ্ধ তত্ত্ব ও নিয়ম অনুমিত হইতে পারে না। কিন্তু এই কল্পনাংশ এত দূর যুক্তিমূলীয় যে, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শ করে না। এই কল্পনাংশ কিরূপ যুক্তিমূলীয় তাহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

মনে করুন, আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সমক্ষে রাম, শ্যাম, কামিনী, রমণী প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল। তাহা দেখিয়া আমরা অনুমান করিলাম যে, সকল ব্যক্তিই মৃত্যুর বশবর্ত্তী। এই সিদ্ধান্তটি অনুমান মাত্র; কারণ, আমরা কিরূপে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া প্রমাণ করিতে পারি যে, আমরা রাম ও শ্যামকে মরিতে দেখিয়াছি বলিয়া, যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারাও মরিবেন, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহারাও মরিবেন! এইখানে আমাদিগকে কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইল এবং সেই কল্পনার অবলম্বনে আমরা অনুমান করিলাম যে, জীবিত এবং ভবিষ্য মানবকুলও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। কল্পনায় যে সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম, অসংখ্য দৃষ্টান্তে তাহা সপ্রমাণ হইতে লাগিল। যদি ইহা অসত্য হইত, তবে ইহার অসারতা কোন না কোন দৃষ্টান্তে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। এই সিদ্ধান্তে প্রকৃতি যে একই নিয়মে চিরকাল কার্য্য করে, এই মূল বিশ্বাসকে আমরা কল্পনা বলিয়াছি। তাহার কারণ এই, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের স্থল নাই। নিউটন পার্থিব আকর্ষণ-শক্তি দেখিয়া চন্দ্রমণ্ডলে যখন সেই শক্তি আরোপ করেন এবং চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ডময় তাহা বিস্তৃত করেন, তখন তিনি একটী সামান্য কল্পনা মাত্র করিয়াছিলেন। সেই কল্পনায় যে সিদ্ধান্ত

অনুমিত হইল, তাহা কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত নিয়মাবলিতে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিসিদ্ধ হইল এবং সমস্ত জগতীয় গণনার সহিত সমঞ্জসীভূত হইল। তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে এমত কোন ঘটনা ও দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা তাহার অনুমানকে প্রতিপোষণ করে নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রতিদিন নিজ বিস্তৃত আলোচনায় নিউটনের অনুমানকে সমর্থন করিতেছে। তদীয় অনুমানের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নাই বলিয়া সেই অনুমানকে সকলেই সত্য বলিয়া সম্ভাবিত জ্ঞান করেন। এরূপ সম্ভাবনার উপর যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণনীয় হয়। এই জন্য এই অনুমান-মূলে কল্পনা থাকিলেও তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। এই প্রকার অনুমান-ক্রমে আমরা যে সমস্ত মহা মহা সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই, তাহাই উন্নয়ন-প্রণালী-সিদ্ধ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। কল্পনা ইহার মূল, দৃষ্টান্ত ইহার পৃষ্ঠপোষক। ইহাকেই অনুমানের প্রতিসিদ্ধতা বলে।

এইপ্রকার যুক্তিমূলীয় অনুমান ব্যতীত কোন সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। যাঁহারা মহা মহা সাধারণ তত্ত্ব কল্পনার বলে অনুমান করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমশঃ তদ্রূপ তর্কপ্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। সেরূপ তর্কপ্রণালীতে কোন দোষ দেখেন না। তাঁহাদিগের চিন্তা ও মন সেইরূপ ন্যায়ে অভ্যস্ত হইয়া আইসে। তখন তাঁহারা যে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আদি-কারণকে সেই অভ্যাস-প্রভাবে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি! প্রথমে যাঁহাকে অনুমান করেন, পরে অসংখ্য অনুকূল দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দেদীপ্যমান দেখিতে পান।

সামান্য হইতে বিশেষ।

এক্ষণে আমরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে এতদুর উন্নতি দর্শন করিতেছি, এই সমস্ত সাধারণ মুলতত্ত্বই তাহার কারণ। যে সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সেই সমস্তের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আধুনিক বিজ্ঞানের নেতৃ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা এমত তত্ত্ব সমস্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে কাহারই জ্ঞানগোচর ছিল না এবং যদভাবে বিজ্ঞান একস্থানে দণ্ডায়মান ছিল। তাঁহারা এই তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিলে পর, গণিতজ্ঞেরা বিবিধ বিনিয়োগ দ্বারা উহাদিগের সত্যতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই গণিতজ্ঞেরা যেপ্রকার কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এ কার্য্য সমাধান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ভুয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই মূলতত্ত্ব সকলের সত্যতা যখন গণিত-শাস্ত্রে এতদূর প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না, এবং তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস রূপে পরিণত হইল, তখন অপর এক শ্রেণীস্থ বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া সেই সমস্ত মুলতত্ত্বের উপর আপনাদিগের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিস্থাপন করিলেন এবং উহাদিগেরই সম্প্রসারণ-ক্রমে নানাবিধ সিদ্ধান্তে অবনীত হইতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি-সাধন হইল। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এখন যে অসংখ্য পুস্তক দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এই সমস্ত মূলতত্ত্বের গণনাক্রমে অপর সিদ্ধান্তের সমাধান করা হইয়াছে। তাহাতে যাহা আছে, তাহা এই সমস্ত মূলতত্ত্বেই নিহিত আছে।

বাহ্য-বিজ্ঞানে নাস্তিকতা।

বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রণালী-ক্রমে এই সমস্ত নীচতর সিদ্ধান্তে

অবনীত হইয়াছেন, তাহাকে অবনয়ন-প্রণালী (Deduction) কহে। এক্ষণে এই প্রণালী বহুলরূপে প্রচলিত এবং তাহা উন্নয়ন-প্রণালীর ঠিক বিপরীতগামিনী। আমাদিগের নদীয়া-ন্যায়ের গতি এই প্রকার। এক্ষণে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞানকে দিন দিন সম্পন্ন করিতেছেন। এই প্রণালীর সর্ব্বদা অনুসরণে এবং নিয়ত পর্য্যালোচনায় বৈজ্ঞানিকগণের মানসিকচিন্তা ও ভাব-সমুদায় তাহারই অনুগত হইয়া আসিয়াছে। মন এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীতে ক্রমশঃ কেমন সঙ্কীর্ণ হইয়া নাস্তিকতায় পরিণত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে এক প্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। এতদ্দ্বারা মনের এরূপ অভ্যাস হইয়া আইসে যে, কল্পনা-পথে কোন তত্ত্বের আবিষ্কার করিবার পক্ষে তাহা নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে। কেবল কারণ হইতে কার্য্য এবং মূলতত্ত্ব হইতে অপর সিদ্ধান্ত করা যাহার ধর্ম্ম, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া, যাহা সেই কারণে ও মূলতত্ত্বে নিহিত নাই, এমত সত্যে আসিতে পারা যায় না। নিয়ত এই তর্কপ্রণালীর অনুসারী হইলে মন কখন অন্য পথে যাইতে চাহে না; কেবল সেই পথেরই নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। তখন কাজে কাজেই অপর প্রণালী-সিদ্ধ আনুমানিক তত্ত্ব তাহার সমক্ষে আনিলে সেই তত্ত্বের কাল্পনিক অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এই দেখুন, কিরূপ ন্যায়ে তাঁহারা ঐশ্বরিক অনুমানের খণ্ডন করিতেছেন :—

(১) যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে, অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিলে সেই কারণের অনুমান করিতে পারি; নহিলে নহে।

(২) আমরা ঈশ্বররূপ আদিকারণকে কখন জগৎ-সৃষ্টিরূপ

কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন আমরা কি ন্যায়ে জগৎ-কৌশল দেখিয়া তাহার আদি-কারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে যাই ?

(৩) মনুষ্য অগ্রে কল্পনা ও সংকল্প করে, তৎপরে সেই কল্পনানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই কার্য্য, কল্পনার ফল অথবা অবয়ব মাত্র। অগ্রে অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হয়, তৎপরে সেই নক্সানুসারে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তজ্জন্য আমরা একটী অট্টালিকা দেখিলে অনুমান করিতে পারি যে, তাহা পূর্ব্বে নির্ম্মাতার মনে কল্পনারূপে অবস্থিত ছিল, অথবা তাহা কল্পনারই ফলমাত্র। ইহা মানুষ-ব্যাপার।

(৪) কিন্তু এই বিশ্বব্যাপার ব্রহ্মাণ্ড কোন মানুষ-কার্য্যের সহিত তুলনীয় নহে, অথবা মানুষকার্য্যের সাংদৃষ্টিক-ন্যায়ে (Analogy) ইহার কারণ অনুমিত হইতে পারে না। যেহেতু :—

(৫) ঈশ্বরকে আমরা কখন কল্পনা করিতে দেখি নাই ; অথবা মানবাতীত অন্য কারণের কার্য্য যে মানবীয় কার্য্যের ন্যায় কৌশল ও কল্পনা-সম্ভূত হইবে, তাহা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে ?

(৬) কল্পনার অনুমান ও কৌশল উন্নয়ন করা মানবমনের ধর্ম্ম। মানব আত্মবৎ জগৎকে দেখিবে। মানবের চিন্তা কৌশলের সৃষ্টি না করিয়া কোন বিষয় অপর বিষয়ের সহিত পরস্পর-সম্বন্ধে অনুবদ্ধ করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা অভ্যাসবশতঃ বিশ্বব্যাপারেও কৌশলের অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু মানবমন নিজ স্বভাব-নিবন্ধন যে কৌশলের অনুমান করিতে যায়, সেই-রূপ কৌশলেই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? মানবের মন ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নহে। ব্রহ্মাণ্ড মানবের নিকট যেরূপে প্রতীত হয়, তাহা মানবের অনুমান মাত্র।

(৭) অতএব, ঈশ্বর-রূপ আদি-কারণে কৌশল কিরূপে আরোপিত হইতে পারে?

(৮) অতএব, ব্রহ্মাণ্ডরূপ অদ্বিতীয় কার্য্যেরও যে কারণ আছে, তাহার প্রমাণাভাব। যেহেতু, কারণ ব্যতীত যে কার্য্য হইতে পারে না, সে তর্ক ব্রহ্মাণ্ড-রূপ অদ্বিতীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না! এ জন্য ঈশ্বর অসিদ্ধ।

উল্লিখিত তর্ক-প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, তাহা অবনয়ন-(Deducton) মূলক। যে বুধগণ এই আপত্তি উত্থাপিত করিয়া ঐশ্বরিক অনুমানের খণ্ডন করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগের চিন্তা ও মন অবনয়ন-তর্ক-প্রণালীর এত পক্ষপাতী এবং তাহাতে নিয়ত এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা অন্য মাপে আর কিছুরই পরিমাণ করিতে পারেন না। যে তর্ক যাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সে তর্ক তাহাতে প্রয়োগ করিয়া সকল মূলবিশ্বাসের প্রতি তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা এমত কোন কারণ ভাবিতে পারেন না, এবং এমত কারণকে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন না, যাহাতে প্রতিপাদনীয় সিদ্ধান্ত নিহিত নাই; এবং এমত কার্য্যও সুসিদ্ধ জ্ঞান করেন না, যাহা কারণে নিহিত নাই। ইহাই ন্যায়-শাস্ত্রমূলক তর্ক। এ তর্ক-অতীত কোন সত্য গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও মূলতত্ত্ব সকল তর্কের মূল, সেই সমস্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব কোথা হইতে আইসে? যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা মূলসত্য বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লয়েন, তাহা কোন্ তর্ক-সাপেক্ষ? সেই সকল মূলতত্ত্ব কেমন কল্পনামূলক এবং ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত উক্ত অবনয়ন-প্রণালীতে কেমন বিখণ্ডিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ব-প্রদর্শিত—"সকল মনুষ্যই

মরণশীল” এবং নিউটনের বিশ্বব্যাপী “আকর্ষণ-শক্তির অনুমান”—এই দৃষ্টান্তদ্বয়ে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তবে আর তর্কের মূল কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ?

নাস্তিকতার খণ্ডন।

অতএব অবশ্য বলিতে হইবে যে, আমরা উন্নয়ন-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত মূলতত্ত্ব লাভ করিয়াছি, তাহার কোনটিই অবনয়ন-তর্ক-প্রণালী-দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। উন্নয়ন-প্রণালী-সিদ্ধ তত্ত্বের ধর্ম্মই এইরূপ। যে তর্কে ব্রহ্মাণ্ডের আদি-কারণ ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুমিত হইয়াছে, তাহা উন্নয়ন-সিদ্ধ। উন্নয়ন-সিদ্ধ তত্ত্ব দৃষ্টান্তে সমর্থিত হইবে, কিন্তু তর্কে প্রতিপাদিত হইবে না। সৃষ্টির যে কোন আদি-কারণ ঈশ্বর আছেন—এ মতের পৃষ্ঠপোষক দৃষ্টান্ত, বিরুদ্ধ-দৃষ্টান্ত অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক। সেই জন্য এই মত বরং চিরকালই দৃষ্টান্ত দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। অতএব, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি প্রকৃত অনুমানমূলক যুক্তি-সঙ্গত নহে।

যাঁহারা শুদ্ধ বিশ্ব ও বিশ্বের কার্য্য-কারণ-প্রণালী ধরিতে যান, তাঁহাদিগের মধ্যে তবে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। যে শ্রেণীস্থ লোক অবনয়ন-প্রণালীর যুক্তি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্তে নিম্নগামী হ’ন, তাঁহারা মহান্ ঈশ্বরতত্ত্বে কিরূপে পৌঁছিবেন ? কিন্তু যাঁহারা নিউটনের মত এই পরিমিত ও ক্ষুদ্র বিশ্ব হইতে অনন্ত কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার সমন্বয় সাধন করিতে যা’ন, তাঁহারাই ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঈশ্বরানুমানে সুসিদ্ধ হ’ন। বেদান্তদর্শনের “তত্তু সমন্বয়াৎ”-সূত্রে যে অনুমান-যুক্তি-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, ডারউইন্, অধ্যাপক টিণ্ড্যাল্, স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স,

হার্বার্ট স্পেন্সার্ প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বাহ্য-বিজ্ঞান-সিদ্ধ তত্ত্বাবলির সমন্বয়-সাধক সেইরূপ যুক্তিবলে এক অনন্ত বস্তুতে উত্থিত হইয়া সেই Absolute পুরুষকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, সেই বস্তু যে আবার চিৎ-স্বরূপ, তাহাও অনুমিত হইয়াছে। এই দেখুন, একজন বৈজ্ঞানিক কি বলিতেছেন ঃ—

"Still I must confess that I am rather drawn to that view of Nature which has favour with many of the most eminent physicists of the present time, and which sees in the Cosmos, besides Mind, only two essentially distinct things, namely, matter and energy, which regards all matter as one and all energy as one, and which refers the qualities of substances to the affections of the one substance, modified by the varying play of forces."

—The New Chemistry, by Cooke, page 117.

ইনি কি চিৎ, কি অচিৎ, কি শক্তি সমস্তই এক বস্তু-রূপে অনুমান করিয়াছেন। সেই বস্তু নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া জগতের এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। সেই শক্তি-সমস্তেরই রূপ এই জগৎ-দৃশ্য। আবার দেখুন ঃ—

"Sir William Crookes, the greatest Scientist of the United Kingdom, in his Presidential address before the British Association, said—'Outside our Scientific knowledge, there exists a force exercised by Intelligence, different from the ordinary intelligence common to mortals."

সুতরাং বাহ্যবিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধক অনুমান যে ব্রহ্মবাদের আভাস দেয়, তাহা বৈদিক অদ্বৈতবাদকেই সমর্থন করিতেছে। বৈদিক ব্রহ্মবাদ ঋষিদিগের অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক অনুভূতি হইতে সমুৎপন্ন। বাহ্যবিজ্ঞানের আভাসে সেই অনুভূতি এইরূপে সমর্থিত হইয়াছে। এই চিৎ-ব্রহ্মই যে পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মারূপে সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তাহা অন্য এক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন ঃ—

"Finally, our argument has led us to regard the production of the visible Universe as brought about by an Intelligent agency residing in the Universe."—The Unseen Universe. page 218.

বেদান্ত-মতে এই চিৎ-বস্তু কেবল সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ নানাবিধ চেতনাচেতন জীবে পরিণত হইয়াছে। সেই চিন্ময় ব্রহ্ম বিবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বময় অন্তর্যামিরূপে এই সমস্ত পরিণামের কিরূপ কারণ, তাহা আমরা "মায়াবাদে" প্রদর্শন করিয়াছি। উপরি উক্ত উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্যাবলি সেই কথাই সমর্থন করিতেছে। যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহা যে সেই চিদ্বস্তুর ঘোর তমোগুণান্বিত রূপ, হার্বার্ট স্পেন্সারও সেই কথার আভাস দিয়াছেন ঃ—

"Thus we are brought to the conclusion, that what we are conscious of as properties of matter, even down to its weight and resistance, are but Subjective affections produced by objective agencies that are unknown and unknowable"—The Principles of Psychology. Vol I. page 201.

এই Unknowable তাঁহার Absolute পুরুষ ; পুরুষ এই

জন্য যে, তাঁহাকে তিনি Agency বলেন। তবেই বাহ্য বিজ্ঞানের অনুমান এই যে, এ বিশ্বে কেবল একমাত্র বস্তু আছে, বেদান্ত যাহাকে "নেতি নেতি" রূপে ব্রহ্ম-পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক কুক বলিয়াছেন, এই অদ্বৈত বস্তুর অনুমান এক্ষণকার অনেক বড় বড় ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের যুক্তিযুক্ত মত ও সিদ্ধান্ত। আমরাও অনুমান-সিদ্ধ যুক্তিতে পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, এ বিশ্বে নিত্যবস্তু যদি কিছু থাকে, সেই নিত্যবস্তু অবশ্য অনন্ত ও অনাদি। শুদ্ধ নিত্যবস্তু ব্রহ্ম অনাদি এমত নহে, সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জগৎ ও জগৎ-সংসারলীলাও অনাদি। হার্বার্ট স্পেন্সারও বাহ্য-বৈজ্ঞানিক অনুমান-যুক্তিক্রমে সেই বৈদিক তত্ত্বেরই আভাস দিয়াছেন :—

Apparently, the universally co-existent forces of Attraction and Repulsion, which, as we have seen, necessitate Rhythm in all minor changes throughout the universe, also necessitate rhythm in the talality of its changes—produce now an immeasurable period during which the attractive forces predominating, cause universal concentration and then an immeasurable period during which the repulsive forces predominating cause universal diffusion—alternate eras of Evolution and Diffusion. And thus, there is suggested the conception of a Past during which there have been successive evolutions analogous to that which is now going on; and a Future during which successive other such evolutions may go on—ever the same in principle but never the same in concrete result"

বৈদিক সৃষ্টি ও প্রলয়-তত্ত্ব দেখুন, এস্থলে কেমন আভাসিত হইয়াছে। বৈদিক হিন্দুধর্ম্মানুসারে এই সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে পুনঃ পুনঃ চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে চিরদিনই হইবে। কারণ, ইহা নিত্যব্রহ্মের মায়িকলীলা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতি কল্পান্তে একবার বীজাকারে আসিতেছে, আবার কল্পারম্ভে পুনঃ প্রকটিত হইয়া সৃষ্টির বিকাশ করিতেছে। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব-ব্যাপার শুধু কি সৃষ্টিতে ও লয়ে ঘটিতেছে, বিশ্বের স্থিতিকালেও আমরা সেই আবির্ভাব এবং তিরোভাব-ব্যাপার সমস্ত জীবেই অহরহঃ দেখিতেছি। আমরা "ব্রহ্মবাদে" দেখাইয়াছি যে, ইহ-সংসারে সমস্ত জীবই একবার বীজাকারে আসিতেছে, আবার বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্ব-ব্যাপারে ঘটিতেছে, সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব-ব্যাপার কল্পে কল্পে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও ঘটিতেছে। কেবল স্থিতিকাল লইয়া প্রভেদ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালের এবং সৃষ্টিকালের স্থিতি সহস্র সহস্র যুগ বা ব্রহ্মার রাত্রিদিন, জীবগণের জন্ম-মৃত্যু জীবের রাত্রি-দিনের পরিমাণ-কালেই সম্পন্ন হইতেছে। মৃত্যুকালে জীব-সমস্ত একবার বীজাকারে আসিয়া তিরোহিত হইতেছে, আবার উৎপত্তি বা জন্ম-কালে পুনরাবির্ভূত হইয়া বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রহ্মের একই গুণময়ী গতি ও ক্রিয়াশীল ভাব চিরকাল ও সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে; ইহার বিরাম-বিশ্রাম নাই। ইহাই ব্রহ্মের নিত্য সংসার-লীলা। হার্বার্ট স্পেন্সারও বাহ্য বিজ্ঞান-আলোচনায় সেই নিত্য সংসার-লীলার আভাস পাইয়া যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

বেদান্ত বলেন, ব্রহ্মের এই সৃষ্টি ও লয় কেবল জীবের

ভেদজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন। জীবের অবিদ্যারূপিণী মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি-হেতুই তাহার সৃষ্টিজ্ঞান হইতেছে। মানুষ সাধনা-বলে যখন মায়ামোহ কাটাইয়া উঠেন, তখন আর সৃষ্টি নাই, সকলই অনন্ত ব্রহ্মময়। জীবন্মুক্ত ঋষিগণ সকলেই একমুখে এই কথাই বলিয়াছেন। আমরা "ব্রহ্মবাদের" অনুমান-যুক্তিতেও দেখাইয়াছি যে, এই অনন্ত জীবপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই অনন্ত ব্রহ্মের বিরাট্ বিকাশ।

অতএব, যে দ্বৈতবাদে পুরুষ-প্রকৃতি এবং জীব-ব্রহ্ম ভিন্ন, তাহা বাহ্য বিজ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ অনুমানেও তিষ্ঠিতে পারে না। দ্বৈতজ্ঞান অল্পবুদ্ধি ও স্থূলদৃষ্টি জনগণমধ্যেই আবদ্ধ; এ জন্য হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু সমাজে দ্বৈতবাদ গৌণীভক্তি-মূলক শাস্ত্রে এবং সামান্য জনগণমধ্যেই সুপ্রচারিত আছে; থাকাই উচিত, যে হেতু তদ্দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দ্বৈতবাদিগণকে অদ্বৈতবাদে আনিবার জন্য জ্ঞানবাদের উচ্চাধিকারে সেই দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ স্থাপিত হইয়াছে। তাই সাংখ্যজ্ঞানে অভিন্ন পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ এবং বেদান্তে মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে এই অধিকার-ভেদ নাই, এবং বিশ্ব ও ব্রহ্মের একতারূপ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদও উপদিষ্ট হয় নাই, সেই খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে যে দ্বৈতেশ্বরের নাস্তিক্য সম্ভাবিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

এই প্রস্তাবের উপসংহার কালীন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইহার আমূল শেষ পর্য্যন্ত হুইয়েল হইতে গৃহীত হয় নাই। এই প্রস্তাব-লিখিত ঈশ্বর-বিষয়ক তাবৎ কথা হুইয়েলে নাই। তাঁহার মূল মত ও অভিপ্রায় লইয়া আমরা তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা

করিয়াছি। ডাক্তার হুইয়েলের এমত অভিপ্রায় নহে যে, এক শ্রেণীর সমস্ত পণ্ডিতই নাস্তিক হইবেন, এবং অন্য শ্রেণীর সকল পণ্ডিতই ঈশ্বরের হস্ত প্রতি সৃষ্টিকাণ্ডে দেখিতে পাইবেন। তবে, কোন্ তর্ক-প্রণালী অধিক আলোচনা করিলে অপরিনিয়মিত ও অপরিণত বুদ্ধিতে কিরূপ ফলাফল দর্শে, তাহাই এ প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা বুদ্ধিকে নিতান্ত অন্ধ ও পক্ষপাতী করিয়া ফেলেন নাই, সুবুদ্ধি যাহাদিগের মনকে সুশাসনে রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের নাস্তিক হইবার অল্পই সম্ভাবনা। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই যে নাস্তিক হইবে, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। এক্ষণে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে যে পণ্ডিতগণ ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবনয়ন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন; শুদ্ধ অবলম্বন নহে, তাহাতে দিন-রাত আসক্ত হইয়া আছেন; সুতরাং তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাবাদি সেই প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে, এবং সকলে না হউক, অনেকেই সেই জন্য নাস্তিকতায় পদার্পণ করিতেছেন। অতএব স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহা বিজ্ঞানের দোষ নহে, ইহা তদীয় শিষ্যগণের দোষ, এবং বৈজ্ঞানিক শিষ্য-মাত্রেরই নাস্তিক হইবার সম্ভাবনা নাই।



অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে অনুমান।

অবৈজ্ঞানিক অনুমান।

আমাদের সামান্য জ্ঞান-সমুদায়, হয় ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ, না হয় সেই প্রত্যক্ষের অনুমান। বস্তুর গুণমাত্র ইন্দ্রিয়গণের বিষয়, গুণী নহে। এই গুণজ্ঞান সর্ব্বজীবে সমান নহে। মনুষ্যের গুণ-জ্ঞান যে প্রকার, তদিতর জীবজাতি সমূহের গুণ-জ্ঞান সে প্রকার নহে। মনুষ্যের চক্ষে যাহা সুন্দর, অন্য জীবের চক্ষে তাহা কুৎসিত। মনুষ্যের মল, শূকরের আহার; মনুষ্যের কর্ণে যাহা কর্কশ, অন্য জীবের শ্রবণে তাহা মধুর; মনুষ্যের সুগন্ধ, অন্যের দুর্গন্ধ এবং একের সুখস্পর্শ, অন্যের অগ্নিবৎ। তবে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব ও গুণ কি, তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে?

কেবল গুণমাত্র ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হওয়াতে, আমাদের বাহ্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, তাহা সাপেক্ষ (Relative) জ্ঞান মাত্র, তাহা দ্বৈত ও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। সংসারে সকল বস্তুই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের জ্ঞান নহিলে অপরের জ্ঞান জন্মে না। যদি শ্বেত জ্ঞান না হইত, তবে লোহিত বা কৃষ্ণজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। গো-জ্ঞান না হইলে অশ্ব-জ্ঞান হয় না। সুতরাং বাহ্যজ্ঞান মাত্রই পরস্পর-সাপেক্ষ-জ্ঞান। যাহা পরস্পর-সাপেক্ষ, তাহা (apostriori) অর্জ্জিত জ্ঞান। সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। কারণ, গুণজ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র, তাহা গুণীর নির্ম্মল, নিরপেক্ষ, অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বৈত Absolute জ্ঞান নহে। আমাদের বাহ্যজ্ঞানের এই সাপেক্ষ ধর্ম্ম-বশতঃ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অতীন্দ্রিয়ের আভাসমাত্র আইসে;—যেমন অংশত্ব-জ্ঞানে

নিরংশত্বের আভাস, অবয়ব-জ্ঞানে নিরবয়বের আভাস, পরিমিত-জ্ঞানে অপরিমেয়ের আভাস, সান্ত হইতে অনন্তের আভাস, অপূর্ণত্ব হইতে পূর্ণত্বের আভাস। কিন্তু এ সমস্ত আভাস, আভাস মাত্রই থাকিয়া যায় ; সেই আভাসের সত্তা বা অস্তিত্ব-সম্বন্ধে অনুমান কোন মীমাংসা করিতে সমর্থ নহে। অতীন্দ্রিয় বিষয়-সম্বন্ধে অনুমানের অন্ধতাপ্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে সম্ভাবনা এবং অসম্ভাবনা ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। সেই জন্য সাংখ্যকার কপিল এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীযুক্ত বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, অনুমানে ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন। চার্ব্বাক-দর্শনও সেই কথা বলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, সাংখ্যকার এমত কথা বলেন নাই যে, "ঈশ্বরাভাবাৎ"—ঈশ্বর নাই ; তিনি কেবল বলিয়াছেন, ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন :—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।"—সাংখ্যদর্শন, ১ অ, ৯২ সূত্র।

তদ্রূপ, জৈমিনিও ঈশ্বরের অনুমান-মাত্র নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু বেদজ্ঞানগম্য, পরমেশ্বরের নিরাকরণ করেন নাই। যখন মণ্ডন মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, জৈমিনি-মুনি কি কারণে ঈশ্বরের নিরাকরণ করিয়াছেন ? তদুত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—

"ইতি গূঢ়ভাবমনবেক্ষ্য বুধাস্তমনীশবাদ্যয়মিতি ব্রুবতে।
কিমু তাবতৈব স নিরীশ্বরবাদ্যভবৎ পরাত্মবিদুষাং প্রবরঃ॥

"পণ্ডিতগণ তাহার গূঢ়ভাব পর্য্যালোচনা না করিয়া সেই জৈমিনি মুনিকে 'ইনি ঈশ্বর মানেন না' এইরূপ বলিয়া থাকেন। পরমেশ্বর-বিষয়ক অনুমানের খণ্ডন করাতেই পরমাত্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য সেই জৈমিনি মুনি যে নিরীশ্বরবাদী হইবেন, এমত সম্ভবপর নহে।"

অনুমানে যে ঈশ্বর-সিদ্ধ নহেন, বেদান্ত সেই কথারই সমর্থন করিয়া বলেন :—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত-মবিজানতাম্॥"—তলবকারোপনিষৎ।

টীকাকার-অনুমত অর্থ এই ঃ—

"যাঁহারা এরূপ জানিয়াছেন যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন এবং যাঁহারা এরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, আমরা সামান্য ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই। জ্ঞানিগণ বিলক্ষণ জানেন যে, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে সম্যগরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করে যে, তাঁহাকে সামান্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান দ্বারা জানা যাইতে পারে।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানাদি অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান অনুমান-সিদ্ধ নহে। ভগবান্ কপিল ও জৈমিনি বেদান্তের অনুমত এই কথাই বলিয়াছেন। সেই জ্ঞান অন্য উপায় দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা বহুকাল হইতে সংসারে সু-প্রচারিত আছে। লোকে শৈশব হইতে তাহা অর্জ্জন করে এবং বড় হইলে মনে করিতে পারে যে, এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে স্বতই সঞ্জাত হইয়াছে। কিন্তু বেদ দেখাইয়া দিতেছে যে, তাহা পূর্ব্বে জ্ঞানিগণের আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে সাধারণ জনগণ-মধ্যে সুপ্রচারিত থাকিলে, উহার যে উৎপত্তি-কারণ নাই, এমত সম্ভবিতে পারে না। যখন উৎপত্তি-কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন উহাকে স্বভাবজ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং, আমরা আশৈশব যে সমস্ত অলৌকিক জ্ঞান অর্জ্জন করি, পরে সহজ বোধ হইলেও, বাস্তবিক তাহা সহজ জ্ঞান নহে। সে সমস্ত জ্ঞানই অর্জ্জিত।

জ্ঞানহীন ধৰ্ম্মগুরু।

অতএব, প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শুদ্ধ অনুমান দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা দুষ্কর। অনুমান লৌকিক বিষয় মধ্যে আবদ্ধ। সে গণ্ডী অতিক্রম করিতে গেলে অনুমান কোন মীমাংসা করিতে পারে না। ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে যাঁহারা আপ্তবাক্যের শাসনাধীন না হইতে চাহেন, তাঁহারা নানাবিধ অনুমান ও তর্কজালে জড়িত হইয়া নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। কিছুতেই তাঁহাদিগকে ঠিক রাখিতে পারে না। সাধারণ-সেব্য কোন ধৰ্ম্মমত বা তন্ত্র তাঁহাদিগকে শাসন করিতে পারে না। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক জন ধৰ্ম্মগুরু হইয়া পড়েন। শিষ্য কেহই নাই, অথবা নিতান্ত নির্ব্বোধেরা বা ধৰ্ম্মচিন্তাবিহীন জনগণ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সেই শিষ্যেরাই দেখে যে, আমাদের গুরুগণ প্রতি বৎসর নূতন নূতন বিষয় ও নূতন নূতন তন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। এক সময়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, অন্য সময়ের উপদেশের সহিত উহার মিল নাই। সুতরাং তাহাদের গুরু-গণ নিজে নিজেই আত্মবিরোধী হইয়া পড়েন। প্রতি বায়ু-ফুৎকারে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং কর্ণধারবিহীন নৌকা যেমন তরঙ্গবিক্ষিপ্ত হইয়া দিগ্‌বিদিক্‌-চালিত হইতে থাকে, তদ্রূপ, ধৰ্ম্মক্ষেত্রে আপ্তবাক্যশাসনাধীন না হইলে, শুদ্ধ নিজ বুদ্ধি ও অনু-মানাবলম্বিগণ নানা দিকে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকেন। আপ্তবাক্য কর্ণধারের কার্য্য সাধন করে; আত্মার গতি ও ধৰ্ম্মের গতি ঠিক করিয়া দেয়। তারপর, তুমি নানা গুরূপদেশে তরঙ্গ-দোলায় দোদুল্যমান হইতে পার, কিংবা কোন কোন সময়ে বায়ু-তাড়িত হইয়া পার্শ্বদিকে হেলিতে দুলিতে পার, কিন্তু বেদবাক্য তোমার লক্ষ্যকে ঠিক করিয়া দিয়া দিগ্‌দর্শনের শলাকাবৎ সেই অনুকূল

দিকেই তোমার অধ্যাত্ম-তরিকে প্রচালিত করে। মনু বলিতেছেন :—

"উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥"—১২-অ-৯৬।

"যাহা বেদ-মূলক নহে, পরন্তু পুরুষকল্পিত শাস্ত্র, তাহা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে, আধুনিকতা-হেতু তাহা নিষ্ফল ও মিথ্যা।"

বৈজ্ঞানিক অনুমান।

তবে কি অলৌকিক বিষয়-সম্বন্ধে অনুমান কোন কার্য্যেই আইসে না? আপ্তবাক্য দ্বারা অলৌকিক বিষয়-জ্ঞান জন্মিলে, অনুমান সেই জ্ঞানের সহায়তা করে। গুরূপদেশ বা শাস্ত্রজ্ঞান হইতে অদৃষ্টার্থক বিষয়ের অর্থবোধ জন্মে। এই জ্ঞানকে অনুমান বিশ্বজ্ঞানের নানাবিধ সম্ভব-যুক্তি বা বাহ্যবিজ্ঞানের তত্ত্বাবলির সমন্বয়-সাধক যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দেয়। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানমূলক অনুমান পরিদৃষ্ট হয়। এ জন্য দর্শন বলিয়াছেন, আমার অধিকারী হইতে গেলে, অগ্রে সমগ্র বেদপাঠ করিয়া বেদ-জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কারণ, দর্শন-শাস্ত্র সমুদায় বেদমূলক ও বেদেরই অনুমান-সিদ্ধ সমন্বয়ী মীমাংসক।

বেদান্ত-ভাষ্যকার পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যমন্দির বলেন :—

"ন চানুমানস্য নিয়তপ্রামাণ্যম্।"

অনুমানের নিয়ত প্রামাণ্য নাই। মাধবাচার্য্য এ কথার ব্যাখ্যা করিয়া লেখেন :—

"ন চানুমানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রামাণ্যমস্তি।"

"অনুমান স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কোন বিষয়ে (ধর্ম্মবিষয়ে) প্রমাণ হইতে পারে না।"

কূর্ম্মপুরাণেও ঐ কথা :—

"শ্রুতিসাহায্যরহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।
নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ ॥
শ্রুতিস্মৃতিসহায়ং যৎ প্রমাণান্তরমুত্তমম্।
প্রমাণপদবীং গচ্ছন্নাত্র কার্য্যা বিচারণেতি ॥"

"শ্রুতি-সাহায্য-নিরপেক্ষ অনুমান কুত্রাপি নিয়ম-সহকারে অর্থ-সাধনে সমর্থ এবং প্রমাণান্তর রূপে পরিগণিত হয় না। যাহা শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্য-সমন্বিত, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং তাহাই প্রমাণ-পদবিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। এ বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই।"

মনু বলিতেছেন ঃ—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥" ১২অ—১ ৬।

"বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধি মীমাংসাদি তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনি ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।"

গীতা কিরূপ অনুমান-দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চাহেন? গীতা নিজেই তাহা বলিতেছেন ঃ-

'মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥"—১০অ—৯।

"ভগবদ্ভক্তগণ আমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া মদীয় তত্ত্ব. ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ-সমূহ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া এবং নিরন্তর আমার কীর্ত্তন করিয়া নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন ও পরম শান্তিলাভ করেন।"

শ্রীধর বলেন,—শ্রুত্যাদি প্রমাণে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-প্রয়োগ করিয়া যেরূপে ব্রহ্মকে জানা যায়, সেইরূপে জানিয়া ভক্তগণ ব্রহ্ম-তত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। অন্যত্রও গীতা বলেন ঃ—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥" ৪অ—৩৯।

"যিনি গুরূপদিষ্ট বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্, গুরুভক্তিপরায়ণ এবং যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ, জ্ঞানলাভানন্তর তিনি অচিরে মোক্ষলাভ করেন।"

গীতার বিষয় যে আত্মজ্ঞান, তাহা লাভ করিতে হইলে সংযতেন্দ্রিয় হওয়া চাই এবং গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া গুরূপদেশ শ্রবণ করা চাই। গুরূপদেশে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে কখনই গীতোপদিষ্ট আত্মজ্ঞানের অধিকারী নহে। কিন্তু যাহারা গুরূপদেশ এবং শাস্ত্রজ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়া শুদ্ধ অনুমান ও স্বকীয় স্বতন্ত্র বুদ্ধি অবলম্বনে সংশয়ী হয়, তাহারা কেবল নিরীশ্বরতায় উপনীত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। গীতা সেই কথা বলিতেছেন :—

'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥"—৪অ—৪০।

'যাঁহার গুরূপদিষ্ট অর্থে জ্ঞান নাই বা কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলেও তাহাতে শ্রদ্ধা নাই, তিনি সংশয়ী হইয়া বিনষ্ট হন। তাঁহার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং সুখও নাই।"

আত্মার অনুমান।

তবেই গীতা বলিতেছেন যে, যে-সামান্য অনুমান ও বুদ্ধি পারমার্থিক বিষয়ে কেবল সংশয়পূর্ণ এবং শ্রদ্ধাবিহীন, তদ্দ্বারা আমি প্রামাণ্য নহি। আমার প্রমাণ ভক্তিযুক্ত অনুমান। এইরূপ অনুমান দ্বারা গীতোক্ত আত্মতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ, কর্ম্মফলবাদ প্রভৃতি সমুদায় বৈদিক অলৌকিক তত্ত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। গীতা সেরূপ প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মতত্ত্বের অনুমানমূলীয় প্রমাণ এইরূপ :—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"—২অ, ১৬।

যাহা কখনই ছিল না, তাহা কিরূপে হঠাৎ উৎপন্ন হইবে? যাহার সত্তা আছে, তাহাই বরং বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বিভিন্ন কালে থাকিতে পারে। সুতরাং যাহাকে আমরা অনিত্য বা অসৎ পদার্থ বলি, তাহার যে একেবারে অস্তিত্ব নাই এমত নহে, তাহার সত্তা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া নূতন নূতন আকারে বিদ্যমান আছে। অতএব সমুদায় অসৎ বা অনিত্য রূপের মধ্যে এক নিত্য বস্তু আছে। সেই নিত্য বস্তুরই নানা পরিণাম দৃষ্ট হয়। আমরা যে মনুষ্যাদি জীবগণের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু দেখিতেছি, জন্মের পূর্ব্বেও তাহারা না থাকিলে কিরূপে সহসা নিজ নিজ রূপে দেখা দিবে? যাহারা জন্মের পূর্ব্বে ছিল, তাহারা মৃত্যুর পরেই বা একেবারে ধ্বংস হইবে কি প্রকারে? জীবিতাবস্থায় তাহারা যে রূপে আছে, সেই রূপ যাইতে পারে, তা বলিয়া তাহারা যে একেবারে থাকিবে না, এমত সম্ভব নহে। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে তাহাদের বর্ত্তমান জীবিতাবস্থা কোথা হইতে আসিল? তাই গীতা বলিয়াছেন :—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥"—২।২৮।

"হে ভারত! ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত (চক্ষুরাদির অগোচর), মধ্যে বা জীবিতকালে ব্যক্ত এবং নিধনেও অব্যক্ত। অতএব, তাহাতে আবার শোকের বিষয় কি?"

আলোক ভিন্ন যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না, তেমনি সৎ ভিন্ন অসতের প্রতীতি হয় না। এই দেহ এবং সুখ-দুঃখ-বোধ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা দিবানিশি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা কোন্ বস্তুর পরিণাম? যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া এই পরি-

বর্ত্তনশীল অসতের (মায়ার) নিয়ত উদয় হইতেছে, তাহাই নিত্য আত্মা। এ স্থলে বহির্বিষয়ের অনুমান অলৌকিক আত্ম-বিষয়ে আরোপ করিয়া সামান্যতোদৃষ্ট-ন্যায়ে (Analogy) আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণ সিদ্ধ হইল। যেমন মৃত্তিকা পদার্থের নানা পরিণামে শরাবাদির উদ্ভব হইলেও সেই শরাবাদির বিনাশে সেই মৃত্তিকাই থাকিয়া যায়, তাহার আর ধ্বংস নাই; তদ্রূপ আত্মার নিত্যতা অনুমান-সিদ্ধ। এজন্য দর্শন শাস্ত্রে উপমান প্রমাণ-মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা উপমানকে অনুমান-অন্তর্গত বলেন, তাঁহারা উপমানকে অস্বীকার করেন না।

জন্মান্তর-বাদ।

গীতার জন্মান্তরবাদ কিরূপ বেদজ্ঞান-মূলক অনুমান-তর্কে সিদ্ধ, দেখুন ঃ—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"—২।১৩।

মানুষ এই দেহেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার বাল্যকালে যে দেহ থাকে, যৌবনে কি সে দেহের কিছু থাকে? না যৌবনে এক নূতন দেহের সৃষ্টি হইয়াছে? বাহ্য বিজ্ঞান-মতে প্রতিক্ষণে দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য চলিতেছে। সেই নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য-প্রভাবে প্রতি দশ বৎসর অন্তর কি মানবের নূতন নূতন দেহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে কৌমার-পরে যৌবন আসিলে মানুষের যে দেহান্তর, যৌবনের পর প্রৌঢ়েও সেই দেহান্তর এবং প্রৌঢ়ের পর জরায়ও তদ্রূপ দেহান্তর; সুতরাং এই কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও জরায় মানুষের কৌমার-মৃত্যু, যৌবন-মৃত্যু এবং প্রৌঢ়-মৃত্যু ঘটিতেছে। কারণ, সেই সেই

কালে তাহার পূর্ব্ব-শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন হইয়াছে। জীব যদি এতবার মৃত্যুর পর জীবিত থাকে, তবে জরা-মৃত্যুর পর যে জরা-শরীরের ধ্বংস-সাধন হয়, সেই শরীর-ধ্বংসের পর সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন? অতএব মৃত্যুর পর যে জীবাত্মা বিদ্যমান থাকিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ অনুমান। সুতরাং এই যুক্তিতে জীব বাঁচিয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধিযুক্ত (ধীর) জ্ঞানী জীবের মৃত্যু দেখিয়া মুহ্যমান হয়েন না। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়, সেই দেহেরও আবার কৌমার, যৌবন, জরা এবং মৃত্যু আছে, এবং তৎপর দেহেরও তদ্রূপ উৎপত্তি ও লয়ক্রমে জীবের জন্মজন্মান্তর অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই গীতা বলিলেন :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"—২।২২।

"মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করেন, দেহীও (আত্মা) সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ প্রাপ্ত হন।"

দেহাত্মবাদ।

এই অনুমান-তর্কে দেহাত্মবাদও খণ্ডিত হইতেছে। দেহাত্মবাদ খণ্ডিত না হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মার সত্তা সপ্রমাণ হয় না। বেদান্ত-দর্শনে তাই সেই দেহাত্মবাদ এইরূপ ব্যতিরেকী অনুমান-যুক্তিতে খণ্ডিত হইতে দেখা যায়। বেদান্তসূত্র এই :—

"ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ।"—৩।৩।৫৪।

এই সূত্রের শারীরক ভাষ্যে এইরূপ যুক্তি-পথ অবলম্বিত হইয়াছে :—

১। দেহই যদি আত্মা হয়, তদতিরিক্ত আত্মা যদি না থাকে,

তবে ত বলিতে হইবে যে, আত্মা রূপাদির ন্যায় দেহেরই ধর্ম্ম। যাহা দেহের ধর্ম্ম, তাহা দেহেই বর্ত্তমান। কিন্তু এমত অনেক সময় দেখা যায় যে, দেহ আছে, অথচ চৈতন্যাদি ধর্ম্ম নাই। যদি চৈতন্যাদি আত্মধর্ম্ম হয়, তবে ত দেহসত্ত্বেও সেই ধর্ম্মের অভাব দেখা যাইতেছে। তবে কিরূপে বলিতে পার, চৈতন্য দেহধর্ম্ম?

২। দেহধর্ম্ম যে রূপাদি, তাহা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আত্মধর্ম্ম যে চৈতন্য, স্মৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতি, তাহা কি অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়? তবেই দেহধর্ম্ম একপ্রকার, আত্মধর্ম্ম অন্যপ্রকার। দেহধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র।

৩। যতকাল দেহ আছে, ততকাল চৈতন্য আছে বলিতেছ। কিন্তু দেহাত্মবাদীরা কি নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, দেহের পতনে চৈতন্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট আত্মা থাকে না? যদি মৃত্যুর পর অন্য দেহে যাইলেও যাইতে পারে এমত সংশয় হইতে পারে, তবে কি সেই সংশয়ই নাস্তিক দেহাত্মবাদ খণ্ডন করিতেছে না? যে বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে কোন পক্ষই নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে না। তবে দেহাত্মবাদী কিরূপে নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, দেহের অবিদ্যমানে আত্মার অবিদ্যমানতা ঘটিবে?

৪। চৈতন্যাদি আত্মধর্ম্ম যদি দেহধর্ম্ম হয়, তবে কি বলিতে চাও যে, যে পঞ্চভূতে দেহ গঠিত, চৈতন্য সেই পঞ্চভূতের ধর্ম্ম, না, তাহা মদশক্তির ন্যায় শরীরাকারে সংহত ভূতনিচয় হইতে স্বতন্ত্র উৎপন্ন পদার্থের ধর্ম্ম? যদি বল, তাহা স্বতন্ত্র উৎপন্ন পদার্থের ধর্ম্ম, তাহা হইলে তোমরা ত দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থের সত্তা অস্বীকার কর না? যদি স্বতন্ত্র পদার্থের সত্তা স্বীকার কর, তবে সেই স্বতন্ত্র সচেতন পদার্থের সমুদায় ধর্ম্মাদি কি দেহজ্ঞান দ্বারা অবধারিত

হইতে পারে? দেহকে তুমি দেখিতে পাইতেছ, এবং তজ্জন্য উহার ধর্ম্মাদিও নির্ণয় করিতে পারিতেছ। কিন্তু চেতনশীল আত্মাকে ত দেখিতে পাইতেছ না, তবে তাহার সমুদয় ধর্ম্ম কিরূপে নির্ণয় করিয়া বলিতে পার যে, তাহা দেহপাতে বিদ্যমান থাকিবে না? অতএব দেহাত্মবাদি! তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র আত্মপদার্থ যেমন অস্বীকার্য্য, তেমনি সেই চেতনশীল স্বতন্ত্র আত্মপদার্থের নিত্যানিত্যতাও অস্বীকার্য্য।

সাংখ্যকার কপিল এ পক্ষকে অন্যরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তণ্ডুলাদি সুরাবীজ দ্রব্য সকলের প্রত্যেকেই সূক্ষ্মরূপে মদশক্তি বিদ্যমান আছে। তণ্ডুল গুড়াদির পরস্পর সংযোগে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয় মাত্র। অতএব এ দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয় না; এ দৃষ্টান্ত ঘটাইতে গেলে, দেহাত্মবাদি! তোমাকে স্বীকার করিতে হয় যে, যে পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত, তন্মধ্যে চৈতন্য-সত্তা সূক্ষ্মরূপে নিহিত ছিল, তাহাদের একত্র সংযোগে সেই চৈতন্যের উন্মেষ-সাধন হইল। তাহা হইলে ত তুমি চৈতন্যের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে, কিন্তু তাহা ত তোমার স্বীকার্য্য নহে। কিন্তু যদি বল, হরিদ্রা ও চূর্ণযোগে এক নূতন বর্ণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। সে দৃষ্টান্তেও তোমার প্রত্যক্ষবাদের ব্যাঘাত হইতেছে। কারণ, হরিদ্রা ও চূর্ণের পরস্পর সংযোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়া যখন বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড় ভূতনিচয়ের পরস্পর মিলনে ত জড়ধর্ম্মান্বিত বর্ণেরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত চৈতন্যেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। তবে আর সে দৃষ্টান্ত কিরূপে ঘটিবে? সুতরাং এ পক্ষেও দৃষ্টান্তহানি দোষ ঘটিল।

৫। চৈতন্য কি পঞ্চভূতের ধর্ম্ম? তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু সেই শারীরিক পঞ্চভূত স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত হইলে, তাঁহাতে চৈতন্যসত্তা তোমার স্বীকার্য্য নহে। কারণ, দেহাতিরিক্ত কোন পদার্থেই ত তুমি চৈতন্য স্বীকার কর না।

৬। চৈতন্যই ভূত-ভৌতিক শরীরকে প্রকাশ করে। যেহেতু চৈতন্য না থাকিলে তোমার শরীর-জ্ঞান হইত না। সুতরাং চৈতন্যরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয় তোমার শরীর। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয় অবশ্য পৃথক্। অগ্নির তাপ অপর অপর দ্রব্যকেই দগ্ধ করে, অগ্নি আপনাকে আপনি দগ্ধ করিতে পারে না। তদ্রূপ দেহই যদি চৈতন্য হয়, তবে সেই চৈতন্য দেহকে কিরূপে বিষয়ীভূত করিতে পারিবে? নট পরকে স্কন্ধে লইতে পারে; কিন্তু যে যত কেন সুশিক্ষিত হউক না, তথাপি সে আপনার স্কন্ধে আপনি আরোহণ করিতে পারে না।

৭। হে দেহাত্মবাদি! চৈতন্য দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য শরীরের অস্তিত্ব যেমন তুমি স্বীকার কর, তদ্রূপ চৈতন্যের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ চৈতন্যের নিজ সত্তাকে স্বীকার না করিবে কেন? চৈতন্য যে শরীরকে উপলব্ধি করে এমত নহে, সে ত আপনাকেও উপলব্ধি করে? চৈতন্যের এক প্রকার উপলব্ধি-রূপ বাহ্য শরীর যদি তোমার প্রামাণ্য ও স্বীকার্য্য হয়, তবে সেই চৈতন্যের আভ্যন্তরিক উপলব্ধি-স্বরূপ নিজাত্মাকে তুমি অস্বীকার কর কেন? তাহাও অবশ্য প্রামাণ্য ও স্বীকার্য্য। শুদ্ধ যে আভ্যন্তরিক উপলব্ধির বিষয় এই চৈতন্য-সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার্য্য এমত নহে, সেই চৈতন্যসত্তা আবার চিরদিনই তোমার শরীরকে এবং আপনাকে এক ভাবিয়া উপলব্ধি করিতেছে। যে চৈতন্যসত্তার

কৌমারে উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাই অভেদরূপে জরায় উপলব্ধ হইয়াছে। সুতরাং সেই চৈতন্যসত্তার নিত্যতা বা একরূপতাও উপলব্ধি হইয়াছে। "আমি ইহা দেখিয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞান, দশ বৎসর পরের প্রত্যভিজ্ঞানেও একই ব্যক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এই "আমি"র উপলব্ধি চিরকালই নিত্য রহিয়াছে। কি ভূত, কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালেই একই "আমি"র উপলব্ধি স্মৃতিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই "আমি" যদি বিভিন্ন হইত, তবে স্মৃতি থাকিত না; একই বলিয়া ত্রিকালের স্মৃতি সেই একই "আমি"তে বিদ্যমান আছে। চৈতন্যের উপলব্ধি-রূপ যদি একই শরীর বিদ্যমান থাকে, তবে একই "আমি"র উপলব্ধিস্বরূপ "আমি"ও স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে একের নিপাতে অন্যের নিপাত কিরূপে সম্ভব? সেই উপলব্ধিকে যদি শরীরের ধর্ম্ম বল, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু শরীর কিছু উপলব্ধি করে না। শরীরকে বরং চৈতন্যই উপলব্ধি করে। প্রদীপের আলোক উপস্থিত থাকিলে তৎসম্মুখস্থ বস্তুর উপলব্ধি হয়; নচেৎ হয় না। তবে কি সেই উপলব্ধিকে প্রদীপের ধর্ম্ম বলিতে পার? যদি না পার, তবে উপলব্ধিকে দেহধর্ম্ম বলিবে কি প্রকারে? তাই যদি না হয়, তবে দেহ বিদ্যমানে উপলব্ধির বিদ্যমানতা, এবং দেহপাতে উপ-লব্ধির অভাব অবধারণ করিতে পার না। আবার দেখ, দেহ নহিলেই যে উপলব্ধি নাই এমতও নহে। দেহ যখন মৃতপ্রায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তখনও স্বপ্নকালে নানাপ্রকার উপ-লব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং উপলব্ধির জন্য দেহই যে একান্ত উপযোগী, এমতও বলিতে পার না। উপলব্ধির একমাত্র উপকরণ দেহ নহে।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, দেহই আত্মা নহে, দেহ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা আছে। কেননা, যাহা যাহাকে তোমরা দেহধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাক, তাহা তাহার কিছুই দেহধর্ম্ম নহে; তদতিরিক্ত অপর এক পদার্থের ধর্ম্ম। সেই অতিরিক্ত বস্তুই আত্মা। তোমরা যেমন উপলব্ধাকে বিষয়াতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার কর, আমরাও সেইরূপ উপলব্ধিরূপ আত্মাকে সে সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করি। তাই যদি হয়, তবে দেহপাতে আত্মার নিপাত একান্ত অবশ্যম্ভাবী নহে।

পাপ-পুণ্য ও কর্ম্মফলবাদ।

দেহগত আত্মা যদি দেহ হইতে পৃথক্ হইল, তবে মৃত্যুর পরও যে, তাহা দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার প্রমাণ জীবের বর্ত্তমান দেহ। বর্ত্তমানকালে এই মনুষ্যলোকে যত প্রকার জীব-দেহ বিদ্যমান, সকলই মানবাত্মার যোনি-ভ্রমণাবস্থা বলিতে হইবে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ত্রিগুণের প্রাধান্য বশতঃ মানবকে মৃত্যুর পর হয় দেবলোকে, না হয় মনুষ্যলোকে মনুষ্যকুলে অথবা তদিতর যোনিতে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। কতকাল ধরিয়া এরূপ করিতে হয়? যতদিন না জীবের সমস্ত কর্ম্মভোগ নিঃশেষিত হয়। তাই জীব অনাদিকালই সংসারধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া শরীর-ধারণ পূর্ব্বক নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আসিতেছে। তাই গীতা বলিয়াছেন :—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"—৫।১৫।

"ঈশ্বর কাহারও পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না; কারণ, তিনি পূর্ণকাম বিভু।

যিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন কামনাও নাই, স্বার্থসিদ্ধিও নাই। জীব আপনার কর্ত্তৃত্ব আপনি সৃষ্টি করিয়াই চিরদিনই কর্ম্মে লিপ্ত হইতেছে এবং সেই কর্ম্মলিপ্ত থাকিয়া চিরদিনই সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। কারণ, যাহার কর্ত্তৃত্ব, তাহারই কর্ম্ম, যাহার কর্ম্ম তাহারই কর্ম্মফলভোগ। মানুষ মায়ামুগ্ধ হইয়া এইরূপ কর্ম্ম করিয়া তৎফল ভোগ করিতেছে।"

তবেই মানুষের অহঙ্কার হইতে তাহার কর্ত্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। সেই কর্ত্তৃত্ব হইতেই নানাবিধ কামনাজাত কর্ম্মের উৎপত্তি হইলে সেই কর্ম্মের ফলভোগ হয়। মানুষের এই অহঙ্কার যত দিন ও যতক্ষণ থাকিবে, ততদিন ও ততক্ষণ তাহাকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতেই হইবে। কর্ম্ম হইলেই সেই কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। তাহার আসক্তি ও কামনার প্রকৃতি ধরিয়াই শাস্ত্রে পাপ পুণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কি পাপ, কি পুণ্য, উভয়েরই মূল কামনা। হিন্দুধর্ম্মে পাপপুণ্যবাদের এই সহজ ও একমাত্র নীতি। কামনা ও আসক্তিই পাপ পুণ্যের হেতু। তাহা হইতেই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ। এই কর্ম্মফলভোগ হেতু মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি হয় নীচগামিনী হয়, না হয় উচ্চগামিনী হয়। মানব-প্রকৃতির এইরূপ অধোগতি ও ঊর্দ্ধগতিই পাপ-পুণ্যের ফলাফল। সেই ফলাফল সকল সময়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না, অথচ তাহা প্রতিনিয়তই সম্ভাবিত হইতেছে। সুতরাং মানুষের কর্ম্মই তাহার সুখ-দুঃখের, পাপ-পুণ্যের, স্বর্গ-নরকের এবং সর্ব্ব সম্পত্তি ও বিপত্তির কারণ। তাই এই কর্ম্মবাদই হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তি। এজন্য, এই কর্ম্মবাদেরই সমুদায় তত্ত্ব গীতায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। কর্ম্ম করিলেই যখন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, তখন কি ইহজীবনে সর্ব্ব-কর্ম্মফলভোগ শেষ হইতে পারে? তাহা যখন সম্ভাবিত নহে,

তখন মানুষের জন্ম-জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী হইতেছে। কেবল যিনি সাধনা-বলে নৈষ্কর্ম্ম্য সাধন করিতে পারেন, তাহারই কর্ম্মফল-ভোগ না থাকাতে সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না। নহিলে চিরকালই সংসারের যাতনা ভোগ করিতে হইবে। তাই যদি হইল, তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আদিতে কর্ম্মফল কোথা হইতে আসিল? তৎসম্বন্ধে গীতা বলেন, তুমি আদি কোথা পাইলে?

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥"—১৩।১৯।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার, সুখ দুঃখ,পাপ ও পুণ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে উৎপন্ন, তাহা সেই প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। সুতরাং যুক্তি এই, যখন এই প্রকৃতিই অনাদি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, প্রকৃতি-জাত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদিও অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কর্ম্মফল-নিবারণের একমাত্র উপায় নৈষ্কর্ম্ম্য-সাধন। সেই নৈষ্কর্ম্ম্য কেবল কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হয়। সেই অবস্থায় পাপ নাই, পুণ্য নাই, কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, সবই একাকার, সবই "এক-মেবাদ্বিতীয়ং"। অনুমান এই খানে নিরস্ত হইল।

অনুমানে আত্মপ্রত্যক্ষ।

যে অনুমান-তর্কে হিন্দু-ধর্ম্মের মূলভিত্তিস্বরূপ আত্মতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এই আত্মজ্ঞান লব্ধ হইলে জীবের যে অলৌকিক

প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই প্রত্যক্ষের উপর এই সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বের শেষ-প্রামাণ্য স্থাপিত। এখন কথা এই, যাহারা অজ্ঞানী ও মূঢ়, সেই সামান্যজনগণের নিকট এই অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রমাণ কোথায়?

মনে করুন, আমরা হিন্দু ভারতবাসী, কখন আমেরিকায় যাই নাই; তবে আমেরিকার সত্তায় বিশ্বাস করি কেন? সে বিশ্বাসের এই কয়েকটি কারণ আছে ঃ—

(১) আমেরিকা যাঁহাদের জন্মভূমি, সেই মার্কিনেরা ভারতে আসিয়া এখানে মার্কিন দ্রব্যের আমদানি করিয়া সেই মহাদেশের সত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন।

(২) অপরদেশীয় লোকও আমেরিকায় গিয়া স্বচক্ষে সেই মহাদেশ দেখিয়া আসিয়া তাহার সত্তা ভারতবাসিগণের নিকট সপ্রমাণ করিতেছেন।

(৩) এই দুই শ্রেণীর লোকেরই মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা-বাক্য বলিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ যখন আমেরিকায় যাওয়া আপামর সকলেরই সাধ্য, তখন প্রবঞ্চনা-বাক্য অসম্ভব।

অজ্ঞানীর নিকট আত্মপ্রত্যক্ষও তদ্রূপ অনুমানে প্রামাণ্য। প্রথম কারণ—গীতা বলিতেছেন ;—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"—১৫অ—১৫।

"আমি সমুদায় বেদদ্বারা জ্ঞাতব্য, আমি বেদান্তকৃৎ (জ্ঞানদাতা গুরু) এবং আমি বেদার্থবেত্তা।"

সুতরাং তিত্তির প্রভৃতি নানা ব্রহ্মবিৎ বৈদিক ঋষি আত্মপ্রত্যক্ষ-লব্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া সেই আত্ম-প্রত্যক্ষ-সত্তার প্রমাণ দিতেছেন।

দ্বিতীয় কারণ—তৎপরবর্ত্তী ব্যাসাদি নানা সিদ্ধ ঋষি সেই আত্ম-প্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। গীতা বলিতে-ছেন ঃ—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥"—১০অ, ১২।১৩।

"তুমি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয় ও পরম পবিত্র বস্তু। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি সকলেই তোমাকে এক বাক্যে নিত্য পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব (দেবগণেরও কারণ), জন্মরহিত, সর্ব্বব্যাপক ও প্রভুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং (অর্জ্জুন বলিতেছেন) তুমি স্বয়ংও আমাকে ঐরূপ কহিতেছ।"

সুতরাং গীতার এই বাক্যে সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈদিক ঋষিগণের পরবর্ত্তী কালের সিদ্ধ ঋষিগণও সেই আত্মপ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া একই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণোক্তির সহিতও মিলিয়া যায়।

তৃতীয় কারণ—কি বৈদিক ঋষি, কি তৎপরবর্ত্তী ঋষি, কাহারই প্রতারণা করিবার কোন কারণ নাই; যে হেতু আত্ম-প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসহ; পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত বা অপ্রমাণীকৃত হইতে পারে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন অলীক কথার সম্ভাবনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সাধ্যগণ পরম আরাধ্য, নিষ্কামী, নিঃস্পৃহ এবং নিঃস্বার্থ হইয়া বিপ্রলিপ্সার অতীত হইয়া-ছিলেন। অতএব, তাঁহাদের কথা অপ্রামাণ্য নহে; অপ্রামাণ্য নহে কেন? যেহেতু, তাঁহাদের কথা যেমন বিপ্রলিপ্সা-দোষে

দুষ্ট নহে, তেমনি ভ্রান্তিসঙ্কুল, প্রমাদবিশিষ্ট এবং করণাপাটব-দোষেও দূষিত নহে। বাস্তবিক, সামান্য মনুষ্যবাক্যের যে যে দোষ, তাঁহাদের বাক্য সে সমুদায় দোষের অতীত হইয়া আপ্ত-বাক্য-রূপে প্রামাণ্য হইয়াছে।

এই এই কারণবশতঃ হিন্দু অজ্ঞানিগণ গীতোক্ত বৈদিক আত্ম-প্রত্যক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ-ফল প্রত্যক্ষ বলিয়া যেমন আয়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্য, বেদোক্ত অলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় সেইরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণে সিদ্ধ হওয়াতে তাহাও আয়ুর্ব্বেদবৎ প্রামাণ্য। তাই ন্যায়-দর্শন বলিলেন ঃ—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ প্রামাণ্যম্ আপ্তপ্রামাণ্যাৎ।"

বৃত্তিকার অর্থ করিলেন ঃ—

"যদ্রূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্য, তদ্রূপ বেদের অর্থ দৃষ্টফলে প্রতীত বলিয়া বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী, সেই যথার্থবাদীর উক্তি বলিয়া বেদ প্রামাণ্য।"

মহাভারতোক্তি এই ঃ—

"পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

—কুল্লুকভট্টকৃত মন্বর্থমুক্তাবলী-উদ্ধৃত।

পুরাণ, মানবধর্ম্ম, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, সাঙ্গবেদ এবং চিকিৎসা এই চারির সিদ্ধি যেন আজ্ঞামত ঘটে, এজন্য, কোন প্রকার তর্কে তাহাদের অপ্রমাণ সিদ্ধ নহে।

গীতা এই নিমিত্ত প্রত্যক্ষফলে প্রামাণ্য। হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে, তাহা জ্ঞানমূলক। অজ্ঞানীর যাহাতে সেই জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়, যে জ্ঞানে বেদ প্রতিপন্ন, সেই জ্ঞানার্জ্জনের পথ

স্থাপিত করিয়া বেদ হিন্দু সমাজকে নিয়মিত করিয়াছে। কার্য্যে এবং অনুষ্ঠানে হিন্দু-ধর্ম্মের শিক্ষা, আত্ম-জীবনে জ্ঞানের প্রস্ফুরণ এবং সেই আত্মজ্ঞানে ধর্ম্মের প্রমাণ। অজ্ঞানীকে কেবল বিশ্বাস ও অনুমান দিয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই বিশ্বাস ও অনুমান, সেই শাস্ত্রজ্ঞান যাহাতে প্রত্যক্ষে প্রতীত হয়, তজ্জন্য আশ্রমনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই আশ্রমচতুষ্টয় হিন্দুধর্ম্মের বিরাট্-বিদ্যালয়। ব্রহ্মচর্য্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সংসারাশ্রমের ভক্তি ও কর্ম্মযোগে এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের জ্ঞানযোগে তাহার পরিণতি ও প্রমাণ। সুতরাং যে ধর্ম্ম আপনাকে আপনি সতত চিরকাল সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছে, সে ধর্ম্মের প্রামাণ্য কখন অসার ও অলীক নহে।



অনুমানের প্রতিসিদ্ধতা
ও গ্রন্থোপসংহার।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রণালী।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি—"ব্রহ্মচর্য্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সংসারাশ্রমের কর্ম্ম ও ভক্তিযোগে এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের জ্ঞান-যোগে তাহার পরিণতি ও প্রমাণ।" ইউরোপীয় পদার্থবিৎ পণ্ডিত-গণ এই প্রমাণ-প্রণালীকে প্রতিসিদ্ধতা (Verification) বলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে যাহা প্রত্যয়রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্যরূপে প্রমাণ করা চাই। যে ব্রহ্মজ্ঞান বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, আত্ম-প্রতীতি নহিলে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। কোন পণ্ডিত বলিতেছেন :—

"The weakness of the subjective Method is its impossibility of applying Verification ; whereas the security of the ocjective Method lies in its vigilant Verification"—G. H. Lewes.

তিনি আরও বলেন :—

"The cardinal distinction between Metaphysics and Science lies in Method, not in the nature of their topics ; and the proof of this is exemplified in the fact that a theory may be transferred from Metaphysics to Science simply by the addition of a verifiable element ; or conversely may be transferred from Science to Metaphysics by the withdrawal of this same element."

স্থানান্তরে :—

"All facts require verification before they are admitted as truths."

"অন্তর্বিষয়ক প্রণালীর (Subjective method) দোষ এই যে, তাহাতে জ্ঞান বা প্রত্যয় প্রমাণীকৃত হয় না; কিন্তু বহির্বিষয়ক প্রণালীতে (objective Method) জ্ঞান বা প্রত্যয়কে অতি সাবধানে, বিশুদ্ধ পরীক্ষা-প্রণালীক্রমে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে; এজন্য তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ প্রণালী।"

"আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা আছে বলিয়া যে বাহ্য বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার (Metaphysics) বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, এমত নহে; তাহাদের তত্ত্বনির্ণয়ের প্রণালী বিভিন্ন বলিয়া ঐ দুই বিদ্যার বিভিন্নতা হইয়াছে। অধ্যাত্মবিদ্যার কোন মত বা প্রত্যয় যদি পরীক্ষা দ্বারা পরিশোধিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তবেই তাহা বিজ্ঞানান্তর্গত হইতে পারে; আবার বাহ্য বিজ্ঞানের কোন মত বা প্রত্যয় যদি পরীক্ষা বা প্রমাণ দ্বারা পরিশুদ্ধ না হয়, তবে তাহা অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল।"

"কোন ঘটনা বা তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্থ করা আবশ্যক।" ~~জি, এচ, লুইস্~~।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পরীক্ষোত্তীর্ণ জ্ঞানই "প্রমা-জ্ঞান।" তত্ত্বনির্ণয়ের যাহা বিশুদ্ধ প্রণালী, তাহাতে দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়; প্রথম—প্রত্যয় বা মতসংগঠন; দ্বিতীয়—উপযুক্ত প্রমাণ বা পরীক্ষা দ্বারা সেই প্রত্যয় বা মত-সংস্থাপন।

তত্ত্বনির্ণয়ের এই পরিশুদ্ধ প্রণালী, হিন্দুধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে বেদজ্ঞান, তৎপরে অনুষ্ঠান দ্বারা সেই জ্ঞানের পরীক্ষা। আমরা হিন্দুশাস্ত্রে হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব সকলের উপদেশ মাত্র পাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ও আত্মজীবনে উহাদের সত্যতার উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট অধ্যাত্মজ্ঞান যতদিন না প্রমাণীকৃত এবং হৃদয়ে প্রতীত হয়, ততদিন তাহার পূর্ণতাও সম্যক্ অনুভূতি হয় না।

~~জ্ঞান-বিজ্ঞান~~।

~~পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে~~, হিন্দুধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ভেদে দ্বিবিধ

ব্রহ্মোপাসনার পথ। এই দ্বিবিধ সাধনায় সিদ্ধ হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। কিন্তু এই সাধনা জীবনব্যাপী যোগপথ। এই সুদীর্ঘ সাধনাপথের ফলাফল শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই পথ অবলম্বন করিলেই সেই ফলাফলের সত্যতা সাধকের সম্যক্ উপলব্ধ হইতে থাকে। যতদূর সেই পথে অগ্রসর হইবে, ততদূরই তাহার সত্যতা অনুভূত হইবে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে শাস্ত্রজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের পরীক্ষা ধর্ম্মসাধনা-পথে বরাবরই সম্পন্ন হইয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকেরা এই পথে যে যে নিদর্শন ও উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা বরাবরই হয় এবং বরাবরই তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। এ কথা সর্ব্ববিধ সাধনা-পথেই খাটে। কি ভক্তিপথের নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সাধনায়, কি কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগে, কোন পথেই এই সাধনার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল কোন সাধকেই কখন মিথ্যা বলেন নাই। এই সাধনাপথই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান-লাভের পথ। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান কি, গীতা তাহা বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।" ৬ অ—৮।

যাঁহার আত্মা জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা আকাঙ্ক্ষাহীন ইত্যাদি। এ স্থলে "জ্ঞান" কি, তাহা শ্রীধর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"জ্ঞানমৌপদেশিকং"

"বিজ্ঞান" কি, তাহাও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"বিজ্ঞান-মপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য।" ~~অতএব~~, তাঁহার মতে জ্ঞান—উপদিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিজ্ঞান—অপরোক্ষানুভূতি। যিনি এই জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞাত বিষয়ের অনুভব করিয়া তাহার সত্যতা প্রতীত করিয়াছেন, তিনিই তৃপ্ত এবং সেই

জন্য নিরাকাঙ্ক্ষ, তিনিই যথার্থ যোগরূঢ় বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীধর "বিজ্ঞানের" অর্থ—অপরোক্ষানুভূতি করিয়াই নিরস্ত হইলেন; কারণ, এই অপরোক্ষানুভূতি বেদান্তীর নিকট অতি সুপরিচিত বিষয়। পঞ্চদশীতে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ অনুভূতির বিভিন্নতা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—

"পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে ॥"

জীব, জগৎ ও পরমাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান—শাস্ত্র এবং গুরূপদিষ্ট পরমার্থ-জ্ঞান। এই জ্ঞান কতকাল পর্য্যালোচনা করিবে? যতকাল না অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। পরোক্ষ-জ্ঞানে তুমি জানিতে পারিলে যে, এই জগতের কারণস্বরূপ একমাত্র পরংব্রহ্ম আছেন। এই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক করা চাই। এই জ্ঞান যখন অপরোক্ষানুভূতিতে নিশ্চয়াত্মক হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, আমিই সেই নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বরূপ পরংব্রহ্ম। এই অপরোক্ষানুভূতির উদয় হইলে আর কোনপ্রকার বিচারের আবশ্যকতা নাই। তখন সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইল। শ্রীমদ্ভারতী-তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর জ্ঞানালোচনের কাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজস্থ শতসহস্র লোক এই জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিত।

এই "অপরোক্ষানুভূতি" কি, শঙ্কর তৎসম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে অপরোক্ষানুভূতির বিষয় সমস্ত পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থালোচনায় প্রতীত হয়, যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয়, অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা পরব্রহ্মকে সেইরূপ প্রত্যক্ষীভূত করা যায়।

এই অপরোক্ষানুভূতি কিরূপে লাভ করা যায়? "যাঁহারা নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকের সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন মুক্তিকামী যোগী, তাঁহারাই কেবল যত্ন দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারেন।" তাই শঙ্কর-প্রণীত "অপরোক্ষানুভূতির" টীকাকার বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বলিতেছেন :—

"কিংলক্ষণাপরোক্ষানুভূতিঃ সদ্ভিঃ সাধুভির্নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিসাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নৈর্মুমুক্ষুভিঃ।"

পুরাণেও এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে; কারণ, তাহা ধর্ম্ম ও ব্রহ্মলাভের একমাত্র আধ্যাত্মিক পন্থা। এই অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক পন্থায় কিরূপ প্রত্যক্ষ ফল লাভ করা যায়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবদ্বাক্যেও সপ্রমাণ হইতেছে :—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সহরস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"—২ স্কন্ধ—৯ অ।

ভগবান্ বলিতেছেন—বিজ্ঞান বা অনুভবসমন্বিত পরম গুহ্য-জ্ঞান এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ ভক্তিরহস্য বা সাধন তুমি গ্রহণ কর।

শ্রীধরস্বামী এস্থলেও বিজ্ঞানের অর্থ "অনুভব" এবং জ্ঞানের অর্থ "শাস্ত্রজ্ঞান" করিয়াছেন। এই অনুভব কি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বিজ্ঞান-লাভ হইলে কি ফল ফলিবে, ভাগবত তাহা বলিতেছেন :—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণ কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

"আমার যে প্রকার স্বরূপ, সত্ব এবং আমার যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম, আমার অনুগ্রহে তোমার সেই সমস্ত তত্ত্ব বিজ্ঞান-লব্ধ হউক।"

তৎপরে, যে সমস্ত তত্ত্ব এই বিজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা ভাগবত পরশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিজ্ঞান হইতেই পরমজ্ঞান লাভ হয়। পরমজ্ঞান কি, তাহা গীতা বলিতেছেন :—

"ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥—৯ অ, ১২।

"এই বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান, সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ; সর্ব্ব গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতি পবিত্র, জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষ ফল, ধর্ম্মের অনুগত, অক্ষয় ফলপ্রদ এবং সুখে করণীয়।"—শ্রীধর।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। বিজ্ঞানোৎপন্ন পরমজ্ঞান জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষফল। তাহা শ্রীধরের ভাষায় 'দৃষ্টফল' :—

"জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽববোধো
যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ।"

এই দৃষ্টফল দ্বিবিধ; কারণ, শাস্ত্রে বেদবিদ্যা দ্বিবিধ—মুক্তিফলার্থা এবং মোক্ষেতর-ফলার্থা। এই মোক্ষেতর-ফলার্থা বিদ্যা আবার দ্বিবিধ—ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্মবিদ্যা। মুক্তিফলার্থা বিদ্যায় দেবগণের অধিকার, ব্রহ্মবিদ্যায় ঋষিগণের অধিকার এবং কর্ম্মবিদ্যায় অপর সাধারণের অধিকার। ইঁহারা ধর্ম্মফল বরাবর লাভ করিয়া ঋষির জ্ঞানাধিকারে আসিলে নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা করেন। ভগবান্ জৈমিনি বলেন যে, ফলকামনার অভাব বশতঃ দেবগণ মোক্ষেতর-ফলার্থা বিদ্যার অতীত। মানুষকে দেবতা করাই ব্রহ্ম-

বিদ্যার প্রয়োজন। এক্ষণে শ্রুতির প্রমাণে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান কিরূপ দেখুন :—

বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥"—কঠোপনিষৎ।

বিজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ, সেই মনুষ্য সংসার-পথের পার-স্বরূপ বিষ্ণুর (সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের) সেই পরমপদ লাভ করেন। বিজ্ঞান কি?

"বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং সারথিঃ যস্য।"

কেনোপনিষৎ বলিলেন, ব্রহ্মকে সামান্য জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। তৎপরে বলিতেছেন, তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়? না—

"প্রতিবোধবিদিতং"

প্রতিবোধ কি? শঙ্কর বলেন, যেমন দিন দিন বুঝাইতে হইলে, "প্রতিদিন" শব্দের ব্যবহার হয়, তেমনি এখানে "বোধং বোধং" বুঝাইবার জন্য প্রতিবোধ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতিদিন বলিলে যেমন এক দিনের পর আর একদিন বুঝায়, তেমনি প্রতিবোধ বলিলে এক বোধের পর অন্য বোধ বুঝায়। বোধের পর যে বোধ হয়, তাহাই প্রতিবোধ। বোধের অর্থ বুদ্ধির প্রত্যয় বা শাস্ত্রীয় জ্ঞান। এই ঈশ্বরবুদ্ধিবিষয়ক বোধের উৎপত্তির পর কোন্ বোধের উৎপত্তি? তৎপরে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। অন্তরাত্মা সেই বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষীভূত হন। সর্ব্বপ্রত্যয় বা সর্ব্বজ্ঞানের জ্ঞান-স্বরূপ সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী-রূপে প্রত্যগাত্মা (প্রত্যক্ষাভূত আত্মা) বিদিত হয়েন। সেই বিজ্ঞানায়ত অন্তরাত্মাকে জানিবার অন্য উপায় নাই। তবেই জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মকে জানিবার ও

লাভ করিবার একমাত্র দ্বার—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। কাহারা ব্রহ্মকে দেখেন? শ্রুতি বলিতেছেন :—

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"—কঠ।

"কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু এবং অমৃতত্বাভিলাষী হইয়া প্রত্যগাত্মাকে (প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে) দেখিয়া থাকেন।"

প্রতিসিদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা।

হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা প্রণালী কেমন পরিপাটী দেখুন। শিষ্য গুরু-মুখে বৈদিক অলৌকিক জ্ঞান লাভ করেন। সেই শাস্ত্র-জ্ঞানের প্রতিসিদ্ধতা হয়। কিসে হয়?—বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানোৎপন্ন বিবেক দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞানের সমাধান ও পরিপাক হয়। নিজ পরীক্ষা দ্বারা সকাম ও নিষ্কামধর্ম্ম—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম প্রভৃতি সমস্ত গীতোপদিষ্ট বিষয় সাধনাপথে একে একে প্রমাণীকৃত হয়। সাধনাপথে যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইতে থাকে। এমত পরিশুদ্ধ প্রতিসিদ্ধতা আর কি আছে? যে জ্ঞানের মূল অপরের প্রত্যক্ষ, তাহা নিজ প্রত্যক্ষে প্রমাণীকৃত। এরূপ অনুমান-প্রণালীকে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিতেই হইবে। সকল অনুমানই প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানোৎপন্ন। যাহা পরকীয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানোৎপন্ন হইয়া তোমার আনুমানিক প্রত্যয় স্বরূপ হইয়াছে, তাহা যদি নিজ প্রত্যক্ষ-দ্বারা পুনঃ প্রমাণিত হয়, তবে সে অনুমানের যাথার্থ্যে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এইরূপ অনুমান এই জন্য নির্দ্দোষ এবং বিশুদ্ধ। হিন্দুধর্ম্মের অলৌকিক বৈদিক জ্ঞান-সমস্ত বহুকাল হইতে পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত হইতেছে। শাস্ত্রেও অলৌকিক বিষয়ের সত্যতা এই প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে।

এই পরীক্ষায় বিজ্ঞান বা অনুভব-লব্ধ জ্ঞান চিরকালই এক

অপরদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-মধ্যে যে তত্ত্ববিদ্যা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব হওয়াতে সে সমস্ত তত্ত্ববিদ্যা অসম্পূর্ণ এবং অপ্রামাণ্য; যেহেতু তাহাতে ধর্ম্মসাধনা-পথের বরাবর পর পর ফললাভের নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই। সেরূপ নিদর্শন কেবল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ভক্তিপথে, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-পথে রক্ষিত হইয়াছে। তাই কেবল হিন্দুতত্ত্ববিদ্যা বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সম্পূর্ণ এবং আত্ম-প্রত্যক্ষ-প্রমাণে প্রমাণীকৃত হয়। সুতরাং বাহ্যবিজ্ঞানে যে প্রতিসিদ্ধতার সাধনপ্রণালী আছে, তাহা অন্তর্বিষয়ক হিন্দু পরমার্থবিদ্যায় নিবিষ্ট হওয়াতে সেই বিদ্যা প্রমাজ্ঞানে লইয়া যায়।

প্রতিসিদ্ধ আপ্তবাক্য।

আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান, পরলোকের সত্তা, জন্মান্তরে আত্মার বিভিন্ন প্রকার গতি প্রভৃতি যে সমস্ত অলৌকিক এবং অদৃষ্টার্থক জ্ঞান, শাস্ত্র এবং গুরূপদেশ হইতে হিন্দু লাভ করেন, তাহা ঋষি-বাক্যরূপে পরতঃ-প্রমাণেই তিনি প্রথমে প্রত্যয় করিয়া থাকেন। আপ্তবাক্য বলিয়া সে সমস্ত কথা সত্য। বাইবেলোক্ত অলৌকিক এবং পারলৌকিক জ্ঞানসমূহও ঈশা-প্রোক্ত ভগবদ্বাক্যরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ উহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই আপ্তবাক্য কি সমান? এই দুই আপ্তবাক্যের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দুর মুক্তি স্বতন্ত্র। হিন্দুধর্ম্মোক্ত, আত্মার পারলৌকিক গতি-সমস্তের সহিত বাইবেলোক্ত আত্মগতির ঐক্য নাই। হিন্দুধর্ম্মোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান এবং সৃষ্ট্যাদিও স্বতন্ত্র। তাই

যদি হয়, তবে ঐ দুই আপ্তবাক্যের ঐক্য কই? যদি ঐক্য না থাকে, তবে উভয়ই সমান ভগবদ্বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে কি? কখনই না। তবে কোন্ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ প্রকৃত ভগবদ্বাক্য? এ প্রশ্নের মীমাংসা কি?

খৃষ্টান বলিতেছেন, সামান্য জ্ঞানের অনুমান দ্বারা খৃষ্টীয় আপ্ত-বাক্যের সম্ভাবনা ও সত্যতার প্রমাণ হইতেছে। হিন্দুও বলিতে-ছেন, সেই অনুমান দ্বারা কি হিন্দুধর্ম্মেরও যুক্তি প্রতিপন্ন হইতেছে না? সামান্য জ্ঞানের অনুমান দ্বারা যখন উভয়ই প্রতিপন্ন, তখন ত প্রশ্নের মীমাংসা হইল না; যেখানকার কথা সেইখানেই রহিয়া গেল। কারণ, সম্ভবযুক্তি দ্বারা উভয়েরই সমান বলোপচয় হয়। এক সময়ে হিউম প্রভৃতি সংশয়ী ব্যক্তিগণ যখন খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রত্যয়-সমস্তকে আলোড়িত করিয়াছিলেন, তখন Butler প্রভৃতি বিশ্বাসী ভক্তগণ Analogyর সম্ভবযুক্তি দ্বারা সেই সমস্ত-প্রত্যয়কে সাধারণ লোকমণ্ডলীর মনে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্ভব-যুক্তি-বলই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঐতিহাসিক পরতঃ-প্রমাণকে বিধ্বস্ত করিয়াছে—দেখাইয়াছে, সে প্রমাণ কোন কাজেরই নহে। নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের ইতিহাস হিন্দুধর্ম্মজগতে তদ্রূপ ধর্ম্মান্দোলনের কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। তবেই ত দাঁড়াইতেছে, সম্ভবযুক্তি উভয় ধর্ম্মকেই সমান প্রতিপন্ন করে। সুতরাং সম্ভবযুক্তি দ্বারা আমাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। অন্য কোন প্রমাণ-পথ আছে কি না? হিন্দু বলেন,—খৃষ্টান, তোমার সম্ভবযুক্তি সম্ভাবনা মাত্রই থাকিয়া যায়, কিন্তু আমার সম্ভবযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আমার সম্ভবযুক্তির অনুমান বিজ্ঞানদ্বারা প্রমাণীকৃত হয়। সুতরাং আমার সম্ভবযুক্তি আবার প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্থাপিত। তুমি আমার বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ

দর্শনকে অমানুষ বলিতে পার না, যেহেতু, তাহা মনুষ্যেরই সাধ্য এবং ইহলোকেই শত শত মনুষ্য তাহা সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই পরীক্ষা-প্রণালীক্রমে যখন হিন্দুধর্ম্মের অলৌকিক তত্ত্ব-সমুদায় প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভগবদ্বাক্য। যাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উক্ত হইল, হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য উৎপন্ন ধর্ম্মীয় আপ্তবাক্য-সম্বন্ধেও সে কথা বলা যাইতে পারে। *

বেদের ব্যাখ্যা।

এই সনাতন ধর্ম্ম যেমন অধ্যাত্ম-জগতের নিত্য নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছে, তেমনি তাহার অভ্রান্ত প্রচারকও দিয়াছে। নিত্য নিয়ম গ্রন্থে আবদ্ধ থাকিলে কি হইবে? তাহা ত মনুষ্য-কর্ত্তৃক বিচারিত, উপদিষ্ট এবং গৃহীত হইবে। তোমার বাইবেল, কোরাণ ও ত্রিপীটক বিদ্যমান থাকিলে কি হইবে? ভ্রান্তিবিশিষ্ট মনুষ্য ত তাহা গ্রহণ করিবে? ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্য নিজ মতে সমস্তই ক্ষুদ্র করিয়া লইবে। নানাবিধ মনুষ্য তাহাদের নানা ব্যাখ্যা বাহির করিবে। এই নিমিত্ত অসংখ্য সম্প্রদায় হইবারই সম্ভাবনা। তাহাতে মূল বস্তুর বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মে এই দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মে তাহা ঘটিবার যো নাই। কারণ, বেদের উপদেশক গুরুগণ সকলেই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা আত্মজ্ঞানে বেদকে অভ্রান্ত দেখিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধপুরুষগণ বেদ-পাঠ

---

* আজি কালি ইউরোপীয় উদার সমালোচকগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অনেকাংশে সমুত্থিত। দত্ত মহাশয় ইহার সুন্দর বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন—Vide. "Buddhism and Christianity" in Ancient India, Vol.

যেরূপে নিয়মিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা বেদার্থের যাথার্থ্য সম্যক্ প্রতীত হয়। বেদপাঠের নিমিত্ত অধিকারী হইতে হইলে পূর্ব্বে তজ্জন্য জ্ঞানাধিকার হওয়া চাই। সেই জ্ঞানাধিকার জন্মিলে তবে নিয়মমত পাঠ করিতে হইবে। অনধিকারী ব্যক্তি বেদের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ। সেই তাৎপর্য্য-গ্রহণের নিমিত্ত বেদোপদেশকগণ বেদাঙ্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই বেদাঙ্গ ছয় প্রকার—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবংজ্যোতিষ। এই বেদাঙ্গে বেদপাঠের নিয়ম-সমস্ত প্রকাশিত আছে। তাহারাই বেদের চক্ষু-স্বরূপ। তুমি অনধিকারী, তুমি পাঠ করিতে যাও, তোমার চক্ষে সমস্ত বিকৃত, বিশৃঙ্খল, বিসংবাদী বোধ হইবে। কিন্তু অধিকারী হইয়া ঐ ছয় চক্ষু দিয়া বেদ পাঠ কর, বেদকে নির্দ্দোষ দেখিতে পাইবে। যাঁহারা বেদের দোষ দেখিতে পান, তাঁহারা অনধিকারী এবং যথানিয়মে বেদপাঠ করেন নাই।

অন্যান্য ধর্ম্মে আপ্তবাক্য আছে, এ কথা যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই আপ্তবাক্যের অভ্রান্ত উপদেশক কই? সেই অভ্রান্ত গুরূপদিষ্ট আপ্তবাক্য বুঝিবার অভ্রান্ত পথ কই? সেই আপ্তবাক্য বুঝিবার জন্য যে জ্ঞানাধিকার আবশ্যক, সে জ্ঞানাধিকার কিসে জন্মিবে? আপ্তবাক্য থাকিলে কি হইবে? অভ্রান্ত উপদেশক বিহনে সে আপ্তবাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহণে সাধারণ জনসমাজ ভ্রমবিহীন হইতে পারে না।

এক্ষণে বোধ হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য ত্রিবিধ—পৌরাণিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক। জনসমাজের জ্ঞানাধিকার-ভেদোপযোগী এই ত্রিবিধ প্রমাণ। যাঁহারা পৌরাণিক প্রমাণে পরিতুষ্ট নহেন, তাঁহারা দার্শনিক অনুমান অবলম্বন

করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের কাছে, পৌরাণিক ও আনুমানিক, এই উভয়বিধ প্রমাণই দুর্ব্বল, তাঁহাদের জন্য অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য। এ প্রামাণ্য কাহারও অগ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম বলিতেছেন, এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-পথ ত পড়িয়া রহিয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখ, হিন্দুধর্ম্ম স্বতই সপ্রমাণ হইয়া যাইবে। তৎপূর্ব্বে, হিন্দুধর্ম্মকে অপ্রামাণ্য বলিবার যো নাই। বেদ প্রামাণ্য হওয়াতে তদনুযায়ী সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রামাণ্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-প্রমাণে সিদ্ধ। তাই হিন্দুধর্ম্ম অলঙ্ঘ্য প্রমাণে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইয়া স্বয়ং-সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যারূপে চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে। কারণ ঃ--

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"